ঈশ্বরের উদ্যান
বীরেন্দ্রনাথ সরকার

ঈশ্বরের উদ্যান

ঈশ্বরের উদ্যান

বীরেন্দ্রনাথ সরকার

ISWARER UDYAN
by Birendranath Sarker
(A Treaties on flowers of
upper valleys of the Himalayas)
Price Rupees Twenty five only

প্রকাশক :
অধীর পাল
৮সি, ট্যামার লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : মে, ১৯৮৫

প্রচ্ছদ : ব্রাইট স্পট্

মূল্য : পঁচিশ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :
প্রফুল্লকুমার বক্সী
জয়দুর্গা প্রেস
৫৩, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯

উৎসর্গ

পরম পূজনীয়,

ড. সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, সিনিয়র সাইন্টিষ্ট, (অবসরপ্রাপ্ত)
কীপার সেণ্ট্রাল ন্যাশনাল হারবেরিয়ার, ইণ্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

আপনার উৎসাহ ও আশীর্বাদ না পেলে
আমি আমার এই গ্রন্থ রচনায় সাহস পেতাম না।

বীরেন্দ্রনাথ সরকার

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

রহস্যময় রূপকুণ্ড
পথের তীর্থে
গৌরী গঙ্গা
সিকিম
হিমালয়ের ফুল
হিমালয়ে দুর্ঘটনা
গঙ্গার কথা
গৌরাঙ্গ লীলাপ্রসঙ্গ

॥ মুখবন্ধ ॥

'ঈশ্বরের উদ্যান' বাংলা ভাষায় লেখা বিজ্ঞানভিত্তিক আমার দ্বিতীয় গ্রন্থ। উচ্চ হিমালয়ের বিভিন্ন উপত্যকায় অপরূপ উদ্যানের সৃষ্টি হয়েছিল ; এইসব উদ্যানের নাম আলি বুগিয়াল, বৈদিনী বুগিয়াল, স্বর্গোদ্যান, রক্তবরণ, তপোবন, নন্দনকানন। এই গ্রন্থে এরাই আমার ঈশ্বরের উদ্যান। এই উদ্যান মানুষের সৃষ্টি নয়। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা এই উদ্যান সৃষ্টির কার্যকারণ, বিচিত্র ধরণের বৃক্ষরাজি, অপরূপ তৃণভূমি, নানাবর্ণের পুষ্পরাজির পরিচয় সংগ্রহ করেছেন। তাঁদের তথ্য ও বর্ণনা আমাকে বার বার নিয়ে এসেছে ঈশ্বরের উদ্যানে। এই উদ্যানের পথে পথে দেখেছি পাইন, চীর, দেওদার, ফার, সাইপ্রেস, রোডোডেনড্রন, ভূর্জগাছ। সবাই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেঁচে রয়েছে। বৃক্ষসীমার বাইরে নানা ধরণের তৃণরাজি। নানা বর্ণের পুষ্পসম্ভার, যা যাত্রীদের সব দুঃখকষ্ট ভুলিয়ে স্বর্গের নন্দনকাননের কথা বলে দেয়। এদের আমি দেখেছি বার বার পাথরের কোলে, ঝর্ণার ধারে, স্তূপীকৃত নীরস পাথরের মধ্যে। তুষার অঞ্চলের মধ্যে দেখেছি বিস্ময়কর ফুল। এদের জীবনযাত্রা আমাকে অবাক করেছে। আমি দেখেছি নীরস পাথরের বুক নিঙড়ে, পাথর ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে বিচিত্র উদ্ভিদ নানা বর্ণের ফুল ফুটিয়ে অপরূপ বাসস্থান বানিয়েছে। তুষারাবৃত অঞ্চলে, চার পাশের ঝড়ঝাপটা, তুষারপাত, হিমপ্রবাহ থেকে গা বাঁচিয়ে পাথরের আড়ালে কোন কোন ফুল নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছে সামান্য উষ্ণতা খুঁজে। 'ঈশ্বরের উদ্যানে' এইসব অপরূপ উদ্ভিজ্জজীবনের জীবনযুদ্ধের কথা লিখতে চেয়েছি।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানভিত্তিক গ্রন্থ আমি প্রথম রচনা করেছিলাম ১৯৭৪ সনে। গ্রন্থের নাম 'হিমালয়ের ফুল'। ১৯৫৯ সন থেকে শুরু করেছিলাম হিমালয়ের পথ পরিক্রমা। ফুলের সঙ্গে প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হয়েছি। সেই মুগ্ধ দৃষ্টি আমার আজও রয়েছে। আমি উদ্ভিদবিজ্ঞানী নই, তাই উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনার ধৃষ্টতা আমার থাকা উচিত নয়। কিন্তু হিমালয় ভ্রমণের পথে ফুল দর্শন আমার সব কিছু দুঃখ-কষ্ট লাঘব করেছে। সেই স্মৃতিই আমাকে প্রথম গ্রন্থ রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি নিয়ে গিয়েছিলাম শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে। সেখানে আমার পরিচিত উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের শরণাপন্ন হয়েছিলাম বইয়ের ভূমিকা লিখে দেবার জন্য। উপেনদা পাণ্ডুলিপি নিয়ে দিয়েছিলেন ড. সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের হাতে। তাঁকে তিনি অনুরোধ

করেছিলেন লেখাটি পড়ে ভূমিকা লিখে দেবার জন্য। ড. সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় বিজ্ঞানী। তিনি প্রখ্যাত উদ্ভিদ বিজ্ঞানী কিংডন ওয়ার্ডের সংঙ্গে নেফা, মণিপুর অঞ্চলের দুর্গম অংশ পরিভ্রমণ করে নানা ধরণের প্রজাতি সংগ্রহ করেছিলেন। দিন পনেরো পরে খবর পেয়ে দেখা করেছিলাম ড. মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি আমার গ্রন্থ যত্ন করে পাঠ করেছিলেন এবং ভূমিকাও লিখে দিয়েছিলেন। আমাকে বলেছিলেন—এই ধরণের বই আরো লিখবে। এই ধরণের বই এর প্রয়োজন রয়েছে।

প্রণাম করে বিদায় নেবার সময় তিনি আমাকে বলেছিলেন—লিখে যাও, এর মূল্যায়ন একদিন হবেই। এটাই ছিল আমার পক্ষে দারুণ উৎসাহ, আর আশীর্বাদ।

এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরীর উৎসাহের কথা কখনই ভুলবো না। তিনি হিমালয়ের উচ্চ উপত্যকার ফুল দেখেছেন কিনা জানি না। আমার গ্রন্থের নানা ফুলের পরিচয় তাঁর ভাল লাগলে আমি খুশী হব।

'হিমালয়ের ফুল' প্রকাশিত হবার পর প্রেসিডেন্সী কলেজে 'হিমালয়ের ফুল' সম্পর্কে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের বি. এস্-সি., এম্. এস্-সি. ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলাম দু'তিন বার। হুগলী মহসীন কলেজেও আমন্ত্রিত হয়েছিলাম 'হিমালয়ে ফুল' সম্পর্কে কিছু বলার জন্য।

'ঈশ্বরের উদ্যান' গ্রন্থটি ড. মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহ ও আশীর্বাদের ফলশ্রুতি।

হিমালয়ের বিভিন্ন উপত্যকায় ঈশ্বরের উদ্যানে যাবার সুযোগ সবার হয় না। আবার সুযোগ হলেও দেখবার ভাগ্যও ঘটে না। তাই 'ঈশ্বরের উদ্যান' হিমালয়ের বুক থেকে নিয়ে আসবার চেষ্টা করেছি সমতলের পাঠক-পাঠিকাদের জন্য। তারা দর্শন করলে আমি ধন্য হব।

আমার এই গ্রন্থের আলোকচিত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন রমেনদা, বিনীত, হিমাংশু, বিমল এবং সুশ্রী দত্ত। তাদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

বজবজ
২৫. ৫. ৮৫

বীরেন্দ্রনাথ সরকার

ব্রহ্মকমল ও পোলাইগোণাম

অ্যাস্টর

প্রিমুলা

প্রিমুলা

একোনাইট

প্রিমুলা

ব্রহ্মকমল ও সিডাম

ডেলফিনিয়াম্

জেন্‌সিয়ানা

ডেলফিনিয়াম্‌

কোরাইডালিস্

জেন্‌সিয়ানা

জিরানিয়াম্
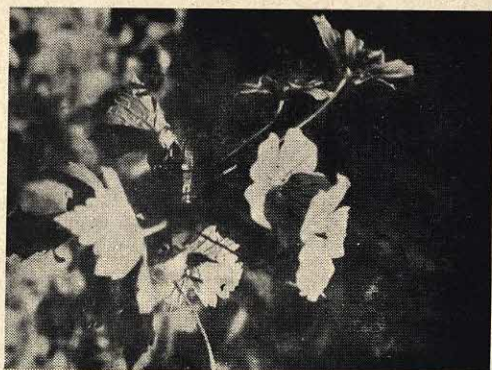
অ্যাস্টর

অ্যানিমন

একোনাইট

প্রস্তাবনা

ফুল ফোটে ফুলফোটার সময় এলেই।

সে এক অপরূপ মুহূর্ত। কুড়িগুলো ভয়ে ভয়ে চোখ মেলে তাকাতে চায়। সূর্যের আলো অথবা আকাশের গাঢ় নীল রঙ, সব কিছুই নিঃশেষে পান করে যেন উন্মুখ হয়ে ওঠে। প্রহর গণে সেই অপরূপ মুহূর্তের জন্য। বুক থেকে শিশিরকণা শুষে নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এই প্রতিক্ষার সময়েই। তারপর বিচিত্র বর্ণচ্ছটা বেগুনী, হলদে নীল, গোলাপী, লাল রামধনুর সব ক'টি রঙ চুরি করে ছড়িয়ে দেয় মাটি আর পাথরের বুকে। সবুজ আর হালকা সোনালী রঙের মখ্‌মলের মতো নরম ঘাস, ধূসর মাটির বুককে রাখে ঢেকে। সেখান থেকে ঝক্‌ঝকে নানা রঙের মুখ যেন উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে আকাশের তারাগুলোর মতো।

মাটি যেখানে ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছে, যেখানে নীরস কঠিন পাথর, সেখানে সেই পাথরের খাঁজে খাঁজে আড়ালে লুকিয়ে থাকতে চায়। অথবা উজ্জ্বল আলোর সামনে উচ্ছল হাসিতে ভরিয়ে রাখতে চায় ঝরণার ধারে ধারে। নয়তো বা পাথর আর হিমশীতল বরফের সীমানায় প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বিচিত্র পোশাক গায়ে চাপিয়ে উজ্জ্বল রঙ লুকিয়ে থাকতে চায় সবার অলক্ষ্য।

মর্ত্যের মাটির বুক থেকে পাথরের নিশানা খুঁজে খুঁজে বহু পথ অতিক্রম করে যাওয়া যায় সেই অপরূপ পরিবেশের মাঝখানে। সেখানে যেন আলো স্তিমিত, বাতাস ক্ষীণ ধারায় বয়ে চলে। গাঢ় কুয়াশার আস্তরণ ভেদকরে সূর্যদেব উঁকি দিতে পারেন না। হিমশীতল ঝোড়ো বাতাসের দাপটে দম হারিয়ে ফেলতে হয়। হিমালয়ের বিভিন্ন উচ্চতায় এমনি বিস্ময়কর পরিবেশের মাঝখানে বিচিত্র উদ্যানের সন্ধান পাওয়া যায়। গহন অরণ্যের ছায়ায় ছায়ায় আকাশ বাতাস আর আলোর সীমা-রেখার মাঝখানে বিচিত্র বৃক্ষরাজির ভিড় ঠেলে যেতে হয় এগিয়ে। অরণ্যের শেষ কান্না, শেষ সীমারেখা দেখবার পর দেখা যায় ঝোপঝাড় আর লতাগুল্মের প্রাচুর্য। তারপরই পৌঁছে যাওয়া যায় বিচিত্র তৃণভূমিতে। পথ চলায় ক্লান্তি না থাকলেও কিন্তু বসে থাকতে ইচ্ছে করে সবুজ ঘাসের নরম বিছানায়। দুপুরের রোদ আর হিমশীতল বাতাসে শুয়ে দেখতে ইচ্ছে করে নীল আকাশটা। বিকেলের পড়ন্ত

বেলায় সবুজ ঘাসের গন্ধ বুকভরে টেনে নিয়ে কেমন যেন নিঃসাড়ে শুয়ে শুয়ে দেখতে ইচ্ছে করে নানাবর্ণের প্রজাপতির মিছিল। সূর্যের আভায় ঝিমুতে ঝিমুতে ঘুমিয়ে থাকার ভান করে ফুলগুলোর দিকে চোখ মেলে দেখা যায় বিচিত্র ছবি। সারা আকাশ জুড়ে তখন লোহিত আলোর আভা। চারদিক থেকে ছুটে আসা হিমেল হাওয়ার স্পর্শে দেহমনে শিহরণ জাগে। বাতাসের প্রাচুর্যের মাঝখানেও যেন প্রাণের স্পর্শ নেই। অদূরেই তুষারধবল পর্বতশৃঙ্গগুলির গায়ে সোনালী রঙের ছোপ। সূর্যদেব বুঝি ক্লান্ত হয়ে ঝিমিয়ে পড়েছেন পথ চলায়।

তৃণভূমি পেরিয়ে আরো উচ্চতায় এগিয়ে যেতে হয়। পাথর আর বরফের সীমারেখার মাঝখানে থমকে গিয়ে বাতাসের উপস্থিতি খুঁজে বার করতে হয়। ক্লান্তি আসে, ঝিমুনি আসে দেহে মনে। এক অদ্ভুত আহ্বানে তবু এগিয়ে যেতে হয় ধীরে ধীরে। অবশেষে বিচিত্র পোশাকে সজ্জিত অপরূপ ফুলগুলোর মাঝখানে অবসন্ন হয়ে ভুলে যাওয়া যায় সব দুঃখ, সব বেদনা। এমনি করেই দেখতে পাওয়া যায় অপরূপ উদ্যানের শেষ সীমানায়। পথ চলায় বিপদ আছে, দুঃখ আছে, আছে ক্লান্তিও। তবু সবকিছু থাকার স্মৃতির আনন্দ বয়ে নিয়ে আবার ফিরে আসতে হয় সেই উদ্যানের পথে। এ পথ অপ্রয়োজনের পথ, এ পথ ঈশ্বরের উদ্যানের পথ। সেই উদ্যানের স্বপ্ন দেখে পথ খুঁজে বের করার সাধনায় এগিয়ে যেতে হয়।

ঈশ্বরের উদ্যান।

মালী নেই সেখানে তদারকী করবার জন্য। মালঞ্চের মালাকারও নেই। তবু সেই অপরূপ উদ্যান ফুলে ফুলে ভরে থাকে। প্রজাপতির দল উড়ে বেড়ায় রঙীন পাখ না মেলে। ছোট্ট ছোট্ট পাখীগুলো উড়ে এসে হাজির হয়। ঘুরে বেড়ায় বিচিত্র রঙের ফুলগুলোর চারধারে। প্রখর সূর্যকিরণ থেকে বাঁচবার জন্যে প্রকৃতিদেবী যেন চারপাশটা ঢেকে রাখে গাঢ় কুয়াশা দিয়ে। এই অপরূপ উদ্যানের হদিস নেবার জন্যে স্বপ্ন দেখে বার বার বেরিয়ে পড়ি ঘর ছেড়ে সব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে। পথের চিহ্ন ধরে পাহাড়, পর্বত, গিরিসঙ্কট পেরিয়ে নদী ঝরণা আর উপত্যকা দেখতে দেখতে পৌঁছে গিয়েছি পথের শেষ সীমানায়। পথ নেই, পথচলার বাধা-নিষেধও নেই। হিসাব রাখতে হয়নি পথচলার। ঈশ্বরের উদ্যানের তোরণদ্বার পেরুতেই নতুন করে ভাবতে হয়েছে পথচলার।

ঈশ্বরের উদ্যানের কথা শুনেছিলাম শৈশবকাল থেকেই। নন্দনকাননের কথা শুনেছিলাম রামায়ণ-মহাভারত আর পুরাণগুলোয়। দেবরাজ ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্যে রয়েছে নন্দনকানন। ভূগোলে তার পথের নিশানা নেই। খুঁজে বার করা যায় না

মানচিত্র দেখে। শুনেছি নন্দনবনের কথা। কোথায় তার ঠিকানা, জানি না। অপরূপ যে বন, সেখানে হয়তো রয়েছে কল্পবৃক্ষ। হয়তো বা বৃক্ষ নেই, বনস্পজনের জন্য। বৃক্ষ হয়তো সেখানে ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হয়ে ঝোপঝাড় লতাগুল্মে রূপান্তরিত হয়ে সর্বশেষে পরিণত হয়েছে বিস্তীর্ণ তৃনভূমি। তবু তার নাম নন্দনবন। রামায়ণ মহাভারতে নাম শুনেছি নন্দনবনের। স্বর্গ থেকে মর্তের পথে তপোবন। সেখানে বসবাস করেন তপস্বীরা। সুদৃশ্য ঝরনা আর বিচিত্র পুষ্পসম্ভার। দেবতা সর্বত্র। ফুল ফোটে আর ঝরে যায় দেবতার পদতলে পুজো সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি দেবী নিজে পুজোর আয়োজন করেন। ঈশ্বরের উদ্যানে প্রকৃতিদেবী পুজোর ডালি সাজিয়ে অপেক্ষমানা। আমি না দেখতে পেলেও অনুভব করি।

হিমালয়ের বিভিন্ন উচ্চতায় ছড়িয়ে পড়া অপরূপ উদ্যানের কথা আমার মনকে ভরিয়ে রেখেছিল। তারই উদ্দেশ্যে দীর্ঘ পদযাত্রা স্মৃতিপটে আঁকা রয়েছে। পথ চলতে চলতে একদিন পৌঁছে গিয়েছি ওয়ান গ্রামে। সেখান থেকে এগিয়ে গিয়েছি আলি বুগিয়াল, বৈদিনী বুগিয়াল, গিমতলি। বিচিত্র ফুলের মিছিলে হারিয়ে ফেলেছিলাম নিজেকে। কোন এক গ্রীষ্মের শেষে অলকানন্দার পথ ধরে ধরে পৌঁছে গিয়েছিলাম ভুাইণ্ডার উপত্যকায়। সে স্থানের নাম নন্দনকানন। সেখানে ফুলের সঙ্গে পরিচয় করতে চেয়েছি। এমনি করেই একবার ভাগীরথীর ধারা অনুসরণ করে পৌঁছে গিয়েছি গোমুখ। সেখান থেকে এগিয়ে গিয়েছি ভাগীরথীর পদতলে নন্দনবনে। একবার গোমুখ পেরিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলাম শিবলিঙ্গ পর্বতের পাদদেশে তপোবনে। শিবলিঙ্গ আর কেদারনাথের পদতলে বসে কাটিয়েছি ফুল ফোটা আর ফুল ঝরে যাওয়া প্রত্যক্ষ করবার জন্য। তপোবন, নন্দনবন পেরিয়ে চতুরঙ্গীর অঙ্গনে বসে বসে দেখছি অপরূপ পুষ্পসম্ভার। বাসুকীর বিষাক্ত নিঃশ্বাস এড়িয়ে গিয়েছিলাম বাসুকীতালে। হিমালয়ের উচ্চ উপত্যকায় পথ না থাকলেও পথ চলার শেষ হয় না। তাই বার বার দেখেছি এই পথ। এই পথেই তো স্বর্গের নন্দনকানন, নন্দনবন, তপোবন। এইসব অপরূপ উদ্যানের পথের লেখা রয়েছে রামায়ণ-মহাভারতে। এইসব পথের নিশানা দিয়েছেন ভূগোল-বিজ্ঞানীরা। এই সবই তো ঈশ্বরের উদ্যান!

উচ্চ হিমালয়ের বিভিন্ন উপত্যকায় অবস্থিত উদ্যানগুলোর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তুষার সীমার ওপরে হিমালয়ের উপত্যকাগুলো সমুদ্রতল থেকে অনেক উচ্চ। কোন স্থানের উচ্চতা সমুদ্রতল থেকে বেশী হলে সেই স্থানের উদ্ভিদজীবনে নানা বিপর্যয় ঘটতে শুরু করে। উচ্চ স্থানের বৃক্ষরাজির গভীরতা হ্রাস পেতে থাকে।

সর্বশেষে স্থানটি বৃক্ষ বিরল হতে হতে বৃক্ষশূন্য হয়ে যায় উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। বৃক্ষরাজির উপস্থিতি বা শূন্যতা স্থানের উচ্চতা সূচিত করে। কোন উচ্চ উপত্যকার বৃক্ষশূন্য পরিবেশকে বিদেশী বিজ্ঞানীরা বলেন অ্যালপাইন্ অঞ্চল। হিমালয়ের বৃক্ষশূন্য অঞ্চলকে স্থানীয় অধিবাসীরা বুগিয়াল বলে থাকে। সেই বুগিয়ালেই খুঁজে বেড়াই নন্দনকানন আর নন্দনবন। হিমালয়ের বৃক্ষ সীমার উচ্চতা ২৫০০মিটার বা ৮২০০ ফুট থেকে ৩০০০ মিটার বা ৯৮৪০ ফুট। উচ্চতা বলতে বোঝা যায় সেই অঞ্চলকে, যেখানকার চাপ ও তাপমাত্রা কম। তাই শুষ্কতা ও বৃক্ষশূন্যতাই সেখানকার মুখ্য পরিচয়। তাই নিম্ন অঞ্চল ও উচ্চ উপত্যকা অঞ্চলের জীবন-যাত্রা একরূপ হতে পারে না। উচ্চ উপত্যকার পরিবেশ সম্পূর্ণ পৃথক। সচরাচর পরিচিত দৃশ্যমান পরিবেশের তুলনায় উচ্চ উপত্যকা যেন সম্পূর্ণ পৃথক জগৎ। এ জগৎ সাধারণের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাই পদযাত্রীদের এই অঞ্চলে প্রবেশ করার মুখে বহুবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এই পদযাত্রাই তখন সাধনার পর্যায়ভুক্ত হয়ে ওঠে। হিমালয়ের উচ্চ উপত্যকা বা নিম্নচাপযুক্ত অঞ্চল, উত্তর-পশ্চিম হিমালয়ের বৃক্ষ সীমার ওপরের অঞ্চলের বায়ুর চাপমাত্রা একই অক্ষাংশে অবস্থিত সমুদ্র উপকূলের চাপমাত্রার দুই তৃতীয়াংশ।

৬০০০ মিটার/১৯৬৮০ ফুট উচ্চতার চাপমাত্রা সমুদ্র-উপকূলের চাপমাত্রার অর্ধেক।
৬৩০০ মিটার/২০৬৬৪ ফুট উচ্চতার চাপমাত্রা সমুদ্র-উপকূলের চাপমাত্রার অর্ধেকেরও কম। উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই যে চাপমাত্রা নিয়মিতভাবে হ্রাস পেতে থাকে তা নয়। এর কারণ অবশ্য অক্ষাংশের তারতম্য ও অন্যান্য পরিবেশ।

সমুদ্রতলে বাতাসের এক পঞ্চমাংশ থাকে অক্সিজেন। বাতাসে অক্সিজেন নাইট্রোজেনের চাইতে ভারী। উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে। তুলনামূলকভাবে বাতাসে নাইট্রোজেনের পরিমাণ হ্রাস পায় না।

বাতাসে অক্সিজেনের ঘনত্ব ১·৪২৯০৪ গ্রাম/লিটার

বাতাসে নাইট্রোজেনের ঘনত্ব ১·২৫১৫৫ গ্রাম/লিটার

ঘনত্বের তারতম্যের ফলে উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অক্সিজেন মহার্ঘ হতে থাকে। উত্তর-পশ্চিম হিমালয়ে বৃক্ষসীমার ওপরে অক্সিজেনের চাপমাত্রা শতকরা ৬৮ ভাগ। ৬০০০ মিটার/১৯৬৮০ফুট উচ্চতায় চাপমাত্রা হ্রাস পায় শতকরা ৫৫ ভাগ। বাতাসে অবস্থিত ভারী গ্যাস মহাকর্ষের ফলে ভূ-পৃষ্ঠের নীচে জমতে থাকে। বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব ১·৯৭৫৯ গ্রাম/লিটার।

কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বাতাসে সমুদ্রতলে অবস্থান করে বলে উচ্চ উপত্যকায়

এই গ্যাসের পরিমাণ কমতে কমতে অক্সিজেনের তুলনায় আরো বেশী মহার্ঘ হতে থাকে। ফলে সবুজ উদ্ভিদের জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়।
অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের চাপমাত্রা হ্রাস পেতে থাকে উপত্যকার উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। উচ্চ উপত্যকায় বাতাসের জলীয়বাষ্পেরও চাপমাত্রা হ্রাস পায়, বাতাসে ভাসমান পদার্থের ঘনত্ব কমতে থাকে।
এই ভাসমান পদার্থের পরিমাণ সমুদ্রতলের তুলনায় ৫০০০ মিটার/১৬৪০০ ফুট উচ্চ উপত্যকায় মাত্র শতকরা এক ভাগ ঘনত্ব কমতে থাকে। উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেই মাত্রা বায়ুর চাপমাত্র হ্রাস পেতে শুরু করে, তেমনি তার সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ প্রতিক্রিয়া শুরু হয় শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে। ফলে বাতাসে অবস্থিত বিভিন্নধরনের গ্যাসের গঠন প্রকৃতির মধ্যে নানা বিক্রিয়া শুরু হয়। হাল্কা বাতাসের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেতে থাকে সৌর বিকিরণের ফলে। বাতাসের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি নিম্নতাপ মাত্রা বৃদ্ধির সহায়ক হয়। নিম্নতাপ মাত্রা ভূত্বককে বাষ্পীভবনের সহায়ক না হয়ে শুষ্কতা বৃদ্ধির কারণ ঘটায়। জলীয়বাষ্পের চাপমাত্রা হ্রাস হবার ফলে বাতাসের শুষ্কতা বৃদ্ধি পায়। হিমালয়ের উপত্যকায় উর্চ্চতা বৃদ্ধিতে এমনি সব প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। শুষ্কতা বৃদ্ধিতে জলীয়বাষ্প সঞ্চিত হতে পারে না কোনক্রমেই।
নিম্ন-তাপমাত্রায় সঞ্চিত সামান্য জলীয়বাষ্প তুষারে রূপান্তরিত হয়। সেই তুষারই পরিণত হয় শক্ত বরফে। বাতাসে স্বল্প সঞ্চিত জলীয়বাষ্প থাকায় বিকিরণ ও ইনসলেশনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। এরূপ দ্রুত তাপ বিকিরণ ও ইনসলেশন বাতাসের তাপমাত্রা ও সূর্য কিরণে উদ্ভাসিত অঞ্চলের তাপমাত্রার তারতম্য ঘটায়। শুষ্কতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাতাস হাল্কা হাওয়ার প্রবণতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। বাতাসের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিকিরিত সূর্যরশ্মির সামান্যটুকুই বাতাস শুষে নিতে থাকে।
উচ্চ হিমালয়ে হিমশীতল পরিবেশ, সেখানে শুষ্কতা, তীব্র ইনসলেসন ও তাপ বিকিরণ। ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রার তারতম্য ঘটাতে থাকে। জলীয়বাষ্পের অসচ্ছতায় প্রাকৃতিক স্বাভাবিক ভারসাম্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়। সমতল অপেক্ষা উচ্চ উপত্যকায় এইসব বৈষম্য পর্যবেক্ষণ করা যায় গভীরভাবে। প্রাকৃতিক ভারসাম্যের প্রভাব এসে পড়ে উদ্ভিদ-জীবনে, বিশেষ করে উচ্চ হিমালয়ে। সেখানে উচ্চতাজনিত সমস্যা অনুভব করা যায় উচ্চ হিমালয় ভ্রমণের সময়। উচ্চতাজনিত সমস্যাগুলোর প্রতিক্রিয়া বৃদ্ধি পেতে থাকে উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই। উদ্ভিদ-জীবনেও বৈপরীত্ব লক্ষ্য করা যায় উচ্চ হিমালয়ে।
বাতাসের ঘনত্বের অভাব ভাসমান পদার্থের প্রায় অনুপস্থিতি, নিম্ন-পরিমাণ

জলীয়বাষ্প, হিমালয়ের উচ্চ উপত্যকায় বাতাসের স্বচ্ছতা অতি সহজেই সৌর-বিকিরণের প্রভাবে বাতাসের তাপমাত্রা বিন্দুমাত্রই বৃদ্ধি পায়। সূর্য অস্ত গেলে তাপমাত্রার বৃদ্ধি খুব কমই হয়। সংশ্লিষ্ট বাতাসের তাপমাত্রা তুলনামূলক ভাবে বৃদ্ধি পায় না। উচ্চ হিমালয়ে নিম্ন-তাপমাত্রা, উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হতে থাকে।

উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রার গড়পরতা হ্রাস-এর মোটামুটি পরিমাণ লক্ষ্য করা যায়। গড়ে ১০০০ মিটার/৩২৮০ ফুট উচ্চতা বৃদ্ধিতে ৬.২° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার হ্রাস ঘটে। অবশ্য এই তাপমাত্রার হ্রাসরীতি কিছুটা নির্ভর করে অক্ষাংশের পরিবর্তনে, পর্বতের পরিমিতির বিশালতায়। কোন উচ্চ উপত্যকার বাৎসরিক তাপমাত্রার গড় কোনক্রমেই ১০° সেন্টিগ্রেডের বেশী হয় না। সেইস্থানে অরণ্য সরে যায়। সেখানে স্থান গ্রহণ করে অন্য উদ্ভিদকে। সেই স্থানের নাম বিজ্ঞানীরা বলেন অ্যালপাইন জোন (ALPINE ZONE) বা বৃক্ষসীমার বাইরের অঞ্চল। সেখানে লতাগুল্ম আর তৃণই বিশেষভাবে বসবাস করতে থাকে। আরো উচ্চ স্থানে যেখানকার বাৎসরিক তাপমাত্রার গড় হিমাঙ্কে থাকে, সেই অঞ্চলকে বিজ্ঞানীরা বলেন আর্কটিক্ জোন (ARCTiC ZONE)।

উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের তাপমাত্রার গড় হ্রাস পাওয়ার নাম LAPS RATE বলা হয়। LAPS RATE ও অক্ষাংশের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয় করবার জন্য হপ্‌কিন্‌স BIO-CLIMATIC LAW-এর উল্লেখ করা হয়েছে। এই নিয়ম অনুসারে দেখা যায়:—

উত্তর অক্ষাংশে:

১৫০০ মিটার/৪৯২০ ফুট উচ্চতার বাতাসের তাপমাত্রা ছায়ায়—৪° সেন্টিগ্রেড
গ্রীষ্মকালে সূর্যালোকে—৩৫° সেন্টিগ্রেড

৩৬০০ মিটার/১১৪০৮ ফুট উচ্চতায় বাতাসের তাপমাত্রা ছায়ায়—৩° সেন্টিগ্রেড
গ্রীষ্মকালে সূর্যালোকে—৭০° সেন্টিগ্রেড

সুইজ্যারল্যাণ্ডে:

৪৫০০ মিটার/১৪৭৬০ ফুট উচ্চতায় বাতাসের তাপমাত্রা ছায়ায়—২.৫° সেন্টিগ্রেড
গ্রীষ্মকালে সূর্যালোকে— ৩৭° সেন্টিগ্রেড

কিলিমাঞ্জারোতে:

৪৩৭ মিটার/১৪৩৭৩ ফুট উচ্চতায় বাতাসের তাপমাত্রা ছায়ায়—১৪° সেন্টিগ্রেড
গ্রীষ্মকালে সূর্যালোকে—৮৭° সেন্টিগ্রেড

উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা দ্রুত হ্রাস পায়। কিন্তু সূর্যালোকে ৩৫০০ মিটার/১১৫০৮ ফুট উচ্চতার তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। ৪২০০ মিটার/১৩৭৭৬ ফুট উচ্চতায় সূর্যালোকে তাপমাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। নিম্নতাপমাত্রা থাকা সত্ত্বেও উচ্চ হিমালয়ে সূর্যালোকে আবৃত সবকিছুই দ্রুত উত্তপ্ত হয়। এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি নিম্ন-অঞ্চলের চাইতে অনেক বেশী।

হিমালয়ের নিম্ন-অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয়। উচ্চ হিমালয়ে হয় তুষারপাত। তুষার-পাতের ফলে শীতলতা বৃদ্ধি পায়। বায়ুমণ্ডলে জলীয়বাষ্পের তাপমাত্রাও হ্রাস পায়। তুষার-সীমায় তুষারপাত বৃদ্ধির ফলে সেখানে প্রচুর তুষার-সঞ্চিত হতে থাকে। উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই অঞ্চলের পরিমিত তুষারপাত হয় না। কিন্তু শীতে ও বর্ষায় প্রচুর তুষারপাত হয়ে প্রচুর তুষার-সঞ্চিত হতে থাকে। সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে অথবা অক্টোবরের শুরুতে তুষারপাত শুরু হতে থাকে। স্থায়ীভাবে তুষার জমে থাকা নির্ভর করে শীতের নিয়মিত তুষারপাতের ওপর। এপ্রিল-জুন মাসে গ্রীষ্মে শীতের তুষার গলতে থাকে। শীতের তুষারপাতের পরিমাণও সঞ্চয় সাধারণতঃ নির্ভর করে আবহাওয়ার ওপরে। পর্বতশৃঙ্গের গঠনপ্রকৃতি ও ঢালের ওপরে কিছুটা নির্ভর করে। অর্থাৎ পর্বতের ঢাল যদি পূর্ব বা পশ্চিম দিকে থাকে, যেখানে সূর্যের কিরণ বেশী পরিমাণ পড়ে, সেখানকার সঞ্চিত বরফের পরিমাণের অনেক অংশই গ্রীষ্মে গলে যায়। গ্রীষ্মে শীতের বরফ কিছুটা গলে গিয়ে নিম্নে ভূমিকে আর্দ্র করে, অনেক অংশ বরফই বাষ্পীভূত হয়। হিমালয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে ৩৫০০ মিটার/১১৪৮০ ফুট উচ্চতা থেকে ৪০০০ মিটার। ১৩১২০ ফুট উচ্চতায় মাটির ওপরের দিকের উচ্চতা জুন মাসে—

সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১৩°৫´ সেন্টিগ্রেড

সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৫° সেন্টিগ্রেড

মাটির ১৫ সেন্টিমিটার/৫.৯০ ইঞ্চি নীচে গ্রীষ্মের তাপমাত্রার হেরফের হয় না। মাটির গভীরতা ৫ সেন্টিমিটার। ১.৯ ইঞ্চি বাড়লে তাপমাত্রার তারতম্য ২০ সেন্টিমিটার/৭.৮৭ ইঞ্চি গভীরতায় মাটির তাপমাত্রার তুলনায় বেশী তারতম্য ঘটে না। অর্থাৎ মাটির ওপরের তাপমাত্রার তুলনায় মাটির অভ্যন্তরের তাপমাত্রার তারতম্য খুবই কম হয়।

হিমালয়ের উচ্চ উপত্যকায় উদ্ভিজ্জের আকৃতি, প্রকৃতি, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করতে হলে এক একটি উপত্যকায় প্রাক বর্ষা ও বর্ষার পরবর্তী সময় অবস্থান করতে হয় ফুল ফোটার সময় থেকে ফুল ঝরে পড়ার সময় পর্যন্ত। ফুল ফোটার

হাসি-আনন্দ আর ঝরে পড়ার বেদনা নিংড়ে আনতে হবে, তবেই তো পর্যবেক্ষণ। ফুল ফুটেছে, প্রজাপতি, শুয়াপোকা এমনকি বীট্‌ পোকাগুলোর মহোৎসব। বর্ষায় সব শেষ, সব আনন্দের পরিসমাপ্তি। বর্ষার তুষারপাত হয়তো বা অতর্কিত আক্রমণ। ফুলের কোমল পাপড়ি হিমশীতলের আঘাতেই ঝরে পড়ে যায়। ফুল সব চাপা পড়ে যায়, সমাধিস্থ হয় শ্বেতশুভ্র তুষারের মধ্যে। মুহূর্তের মধ্যে সমাধির স্থানগুলোও অপরিচিত হয়ে থাকে। আবার তারা দেখা দেবে পরবর্তী বর্ষার পূর্বে নবকলেবর ধারণ করে। বর্ষার পরবর্তী সময়ে ফুল ফোটে স্বাভাবিকভাবেই, ঝরেও পড়ে। শীতের শুরুতে তুষার-ঝড়, তুষারপাত এসে ঢেকে ফেলে সমস্ত ফুল তার গাছপালা। উচ্চ হিমালয়ের পরিবেশের সঙ্গে তুন্দ্রা অঞ্চলের কিছুটা মিল রয়েছে। তাই হিমালয়ের বিভিন্ন উদ্ভিজ্জের মধ্যে কিছু কিছু প্রজাতির সন্ধান পাওয়া যাবে তুন্দ্রা অঞ্চলে। স্থান-কাল ভেদের তারতম্যের মধ্যেও উদ্ভিজ্জের আপাত সাদৃশ্যের ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে HOPKINS-BIC-CLIMATIC LAW-এর মধ্যে। উচ্চ উপত্যকার উদ্ভিজ্জ ও তুষারাবৃত তুন্দ্রা অঞ্চলের উদ্ভিজ্জের মধ্যে আপাত সাদৃশ্য লক্ষ্য করলেও মূল বৈশিষ্ট্যের ভেতরে অনেক ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যাবে। এই তুন্দ্রা অঞ্চলের উদ্ভিজ্জ উত্তর অক্ষাংশে অত্যন্ত নিম্ন তাপমাত্রায় জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখতে অভ্যস্ত হয় নিম্ন উপত্যকায়। সেখানে নিম্ন-চাপজনিত সমস্যা নেই। কিন্তু শীতলতম পরিবেশ, সূর্যালোকের অপ্রাচুর্য, সূর্যতাপে যথাযথ উচ্চতার অভাবে জীবন-ধারণ করতে হয়। কালক্রমে পরিবেশ অনুযায়ী উদ্ভিদের দেহ গঠিত হয়, পুষ্টি সাধন ঘটে ; জীবনচক্র সমাপ্ত করে যথাযথভাবে। কিন্তু উচ্চ উপত্যকার পরিবেশ, নিম্ন চাপমাত্রা উপযোগী বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে পারে না। উত্তর অক্ষাংশে সূর্যের তাপ বাতাসকে যথেচ্ছ উষ্ণ করতে পারে না বলে শীতলতম পরিবেশের সৃষ্টি হয়। উচ্চ উপত্যকায় শীতলতম পরিবেশ সৃষ্টির অন্যতম কারণ নিম্ন চাপযুক্ত বাতাস ও প্রখর সূর্যকিরণ। উচ্চ উপত্যকায় ইন্‌সলেশন খুবই বেশী। কিন্তু উত্তর অক্ষাংশে ইনসলেসন ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। সুতরাং উদ্ভিজ্জজীবনে প্রতিক্রিয়া, বিক্রিয়া এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশকে মেনে নেবার প্রচেষ্টা যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করলে তুষার ও তুন্দ্রা অঞ্চল এবং উপত্যকা অঞ্চলের মধ্যে মূলতঃ তফাৎ দেখতে পাওয়া যাবে। উত্তর অক্ষাংশ ও উচ্চ উপত্যকা অঞ্চলকে শীতল মরুভূমি বলা যেতে পারে উষ্ণ মরুভূমি অঞ্চলের পরিবেশ পর্যালোচনা করলে। উত্তর অক্ষাংশ অঞ্চল ও উচ্চ উপত্যকা অঞ্চলের উদ্ভিজ্জ শুষ্ক ধরনের। উদ্ভিজের শুষ্কতার শুরু ও বৃদ্ধি পাবার কার্যকারণ শীতল মরুভূমি ও উষ্ণ মরুভূমির মধ্যে সম্পূর্ণ আলাদা।

তুন্দ্রা ও তুষার অঞ্চলের শুষ্কতা সৃষ্টি ও বৃদ্ধির কারণ মাটিতে জলীয়বাষ্পের সম্পূর্ণ অভাব। তীব্র শীতল পরিবেশের জন্যই শুষ্কতা শুরু হতে থাকে। তীব্র শীতের জন্য ভূমির ওপরেও কয়েক সেন্টিমিটার/ইঞ্চি গভীর পর্যন্ত তুষারকণা বার বার জমে কঠিন বরফে রূপান্তরিত হতে থাকে। এই বরফ গ্রীষ্মকালেও গলে না। খুবই কম ইনসলেসন ও রাত্রিতে বারবার জমে যাওয়া কঠিন বরফ ভেদ করে উদ্ভিদের মূল খাদ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়। অথবা রস সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়। অথবা রস সংগ্রহ করতে সমর্থ হয় না। ফলে মূলের বাইরের অংশ যেটুকু ভূমির ওপর থাকে, সে অংশ শুষ্কতায় আক্রান্ত হয়।

উষ্ণ মরুভূমি অঞ্চলের ভূমিতে যে শুধু জলীয়বাষ্পের অভাব বা আর্দ্রতার অভাব, তাই নয়; আবহাওয়ায় শুষ্কতার পরিমাণ এত বেশী যে ইনসলেসন ও বিকীরণের তীব্রতাও বেশী। ফলে উদ্ভিদের মূল কোনক্রমেই মৃত্তিকা ভেদ করে জলীয় পদার্থ সংগ্রহ করতে পারে না। এই কারণে উদ্ভিদের মূলের যে অংশ মৃত্তিকার ওপরে থাকে, সেখান থেকে শুষ্কতা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

শীতলতম মরুভূমি তুন্দ্রা ও তুষার অঞ্চলের সঙ্গে উচ্চ হিমালয় অঞ্চলের পরিবেশের তুলনা করলে দেখা যায় যে, সেই অঞ্চলের মৃত্তিকা বরফ গলা জল সংগ্রহ করে সরস হয়। দিনের বেলায় সূর্যকিরণ প্রখর হয় ইনসলেসনের জন্য। আপাতত শুষ্কতা থেকে রক্ষা পাবার জন্য উদ্ভিদের যে অংশ মৃত্তিকার অভ্যন্তরে থাকে, সেই অংশ মৃত্তিকাস্থ জল সংগ্রহ করে সরস হয়ে ওঠে। সেই সব উদ্ভিদগুলো Succulent হয়ে ওঠে। অপরদিকে শুষ্ক আবহাওয়া ও বাতাসের তীব্র ইনসলেসন। প্রচণ্ড বাতাসের বেগ, এইসব কারণে মৃত্তিকার বাইরের আস্তরণ দ্রুত শুষ্ক হয়ে উদ্ভিদগুলোকে মারাত্মক শুষ্কতার শিকার করে তোলে।

শুষ্কতার মূল কার্যকারণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান করলে মোটামুটি যে সব সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়া যায় সেগুলো :

উচ্চ উপত্যকার উদ্ভিজ্জ—আবহাওয়াতেই শুষ্কতার পরিবেশ ;

তুন্দ্রা অঞ্চলের উদ্ভিজ্জ—মৃত্তিকায় অপ্রচুর আর্দ্রতা ও জলীয় পদার্থের অভাব ;

উষ্ণ মরুভূমির উদ্ভিজ্জ—মৃত্তিকায় ও বাতাসে জলীয়বাষ্পের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি।

উদ্ভিজ্জের শুষ্ক চরিত্র বৃদ্ধি পাবার কারণগুলো পর্যালোচনা করা যেতে পারে :

বাতাসে প্রচণ্ড স্বচ্ছতা, শুষ্ক আবহাওয়া ও শুষ্ক পরিবেশ, বায়ুর উচ্চ চাপমাত্রা, মৃত্তিকায় স্বল্প জলীয়বাষ্প, তীব্র স্বচ্ছতা, তীব্র শীতল আবহাওয়া, প্রত্যক্ষ সূর্য-কিরণে তীব্র ইনসলেসন, অবশ্য মৃত্তিকায় জলীয় পদার্থ ও আর্দ্রতার প্রাচুর্য থাকা

সত্ত্বেও মৃত্তিকা প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জমে থাকায় জলীয়বাষ্পের অপ্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। তুষার ও তুন্দ্রা অঞ্চল, উচ্চ হিমালয় অঞ্চল, উষ্ণ মরুভূমি অঞ্চলের উদ্ভিজ্জ সাংঘাতিকভাবে শুষ্কতায় আক্রান্ত হয়েও জীবনযুদ্ধে বেঁচে থাকবার চেষ্টা করে।

উদ্ভিজ্জর শুষ্ক চরিত্র গড়ে ওঠার কারণ পর্যালোচনা করলে মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া যায় যে শুষ্কতা বৃদ্ধি শুরু হয় উদ্ভিজ্জর মূল থেকে। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ উদ্ভিজ্জ মৃত্তিকার ওপর প্রভাব সৃষ্টি করতে শুরু করে। উদ্ভিজ্জের মূল তখন মৃত্তিকাস্থ জলীয় পদার্থ সংগ্রহ করতে অসমর্থ হয়। জীবনযুদ্ধ শুরু হয় তখন থেকেই। অবশেষে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা চলে।

তুষার ও তুন্দ্রা অঞ্চলের উদ্ভিজ্জর মূল মরুভূমি অঞ্চলের উদ্ভিজ্জর মূল, উচ্চ হিমালয়ের উদ্ভিদের মূল মৃত্ত্যত পরিমিত রস সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েও বেঁচে থাকতে চেষ্টা করে কৃচ্ছ্রসাধন করে।

সমতলের বা নিম্ন অঞ্চলের উষ্ণ মরুভূমির উদ্ভিজ্জকে জল ও রস সংগ্রহ করতে হলে মূলকে প্রবেশ করতে হয় মৃত্তিকার গভীরে। মৃত্তিকার ওপরের স্তর শুষ্ক। দিবা ভাগে প্রচণ্ড সূর্যতাপে তীব্র ইনসলেসন-এর জন্য উত্তপ্ত হয়ে রুক্ষ ও শুষ্ক হয়। রাত্রে দ্রুত তাপ বিকিরণের ফলে মৃত্তিকার স্তর দ্রুত শীতল হতে থাকে। ফলে সামান্য শীততাপের ফলে উদ্ভিজ্জর প্রধান মূল অপ্রধান হয়ে গুচ্ছাকার হতে থাকে, ফলে মূলের দীর্ঘ অংশই মৃত্তিকার বাইরে ওপরেই থেকে যায়। উষ্ণতার তীব্রতার জন্য শুষ্কতার ফলে মরুভূমির ওপরকার মৃত্তিকা নীরস ও শুষ্ক হতে থাকে। উদ্ভিদের মূল তাই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকে। কিন্তু গাছের কাণ্ড শাখা-প্রশাখা দীর্ঘ হয় না।

এ কথা সত্য যে, মরুভূমির সমস্ত উদ্ভিজ্জের চরিত্র প্রায় একইরূপের। রাত্রিবেলায় বা শীতকালে মরুভূমির বালুকণা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হয়। সেই সময় প্রচণ্ড শীতে মৃত্তিকা জমে থাকে। অত্যন্ত শীতল কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করে উদ্ভিদ তার মূল বেশী গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে মূলের বেশীর ভাগই মৃত্তিকার ওপরেই পুষ্ট হতে থাকে। মূল পুষ্ট না হওয়ায় উদ্ভিদ দীর্ঘ না হয়ে বামনাকৃতি হয়ে ঝোপঝাড়ে পরিণত হয়। হিমালয়ের উচ্চ উপত্যকায় উদ্ভিদের প্রধান মূল মৃত্তিকার গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। বরফ গলা অপ্রচুর জল মৃত্তিকার ওপরের স্তরকে ক্ষণস্থায়ীভাবে সরস করে। প্রধান মূল কিন্তু এই অনিশ্চয়তার ওপরে নির্ভর করে মাটির গভীরে প্রবেশ করে না। তাই প্রধান মূল কালক্রমে অপ্রধান হয়ে গুচ্ছমূলে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং একথা নিশ্চিত অপ্রধান মূল সৃষ্টির পেছনে রয়েছে

ক্ষণস্থায়ী ঋতু। ভূ-পৃষ্টের অপর্যাপ্ত জলের যোগান থাকা, পারিপার্শ্বিক নিম্ন তাপমাত্রা ও চাপমাত্রা, উচ্চ পর্যায়ের আবহাওয়ার শুষ্কতা। উচ্চ উপত্যকায় বৃক্ষ শূন্যতা; লতাগুল্ম ও বিস্তীর্ণ তৃণভূমিযুক্ত উপত্যকা সৃষ্টির একমাত্র বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বলা চলে।

পর্যবেক্ষণের দ্বারা উদ্ভিদের মৃত্তিকা বহির্ভূত মূলের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে :

১. নিম্ন উপত্যকায় উষ্ণ মরুভূমি :

নিম্ন উপত্যকায় উষ্ণ মরুভূমি একমাত্র রাত্রি বেলা শীতল হয়। ভূ-পৃষ্ঠে শিশির কণা জমে রাত্রিবেলায়। দিনে তপ্ত বালুকণা শিশিরে ভিজে যায়। উদ্ভিদ এই স্বল্প রাত্রি কাটাতেই খাদ্য সংগ্রহ করে। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে রস নিষ্কাষিত করার কাজ সম্পন্ন করে। এই অঞ্চলের উদ্ভিদের পাতার রন্ধ্রের দ্বার প্রখর সূর্য তাপে রুদ্ধ থাকে। কেবলমাত্র রাত্রিবেলায় শীতল পরিবেশে পত্ররন্ধ্র দ্বার খুলে পর্যাপ্ত পরিমাণ শিশিরকণা সংগ্রহ করে প্রাণ ভরে। অনিয়মিত জল সংগ্রহের অনিশ্চয়তার ভয়েই হয়তো প্রয়োজনের অতিরিক্ত জলীয় পদার্থ সংগ্রহ করে কাণ্ডে সঞ্চিত করতে থাকায় কাণ্ড স্ফীত হয়। এইসব উদ্ভিদগুলো সাকুল্যান্ট উদ্ভিদ বলে পরিচিত। মরুভূমির উদ্ভিদ প্রখর সূর্যালোকে মৃত প্রায় হতে থাকে। রাত্রিবেলায় শীতল পরিবেশে স্নিগ্ধ সতেজ হয়ে কর্মতৎপর হয়। উদ্ভিদ জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ফুল ফোটার কাজ—তাই রাত্রিবেলাতেই সম্পন্ন করতে হয়। ফুলের রঙ অনেক ক্ষেত্রে তাই সাদা বা হলদে হয়। কাণ্ড থেকে ফুল ফুটতে থাকে। স্ফীতকায় কাণ্ডের সঞ্চিত রস উদ্ভিদের জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখে এমন প্রয়োজনীয় কাণ্ডকে আত্মরক্ষার জন্য প্রকৃতিদেবী কাণ্ডের সর্বাঙ্গে অসংখ্য কাটার সৃষ্টি করেছে।

২. উচ্চ-উপত্যকা :

উচ্চ-উপত্যকায় রাত্রে উদ্ভিদ জলীয়বাষ্প সংগ্রহ করে না। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পড়ে। উচ্চ উপত্যকার উদ্ভিদ কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে সূর্য ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই। ফুল ফোটার কাজ শুরু হয় প্রকাশ্যে দিবালোকে। তাই এই অঞ্চলে সাকুল্যান্ট কাটাজাতীয় উদ্ভিদ নাই বললেই চলে।

উচ্চ উপত্যকায় গ্রীষ্মকাল খুবই স্বল্পস্থায়ী। তার মধ্যে বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয় শীতের বরফ গলার কাজে। তারপর বরফ গলা জলে সিক্ত নরম মাটির বুকে উদ্ভিদের প্রাণস্পন্দন জেগে ওঠে। অল্প সময়ের মধ্যেই তখন অনেক

কাজ সম্পন্ন করতে হয়। নরম মাটির বুকে সুপ্তবীজ সোনার কাঠি রূপোর কাঠির স্পর্শে অঙ্কুরিত হয়। কচি কচি সোনালী পাতা প্রথম সূর্যালোক স্পর্শে সবুজ হয়ে ওঠে। শীত দীর্ঘ স্থায়ী হয়ে তুষারের আস্তরণের ভেতরে উদ্ভিদের বীজ অপেক্ষা করতে থাকে দ্রুত আত্মপ্রকাশের জন্য। সমস্ত শীতে বেঁচে থাকবার মতো উপযোগী খাদ্যবস্তু সঞ্চিত থাকে বীজের মধ্যে। শীত যেখানে দীর্ঘস্থায়ী গ্রীষ্ম তখন ক্ষণস্থায়ী। সেক্ষেত্রে শীতের বরফ গলা জলের স্পর্শ পেলেই নরম মাটির বুক ফুড়ে পত্রগুচ্ছের পরিবর্তে ফুলের কুঁড়িই আত্মপ্রকাশ করে। সূর্যের সোনালী আলোর স্পর্শে প্রভাতে অসংখ্য ফুল ফুটে সমস্ত উপত্যকা যেন ভরিয়ে রাখে অপরূপ যাদুস্পর্শে। ফুল ফোটা শুরু হলেই পত্রগুচ্ছ ও আত্মপ্রকাশ করে।

উচ্চ উপত্যকায় সব উদ্ভিদই কিন্তু শুষ্কতায় আক্রান্ত হয়ে পরিবেশ অনুযায়ী গঠন প্রকৃতি অর্জন করে না। অনেক প্রজাতিই দেখা যায় অত্যন্ত ক্ষীণজীবি, লতানো জাতীয় গাছ, যাদের পাতা ও কাণ্ড খুবই নরম ও কোমল। ফুলগুলো কিন্তু খুবই কমনীয়। অতি সহজেই এই সব উদ্ভিদ উপড়ে ফেলা যায় মাটি থেকে। এ সব ক্ষেত্রে উদ্ভিদের মূল অত্যন্ত কোমল ও আদৌ দীর্ঘ নয়। জীবনযুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী হবার মতো জীবন দায়ী খাদ্য সঞ্চয় করে রাখতে পারে না।

তুষার সীমার ধারে ভিজে পাথরের গায়ে সামান্য ফাটলের মধ্যে অনেক উদ্ভিদ দেখা যায়। স্যাতসেতে আর্দ্র পরিবেশে জন্ম ও বৃদ্ধি হয় বলে পরিবেশ অনুযায়ী উদ্ভিদ তাদের দেহের গঠন প্রকৃতি অর্জন করে। আরো বেশী উচ্চ উপত্যকায় কোন কোন প্রজাতি শুষ্কতার শিকার হয়ে তদনুযায়ী দেহ, প্রকৃতি গড়ে তোলে।

স্যাতসেতে ও আর্দ্র পরিবেশ পেরিয়ে শুষ্কতার পরিবেশ যুক্ত অঞ্চলের উদ্ভিদের প্রকৃতি ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়ে পরিবেশকে অগ্রাহ্য করতে পারেনি। বাধ্য হয়েই আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে স্থায়ী পরিবেশের কাছে। উদ্ভিদের দেহ, গঠন-প্রকৃতি অবশেষে পরিবেশ অনুযায়ী হয়েছে। সে সম্পর্কে বলা যায়:

১. অত্যন্ত কমনীয় নরম জাতীয় লতানো উদ্ভিদ প্রতি বছরই দেখা যায় স্যাতসেতে আর্দ্র পরিবেশের মধ্যে বসবাস করতে অভ্যস্থ।

২. অত্যন্ত কমনীয় নরম জাতীয় প্রজাতি, যেগুলো স্যাতসেতে পরিবেশে বসবাস করতে বাধ্য হয়, পরিবেশ অনুযায়ী দেহের গঠন ও প্রকৃতি অর্জন করে, সেগুলো যদি বা কোন কারণে শুষ্কতার শিকার হয়, বরফ গলা জল পেলেই আবার পুনরুজ্জীবিত হয়ে নিজস্ব দেহগত বৈশিষ্ট্য ফিরে পায়।

৩. স্যাতসেতে আর্দ্র পরিবেশে বসবাস করতে বাধ্য সব উদ্ভিদের দৈহিক গঠন

প্রকৃতি অদ্ভুতভাবে পরিবর্তিত হয়। সেগুলো সাধারণতঃ ঘাসজাতীয় উদ্ভিদ। এই ঘাস বিস্তীর্ণ উপত্যকা জুড়ে রাজত্ব বিস্তার করে থাকে।

৪. সম্পূর্ণ শুষ্ক পরিবেশে বসবাস করতে বাধ্য উদ্ভিদ্ কিন্তু পরিবেশ ও আবহাওয়ার সঙ্গে অতি সহজেই খাপ খাইয়ে জীবনধারণ করতে থাকে।

বিভিন্ন পরিবেশ, তাপমাত্রার তারতম্য বিচার করে অক্ষাংশ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদের গঠন-প্রকৃতিও পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তন আসে ধাপে ধাপে, ঠিক আকস্মিকভাবে নয়। পরিবর্তিত পরিবেশকে সহজে মেনে নেবার জন্য উদ্ভিদকে সহনশীল হতে হয়। সেই উদ্ভিদজীবনের বিস্ময়কর পরিবর্তন প্রতি ফলিত হয় দেহে, গঠনে ও সর্বশেষে ফুলে। পর্যবেক্ষককে পর্যবেক্ষণ করতে হয় দীর্ঘ দিন ধরে।

উদ্ভিদ যথার্থই উচ্চ উপত্যকার কিনা, অসংখ্য প্রজাতির ভেতর থেকে খুঁজে বার করে এ বিচার করা খুবই দুরূহ। কিন্তু ৩৬০০ মিটার/১১৪০৮ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত সমস্ত প্রজাতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। হিমালয়ের উচ্চ উপত্যকা, আলতাই, পামির মালভূমি, ভিয়েসান উপত্যকার উদ্ভিদগুলোর একমাত্র লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য—উদ্ভিদগুলো দীর্ঘদেহী নয়। দীর্ঘ বয়স হলেও পুরানো হয় না। বরং ক্ষুদ্রাকৃতি হয়ে দীর্ঘজীবি হয়। যথার্থই উচ্চ উপত্যকার উদ্ভিদগুলো দীর্ঘজীবি। মৃত্তিকার নীচে স্ফীতকায় হয়ে কন্দমূল হয়। মূল কদাচ শক্ত হয়, উদ্ভিদগুলো লতানো, মাটির বুকের সমান্তরালে দীর্ঘমূল ছড়িয়ে দেয় চারিদিকে। প্রধানমূল অপ্রধান হয়ে গুচ্ছাকার হবার প্রবণতা লাভ করে।

হিমালয়ের প্রজাতির মধ্যে অতি পরিচিত নাম—

অ্যানিমন্, র‍্যানানক্যুলাস, ম্যাকসিল্লাগা, অ্যাষ্টর, অ্যালারডিয়া, ক্রিম্যাস্থোডিয়াম, সস্যুরিয়া, প্রিমূলা, জেনসিয়ানা, পেডিকুলরিস, কোরাই ড্যালিস, ডেলফিনিয়াম, একোনাইট, পোলাইগোনাম, এপিলোরিয়াম। ঘাসের মধ্যে স্টীপা, ডয়াস্থোনিয়া।

গ্রীষ্মের শুরুতেই এই সব প্রজাতির মূল মাটির ওপর দিয়ে বিছিয়ে দেয়। শীতের বরফে সুপ্ত থাকা রাইজোম্ বা কন্দমূল বরফ গলা জলে ভিজে মাটি ফুড়ে ওপরে ওঠে সূর্যের তপস্যার জন্য। তপস্যায় সিদ্ধ হলেই বর লাভ। সোনালী পাতায় পাতায় ভিজেমাটি ঢেকে যায়। ঝাঁকে ঝাঁকে ফুলের কুড়ি মাথা তুলে দাঁড়ায়, অজস্র ফুলে ছেয়ে যায় চারদিক।

যে সব গাছের বীজ শীতের শুরুতেই ঝরে পড়ে মাটির বুকে, শীতের তুষার এসে ঢেকে ফেলে, সে সব বীজ আশ্রয় নেয় স্তূপীকৃত তুষারের মধ্যে। তারপর গ্রীষ্মের

প্রারম্ভে তুষার গলতে শুরু করে। তুষার গলা জলে সিক্ত মাটির বুকে বীজগুলো দ্রুত অঙ্কুরিত হয়ে অজস্র চারা গাছ মাটির বুকের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকে সগর্বে। সূর্যকিরণ সে কচি গাছগুলোকে শক্ত ও সবল করে। ধুসর মাটির বুক ঢাকা পড়ে যায় সবুজ পাতায়। ফুল ফোটে দ্রুত বেগে। সময়কে অবহেলা করা চলে না কোনমতেই। হাল্কা নরম ফুলের পাপড়ি তীব্র সূর্যকিরণে ঝলসে যেতে চায়। এর মধ্যে আকস্মিক আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে তুষারপাত শুরু হতে পারে। তুষারপাত ফুলের জীবনের অকাল মৃত্যু ঘটায়। তাই এ ধরণের বিপদ এড়িয়ে উদ্ভিদকে এগিয়ে যেতে হয় দ্রুত বেগে পূর্ণতার দিকে। ফুল ফুটিয়ে নীরব নিস্তব্ধ উপত্যকার বুকে হাসি, উল্লাস জাগিয়ে তোলে। ফুল ঝরিয়ে উদ্ভিদ জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাতে চায়। উচ্চ হিমালয়ে বসন্ত ক্ষণস্থায়ী। শীত শেষ হতে না হতেই সূর্যের প্রখর তেজ শীতের বরফ দেয় গলিয়ে। মাটি আর পাথর ভিজে গিয়ে সরস হয়, এই সময় থেকে শুরু করে পরবর্তী শীতের সময় পর্যন্ত বর্ষা আসে আবার তুষারপাত নিয়ে। বর্ষার পূর্বে ফুল ফোটার সময় আর বর্ষার তুষার গলে যাবার পর ক্ষণস্থায়ী বসন্তে ফুল ফোটার সময় আসে। ফুল ফোটার আনন্দ উচ্ছলতাকে স্তব্ধ করে মৃত্যুরূপী তুষার-পাত এসে। এর মধ্যে ফুলকে ফুটতে হয়, কারণ ফুল ফোটা উদ্ভিদ জীবনের পূর্ণতা নিয়ে আসে।

হিমালয়ের বর্ষা কোথাও মে মাস থেকে শুরু হয়, স্থায়ী হয় জুলাই মাস পর্যন্ত। বর্ষার তুষারপাত কিন্তু সূর্যের তাপের কাছে পাল্লা দিতে পারে না। চারদিকে উষ্ণ পরিবেশ, তুষার তাই জমতে পারে না। তুষারপাত ক্রমাগত চার পাঁচ দিন হলে—গলে নিঃশেষ হয় কয়েক দিনের মধ্যেই। এই ধরণের প্রাকৃতিক বিপর্যয় উদ্ভিদের জীবনে আদৌ নতুন ও অজানা কিছু নয়। তাই শীতের বরফ গলা শুরু হতেই নরম মাটিতে বীজের অঙ্কুরোদ্গম থেকে শুরু করে উদ্ভিদের পূর্ণতা প্রাপ্তি অর্থাৎ ফুল ফোটা, ফুল ঝরে যাওয়া, বীজের সঞ্চার পর্যন্ত সামান্য সময়ও নষ্ট করা চলে না। তারপরও বীজ পুষ্ট হবার পর থেকেই পূর্ণ হওয়ার সংক্ষিপ্ত সময়টুকু জীবনের জন্ম মৃত্যু ও পুনর্জন্মের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়।

নিম্ন অঞ্চলের উদ্ভিদের পুনর্জীবন চক্রের হিসাব পর্যবেক্ষণ করে দেয়া যায় যে, উচ্চ হিমালয়ে উদ্ভিদের জীবনচক্র খুবই সংক্ষিপ্ত। উপত্যকার উচ্চতা যত বৃদ্ধি পায়, জীবনচক্র তত সংক্ষিপ্ত হতে থাকে। এই সংক্ষিপ্ত সময়কে ধরে রাখতে হয় উদ্ভিদগুলোকে। সেই বিস্ময়কর ফুল ফোটার মুহূর্ত দেখবার জন্য পর্যবেক্ষককে

সচেতন হয়ে থাকতে হয় বৈকি। বর্ষার পরবর্তী সময়ে উদ্ভিদগুলোর জীবনযাত্রা প্রাকবর্ষার জীবনযাত্রার মতোই। সাধারণতঃ প্রাক-বর্ষার ফুল বর্ষার পরে ফুটে সমস্ত উপত্যকা ভরিয়ে রাখে না। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও বসন্ত উচ্চ হিমালয়ের উদ্ভিদজীবনে এই চারটি ঋতুই প্রকট। শীত দীর্ঘ স্থায়ী, বৎসরের প্রায় অর্ধেকটাই দখল করে থাকে। পরবর্তী ছয়মাসের মধ্যে .বর্ষা এসে সমস্ত উদ্ভি.দর জীবনযাত্রাকে পৃথক করে ফেলে। প্রাক-বর্ষার উদ্ভিদ বর্ষার জল ও তুষার এসে হিমশীতল পরিবেশে জীবনচক্রের সমাপ্তি ঘটায়। বর্ষার প্রায় মাস দুয়েক তাণ্ডব পেরিয়ে গেলে বসন্তের উদ্ভিদগুলোর জীবনচক্র ঘুরতে শুরু করে দ্রুত লয়ে। কারণ শীত যে দোড়গোড়ে অপেক্ষমান। তার আগেই জীবন শেষ হয়ে গেলে জীবনচক্র যে অসম্পূর্ণ থাকবে! প্রজাতিগুলো যে অকালে প্রাণ হারিয়ে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যাবে!

উচ্চ উপত্যকায় শীতকাল উদ্ভিদজীবনে ঘুমিয়ে থাকার সময়। উদ্ভি.দর বীজ, কন্দমূল, বরফের তলায় চাপা পড়ে থাকে নতুন জীবন শুরু করবার আগে পর্যন্ত। উদ্ভি.দর ভ্রূণ তখন ফুল ফোটার স্বপ্ন দেখতে থাকে। গ্রীষ্মকাল আসবে বরফের আস্তরণ ভেদ করে। আত্মপ্রকাশের আহ্বানে, ঘুম ভাঙ্গে ডাক শুনেই। প্রস্তুতি নেই হয়তো, তাই কোন কোন প্রজাতি ফুলের কুঁড়িগুলোই পাঠিয়ে দেয় মাটির ওপরে। নরম মাটির বুক ফুড়ে আত্মপ্রকাশ করে আকাশের নীল রঙ আর সূর্যের প্রখর কিরণ শুষে নিয়ে ফুলগুলোও নানা রঙ ছড়িয়ে দেয়। উদ্ভি.দর এই জীবনযাত্রা আসলে প্রচণ্ড শীতল পরিবেশ আর বরফের নীচে ঘুমিয়ে থাকার পর গ্রীষ্মের বা বসন্তের শুরুতে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ পরিবেশ পাবার ফলেই। শীতের পূর্বেই উদ্ভিদ অত্যন্ত ব্যস্ত জীবনযাপন করতে শুরু করে। সময় সংক্ষিপ্ত অথচ সেই সময়ের মধ্যেই জীবন নাট্যের সব অধ্যায়ই পূর্ণ করতে হবে। ৩০০০ মিটার/৯৮৪০ ফুট উচ্চতা থেকে আরো বেশী উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাক-বর্ষার ফুল ফোটার সময় ও বর্ষার পর থেকে শীতের আগে বসন্ত সময় পর্যন্ত ফুল ফোটার সময় সংক্ষিপ্ত থেকে সংক্ষিপ্ততর হতে থাকে। তুষার সীমার ওপরে স্বল্প মাটি আর পাথরের ওপরকার বরফের আস্তরণ গ্রীষ্মেও যখন গলতে চায় না, ঠিক তখনই বর্ষা আবার নতুন করে তুষারপাত শুরু করে। বর্ষার পরবর্তী সময় আগস্ট সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাস পর্যন্ত সময়কে ভরসা করে সামান্য উষ্ণতা বুকে নিয়ে ফুল ফুটতে চেষ্টা করে। ফুল ফোটার সময় নির্ভর করে সেই উষ্ণতায় শীতের বরফ গলে যাবার সময়েরও পরে। তুষার সীমার কাছাকাছি শীতের বরফ গলতে আগস্ট মাস লেগে যায়। সে ক্ষেত্রে অনেক সময়

বর্ষার ফুলগুলো বসন্তের শুরুতে আত্মপ্রকাশ করে। সে ক্ষেত্রে মাটির বুকেই যেন কুঁড়িগুলো অপেক্ষা করছিল। অপেক্ষা করছিল সামান্য বরফ গলা জলের উষ্ণতার জন্য। বরফ গলতে শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে নরম ভিজে মাটির বুকে অসংখ্য ফুলের মিছিল। যেন কার আগে কে আত্মপ্রকাশ করবে !

তুষার সীমার উপরে বিশেষ বিশেষ প্রজাতি ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়, এক অংশ থেকে অপর অংশে। সর্বশেষে তুষার রেখার সীমানা পেরিয়ে হিমবাহের গা ঘেঁষে স্বল্প পরিসর স্থানে সামান্য একটু পাথরের ঢালে ছোট কলোনী সৃষ্টি করে নেয়। তারপর শুরু হয় কঠিন জীবনযুদ্ধ। হিমশীতল বাতাসের ঝাপটা, বরফের স্পর্শ, এসব এড়িয়ে দেহের প্রয়োজনীয় উত্তাপ সংরক্ষণ করে উদ্ভিদ তাদের জীবনচক্রের সমস্ত অংশই পূর্ণ করবার চেষ্টা করে। ফুল ফোটে, ফুল ঝরে আবার আগামী দিনে ফুল ফোটার প্রতিশ্রুতি নিয়ে। বছরের পর বছর তুষারপাতের তারতম্য, হিমবাহের গতিপ্রকৃতির ওপরে সে অঞ্চলের পরিবেশ পরিবর্তিত হয় বলে, প্রজাতি-গুলো স্থায়ীভাবে বাসস্থান গড়ে তুলতে পারে না। ফলে প্রজাতিগুলো যেমন বাসস্থান পরিবর্তিত করে, ফুল ফোটার সময়ও পরিবর্তিত হয়।

প্রিমুলা ডেন্টিকুলাটার বেশ কয়েক ঝাঁক ফুল আমি সেপ্টেম্বর মাসে দেখেছিলাম সিকিমে আপার চৌরিকিয়াং-এ। অবাক হয়ে গিয়েছিলাম দেখে। প্রাক-বর্ষার-ফুল এ সময় এলো কেমন করে ? পর বৎসর অক্টোবরের শেষের দিকে এই ফুলই দেখেছিলাম সিকিমে জোংরিলায়। তেমনি সেপ্টেম্বর মাসে পিণ্ডারী উপত্যকায় বেশ উচ্চতায় বরফের ঢালের পাশে দেখেছিলাম সাদারঙের প্রিমুলা ইনভ্যালুক্রাটা। অক্টোবরের প্রথম দিকটায় ভাগীরথী পর্বত (২)-এর পাদদেশে বেশ বড় একটা পাথরের আড়ালে দেখেছিলাম গাঢ় নীল রঙের প্রিমুলা মাইক্রোফাইলার কয়েকটি ফুল। সদ্য ফুটেছে ফুলগুলো, স্থানটির উচ্চতা পনের হাজারের মতো হবে। অসময়ে প্রিমুলা এ যেন বিশ্বাস করা যায় না ! প্রাক-বর্ষার ফুল এসে বসন্তে প্রস্ফুটিত হয়েছে ভাবতে আনন্দ হয়েছিল। তবে কারণ সম্পর্কে ভাবিয়ে তুলেছিল আমাকে। এর কারণ হিসাবে মনে হয় শীতের সঞ্চিত বরফ নিম্ন উপত্যকা থেকে শুরু করে উচ্চ উপত্যকা পর্যন্ত প্রসারিত থাকে। গ্রীষ্মের শুরুতেই পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উষ্ণতা প্রসারিত হতে থাকে নিম্ন উপত্যকা থেকে উচ্চ উপত্যকা পর্যন্ত। ফলে বরফ গলার কাজ শুরু হয় স্থানীয় উপত্যকার উচ্চতা অনুসারে। বরফ গলার অর্থ উপত্যকা সরস হয়ে ওঠা। নিদ্রামগ্ন উদ্ভিদের বীজের ঘুম ভাঙে। প্রকৃতি তখন নতুন সাজে সাজতে শুরু করে। গ্রীষ্মের উষ্ণতা যেমন ধাপে ধাপে এগিয়ে যায় উচ্চ

উপত্যকার দিকে, বরফ গলার কাজও সম্পন্ন হয় ধীরে ধীরে। উদ্ভিদের নানা প্রজাতিও বরফ মুক্ত উপত্যকায় নতুন করে কলোনী স্থাপনে ব্যস্ত থাকে। পেছনে পড়া কলোনী, গত বছরের শুকিয়ে যাওয়া প্রজাতি গুটি গুটি এগিয়ে চলে, নতুন করে পুন-রুজ্জীবনের কাজ শুরু হয়। উদ্ভিদের পুনরুজ্জীবনে নতুন অগ্রগতি, নতুন করে কলোনীতে অসংখ্য ফুল ফোটার নজির দেখতে পাওয়া যায়। পর্বত-গাত্রের ধারে, ঝরনার তীরে তীরে, হিমবাহের পার্শ্বে অসংখ্য রঙের সমাবেশ। বিশাল প্রকৃতির বুকে রঙীন গালিচা যেন এগিয়ে চলেছে নতুন করে ফুলের বাসর রচনার জন্য। তুষার সীমানা হয়তো এগিয়ে যেতে থাকে অত্যন্ত ধীরগতিতে। হিমবাহের স্নাউট পিছিয়ে যেতে থাকে। গ্রাবরেখার পাথরগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে থাকে বিভিন্ন প্রজাতির বাসোপযোগী কলোনী স্থাপন করার সাহায্যের জন্য।

তুষার সীমার গা ঘেঁষে বিভিন্ন প্রজাতির কলোনী গড়ার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হয় প্রকৃতির এক অদৃশ্য ইঙ্গিতে। সেখানকার উপযুক্ত আর্দ্র আবহাওয়া, বরফ গলা জলের ধারায় সিক্ত মাটি ও পাথর আর সেই মাটি ও পাথরে নানা ধরনের খনিজ পদার্থের অবস্থান উদ্ভিদের পুষ্টির পক্ষে সহায়ক হয়। তুষার সীমার ওপরে ছোট ছোট নন্দনকানন পর্যবেক্ষকদের নীরব আমন্ত্রণ জানায়। গ্রীষ্মের শুরুতেই দেখা যায় শুকিয়ে যাওয়া অনেক প্রজাতি। শুকিয়ে গেলেও তাদের মৃত্যু ঘটে না। কারণ, সেগুলোর কন্দমূল, গুচ্ছমূল শীতের বরফেও নষ্ট হয় না। কন্দমূলের মধ্যে প্রচুর প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও উত্তাপ সংরক্ষণের জন্য তৈলজাতীয় পদার্থ থাকে। সেগুলো শীতের পরবর্তী গ্রীষ্মের বরফ গলা জলে যেন পুনর্জন্ম লাভ করে। পুষ্ট হয়ে ফুলের কুঁড়ি নিয়ে মাটির বুকে আত্মপ্রকাশ করে। উদ্ভিদ এই বরফের নীচে দীর্ঘ নিদ্রায় মগ্ন থাকলেও কিন্তু গ্রীষ্মের সাড়া পাবার আশায় সজাগ থাকে। বরফ গলা জলের স্পর্শে ঘুম ভাঙে। তখন থেকে শুরু করে উদ্ভিদের ফুল ফোটার কাল পর্যন্ত এত সংক্ষিপ্ত সময় যে, উদ্ভিদ তাই পূর্ণতা পাবার অবকাশ পর্যন্ত পায় না। ফলে সময়ের অভাবে উদ্ভিদ খর্বাকৃতি হয়। জেমু হিমবাহ অঞ্চলে একবার প্রিমুলা ডেন্টিকুলাটার গাছ মাত্র আধ ইঞ্চি দীর্ঘ দেখেছিলাম। অথচ, এই প্রিমুলার গাছ আমি দুই তিন ইঞ্চি দীর্ঘ হতে দেখেছি।

উচ্চ উপত্যকার উদ্ভিদগুলোর বৈশিষ্ট্য বিচার করা যায় পাতার বর্ণ-বিন্যাস লক্ষ্য করলে। তুন্দ্রাঅঞ্চলের উদ্ভিদগুলোর পাতা পূর্ণ সবুজ বর্ণ না হয়ে নীলাভ সবুজ হয়। কারণ, এই অঞ্চলের উদ্ভিজ্জের ওপরে শতকরা ৫৫ অংশ ইনফ্রা-রেড রশ্মি

প্রতিফলিত হয়। কিন্তু উচ্চ হিমালয়ের উপত্যকার উদ্ভিদগুলোর পাতা হল্‌দেটে সবুজ রঙের হয়। অনেক সময় পাতার রঙ ব্রাউন বা গাঢ় ব্রাউন রঙের হতেও দেখা যায়। কারণ, উচ্চ উপত্যকায় ইনফ্রা-রেড রশ্মির মাত্র শতকরা ষোল অংশই উদ্ভিদের ওপরে প্রতিফলিত হয়। এই অদ্ভুত বর্ণ-বিন্যাস ঘাসের পাতাতেই বিশেষ করে দেখা গিয়েছে। ভাগীরথীর দ্বিতীয় শৃঙ্গের পাদদেশে গাঢ় ব্রাউন রঙের ঘাস পর্যবেক্ষণ করেছি। পামীর মালভূমি ও হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলের উদ্ভিদের বর্ণ-বিন্যাস দেখতে পাওয়া যায় বিভিন্ন প্রজাতিগুলোয়। সেই প্রজাতি অপেক্ষাকৃত নিম্ন-উপত্যকায় দেখতে পাওয়া গেলেও সেখানেও অবশ্য এই বর্ণ-বিন্যাস দেখা যায়। সেখানে উদ্ভিদে ক্লোরোফিল সঞ্চিত হয় কম। সম্ভবতঃ উদ্ভিদে ক্যারোটিন সঞ্চিত হয় বলেই, বিশেষ করে পামীর অঞ্চলে গাছের পাতাগুলোর বর্ণ-বৈচিত্র্য দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য এই ধরনের উদ্ভিদগুলোর পাতায় বিচিত্র বর্ণ দেখা যায় হিমালয়ের অনেক স্থানেই। উচ্চ হিমালয়ে, বিশেষ করে তুষার সীমার সন্নিকটের উদ্ভিদগুলোর বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। উচ্চতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদের পাতাগুলো খুবই পাত্‌লা, হালকা ও সুগন্ধিযুক্ত হয়। ছোট ছোট পাতা ও কাণ্ডে তৈলাক্ত পদার্থ থাকে বলেই উদ্ভিদের পাতাগুলো গন্ধযুক্ত। আরো উচ্চতায় হিমবাহের সন্নিকটে উদ্ভিদের দেহ পাত্‌লা রোম যুক্ত আবরণে ঢাকা। পরতে পরতে তুলোর মতো আবরণে আবৃত প্রজাতিগুলো দেখতে পাওয়া যায়। উদ্ভিদের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যাবে, যতই তুষার সীমারেখার নিকটতর হতে থাকবে। কোন কোন প্রজাতির গায়ে ধূসর বর্ণের রোম পাওয়া যাবে দেখতে। অনেক সময় রোমগুলো শক্ত ও শুঁয়ার মতো। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে :

CHEIRANTHUS (চেইরান্থাস্‌), টমিনটোস্‌ (TOMINTOSE), ড্যাবা (DRABA) :

পশমের বা তুলোর মতো আবরণযুক্ত প্রজাতি—

স্সুরিয়া (SAUSSUREA), হেলিক্রাইসাম (HELICHRYSUM)

বাসস্থান দেখা যাবে ৪২০০ মিটার (১৩৭৭৬ ফুট) উচ্চতা থেকে ৫২০০ মিটার (১৭০৯৬ ফুট উচ্চতায়, হিমবাহের বরফের ধারে পাথরের খাঁজে অথবা পাথরের গায়ে গায়ে।

হিমালয়ের বিভিন্ন উপত্যকায় যেসব উদ্ভিদ দেখা যায়, সেগুলোর ফুলের রঙ সাধারণতঃ হলদে, কমলা, গাঢ় বেগুনী, টক্‌টকে লাল, গোলাপী, গাঢ় গোলাপী, সাদা, হাল্‌কা বেগুনী। নীল ও হাল্‌কা বেগুনী রঙের ফুলযুক্ত প্রজাতির সংখ্যা খুব বেশী

নয়। উচ্চ হিমালয়ের ফুলগুলোর উজ্জ্বল রঙের কারণ—চারদিকে আলট্রা ভায়োলেট রঙের ছটা। ফুলগুলোর উজ্জ্বল রঙে আকৃষ্ট হয়ে পতঙ্গ (DIPTERA ও LEPIDOTERA) ছুটে আসে ফুলের কাছে। এই পতঙ্গই ফুলের পরাগ নিষিক্তকরণের কার্যে সহায়তা করে। বিনিময়ে ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে। বিভিন্ন উচ্চতায় কীটগুলো ছোট ছোট উদ্ভিদের গায়ে বসে থাকে। উচ্চ উপত্যকায় ছোট ছোট উদ্ভিদের গোড়ায় উষ্ণ আশ্রয়ে কীটগুলো বেঁচে থাকে। সেসব কীটগুলোর সর্বাঙ্গে শক্ত খোলসের বাইরেও মসৃণ রেশমের মতো শুঁয়া দেখতে পাওয়া যায়। হয়তো প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় তাপ সংরক্ষণে সহায়তা করে।

উচ্চ উপত্যকায় অবস্থিত উদ্ভিদগুলোর আকৃতি, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করলে পরিবেশের কথাও ভাবতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ, আবহাওয়া, উচ্চতা, ভৌগোলিক অবস্থান, চাপমাত্রা অনুসারে উদ্ভিদের মূল চরিত্র বিন্যাস করা যেতে পারে। সেই অনুসারে দেখা যায় যে:

১. **উচ্চ উপত্যকা**—যেখানে শুকনো পাথর, তুষারাবৃত অংশে অবস্থিত পাথর, তুষার থেকে মুক্ত, হিমবাহে, বরফের ওপরে, যেখানকার উচ্চতা ৬৩০০ মিটার/ ২০৬৬২ ফুট-এর বেশী, সেখানকার বরফ ও তুষার গলে কোনক্রমে সামান্য জল এসে পাথরগুলোকে সিক্ত রাখতে চায় গ্রীষ্মকালে, সেখানে বিশেষ প্রজাতি 'লাইচেন' দেখতে পাওয়া যাবে।

২. **প্রস্তরময় অঞ্চল**—যেসব পাথর গ্রীষ্মে বরফগলা জলে সিক্ত থাকে, সেই অংশ প্রচণ্ড হাওয়ায় ও প্রচণ্ড শীতাতপ থেকে আচ্ছাদিত তুষারসীমা থেকে বৃক্ষসীমার কাছাকাছি অঞ্চল। সাধারণতঃ মস্ (Moss), ঘাস, একদল ও দ্বিদল বীজযুক্ত প্রজাতি এই অঞ্চলে দেখা যাবে। অবশ্য এই অঞ্চলের ঘাসগুলির বর্ণ-বৈচিত্র্য দেখতে পাওয়া যাবে।

৩. **পাথরের খাদে বা ফাটলে**—যেখানে তুষারপাত ও হিম-শীতল বাতাস থেকে মুক্ত, সেখানে অসংখ্য তৃণ ও দ্বিদল পত্রযুক্ত উদ্ভিদ দেখতে পাওয়া যাবে। এইসব উদ্ভিদগুলোর বিচিত্র ফুলের সম্ভার মনকে ভরিয়ে রাখে।

৪. **তুষাররেখার সন্নিকটে**—বরফগলা জলে সিক্ত পাথর ও মৃত্তিকায় অসংখ্য দ্বিদল বীজপত্রযুক্ত প্রজাতি দেখতে পাওয়া যাবে।

৫. **তৃণাঞ্চল**—উচ্চ উপত্যকায় অপেক্ষাকৃত সমতল অংশে বিস্তীর্ণ তৃণাঞ্চল, তারই মাঝে মাঝে অসংখ্য দ্বিদল পত্রযুক্ত প্রজাতিও দেখতে পাওয়া যায়।

৬. **উচ্চ হিমবাহ অঞ্চল**—হিমবাহের বরফ গলে অনেক সময় ছোট ছোট হিম সরোবরের সৃষ্টি করে। সেখানে জমা শেওলা দেখতে পাওয়া যাবে।
চতুরঙ্গী হিমবাহে এমনি একটি হিমসরোবরের ওপরে দেখেছি প্রচুর শেওলা। জল সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখেছি—গাঢ় লাল রঙের কোন বিশেষ কীটের লার্ভা। সেই লার্ভাগুলো ৪° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায়ও সুন্দর সচল অবস্থায় দেখেছি।
উচ্চ হিমালয়ের বিভিন্ন স্থানে নানা জাতীয় উদ্ভিজ্জের সংস্থান রয়েছে। একশো বছর পূর্ব থেকেই উদ্ভিদবিজ্ঞানী, পর্যবেক্ষক, অভিযাত্রীরা পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন প্রজাতির সঙ্গে পরিচয় রাখতে চাইছে। অনেক প্রজাতিই শুধুমাত্র উচ্চ হিমালয়ে বসবাস করছে, তা নয়। পামীর মালভূমি, আলতাই চীন সীমান্তের পার্বত্য অঞ্চল, আন্দিজ পর্বতমালা, কিলিমাঞ্জারো, কেনিয়া, উত্তর গোলার্ধে দেখতে পাওয়া যায়।

আলি বুগিয়াল, বৈদিনী বুগিয়াল

আগস্ট মাস শুরু হয়।

জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি নীল আকাশের বুকে জলভরা মেঘ সুন্দর স্বচ্ছন্দ বেগে এগিয়ে চলেছে উত্তরে হিমালয় পর্বতমালায় দিকে। সমুদ্রের বুক থেকে জন্ম নিয়েছিল সেই মেঘ। তারপর এগিয়ে চলেছে নীল আকাশের বুক বেয়ে। বুঝেছি, ঈশ্বরের উদ্যানে ফুল ফোটার সময় হয়েছে। আমি জানি, অতদূর থেকে ফুলের গন্ধ ভেসে আসবে না বাতাসে। বিচিত্র বর্ণের ফুলগুলো ভেসে বেড়ায় চোখের সামনে। ফুল ফোটার আনন্দে উচ্ছল হওয়া দেখি, ফুল ঝরে পড়ার বেদনায় কান্নার শব্দ শুনি। অনুভব করি ঘরে বসে বসেই। কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠি এক সময়। তারপর একদিন আগস্ট মাসের সাত-সকালে দলবল শুদ্ধ ট্রেন থেকে নেমে পড়ি কাঠগোদাম স্টেশনে। দিনের শেষে বাস এসে দাঁড়ায় গোয়ালদাম ডাকবাংলোর সামনে। আলমোড়া থাকতেই কোলকাতার সেই মেঘ হঠাৎ ঝরে পড়তে শুরু করে। কৌশানীতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। পাইন আর দেওদার গাছের ওপর দিয়ে মেঘ আর বৃষ্টি নেমে আসতে থাকে। অস্পষ্ট আলোয় বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে গোয়ালদামের ডাকবাংলোর ভেতরে ঢুকে পড়ি। মনে মনে আশ্বস্ত হই, মেঘের সঙ্গে পাল্লা দিতে দিতেই এসে পড়েছি ঠিক ফুল ফোটার সময়েই।

গোয়ালদামের উচ্চতা ৬৫০০ ফুট। উচ্চতাজনিত পরিবেশ, আর র্বোপরি সবৃষ্টি। সন্ধ্যার অন্ধকারে ডাকবাংলোর ভেতরে ফায়ার প্লেসে আগুনের সামনে বসে বসে মগ ভর্তি চা হাতে নিয়ে বৃষ্টির অস্ফুট গুঞ্জন শুনতে থাকি। আমার পাশেই বসে হুকুম সিং। ওয়ান গ্রামের বাসিন্দা। রূপকুণ্ডের গাইড এই হুকুম সিং বিস্ত্। ১৯৫৫ সনে ভারতীয় নৃতত্ত্ব বিভাগের বিজ্ঞানীদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল রূপকুণ্ড। ১৯৬০ সনে ওয়ান গ্রামে খাকী সার্ট-প্যান্ট পরিহিত একজন বলিষ্ঠ মানুষ এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে সামরিক ভঙ্গীতে অভিবাদন করেছিল। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে পরিচয় দিয়েছিল—আই অ্যাম্ হুকুম সিং বিস্ত-গাইড্।

তরুণ বয়সে হুকুম সিং সামরিক বিভাগে চাকরী করতো। তাই তার চাল-চলনে

সহজ স্বচ্ছন্দ সামরিক ভঙ্গি। এগারো বছর পরে ডাকবাংলোয় সেই মানুষটি আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল আনন্দে। পাশে বসেই আমায় শোনায় ওর সুখ-দুঃখের কাহিনী। অনেক বাঙালী অভিযাত্রীদল নিয়ে সে গিয়েছিল রূপকুণ্ডে। বয়স হয়েছে, মাঝে মাঝে তবিয়ৎ ঠিক থাকে না। মনে সেই পুরানো শক্তি, সেই দুর্গম হিমালয়ে যাবার স্বপ্ন। পথে না বেরুতে পারলে তবিয়ৎ আরো খারাপ হয়ে যায়।

১৯৬০ সনের স্মৃতি চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে ভাসে। গোয়ালদামে আমার রাত্রি বাস করার সুযোগ হয়নি। প্রয়োজনও ছিল না। ডাকবাংলো ছাড়া গোয়ালদামে মাত্র দুটি দোকান ছিল। একটি ছোট চায়ের দোকান, আর তার পাশেই চাল, ডাল, মশলা আর সামান্য স্থানীয় শাক-সব্জীর দোকান। দোকানের মালিক শাদীলালজী। গরুড়ে তার একটি দোকান ছিল। গরুড় থেকে ডাংগোলী পর্যন্ত আট মাইল পথ বাসরাস্তা। অনিয়মিত বাস চলতো। ডাংগোলী থেকে গোয়ালদাম এই আট মাইল ছিল পায়ে হাঁটা পথ। অবশ্য বাস রাস্তা তৈরী হচ্ছিল। দু-তিন বছর পরেই হয়তো বাস পথ চালু হবে। হাঁটা পথটি সুন্দর। চীর গাছের ছায়ায় ছায়ায় রুক্ষ মাটির বুকের ওপর দিয়ে পথ। ছোট ছোট গ্রাম, চড়াই আর উৎরাই তেমন মারাত্মক নয়। চীর গাছগুলো বেশ পুরনো। গাছের গোড়ার দিকটার ওপর থেকে পাতলা আবরণ তুলে ছোট টিনের পাত্র লাগানো থাকে। চীর গাছের ভেতর থেকে তৈলাক্ত রস নির্গত হয়ে সংগৃহীত হয় পাত্রে। সেই পাত্র উপ্‌চে বড় বড় টিনে ভর্তি হয়। গাঢ় রস শক্ত হয়ে জমে যায়। সেই টিন ভর্তি রস থেকে তার্পিন তেল নিষ্কাষিত হয়। হিমালয়ের চার পাঁচ হাজার ফুট উচ্চতা থেকে শুরু করে এগারো হাজার ফুট উচ্চতা পর্যন্ত চীরগাছের ঘন সন্নিবেশিত বন দেখতে পাওয়া যাবে। চীরগাছের তলায় আর কোন গাছ সহজে জন্মাতে পারে না। কারণ, চীর গাছের পাতায় প্রচুর তৈলজাতীয় পদার্থ থাকায় ঐ পাতাগুলো যখন গাছের তলায় জমা হয়, তখন সেগুলো মাটিতে মিশে পচে মাটির অম্লত্ব বৃদ্ধি করে। এই ধরনের মাটিতে অন্য গাছ জন্মাতে পারে না। গঙ্গোত্রী অঞ্চলে চীরবাসায় এগারো হাজার ফুটেরও বেশী উচ্চতায় চীরগাছের ছোটখাটো বনের সৃষ্টি হয়ে রয়েছে। গাছের তলায় কিন্তু অপর কোন গাছ দেখতে পাওয়া যায় না।

হিমালয়ের পাদদেশ থেকে শুরু করে উচ্চ হিমালয়ের প্রবেশদ্বার পর্যন্ত উদ্ভিদের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করা যায়। হিমালয়ের চার পাঁচ হাজার ফুট উচ্চতা থেকেই উষ্ণ অঞ্চলের উদ্ভিদ বিরল হতে শুরু করে। তার স্থান অধিকার করতে থাকে

সূচ্যগ্র পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষ। সেগুলি সাধারণতঃ পাইন, ফার, দেওদার আর চীরগাছ। উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত বনাঞ্চল দখল করে থাকে সূচ্যগ্র পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষ। এই সব বৃক্ষের কাণ্ডের ত্বকের ভেতরে প্রচুর তৈলাক্ত রস সঞ্চিত থাকে। সেই তৈলাক্ত রসই সম্ভবত বৃক্ষের দেহের উত্তাপ সংরক্ষণ করে। উচ্চ হিমালয়ের শীতের প্রকোপ বেশী। শীতকালে এই অঞ্চলে তুষারপাত হয়। তুষারপাতে বৃক্ষগুলির সহজ জীবনযাত্রা ব্যহত করতে পারে। দীর্ঘকাল তুষারপাত হলে সমস্ত অঞ্চল তুষারাবৃত হয়ে থাকে। ফলে বৃক্ষের দেহে নিয়মিত রস সঞ্চালনে বাধা পেতে থাকে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার জন্য। প্রকৃতিদেবী তাই হয়তো এই সব বৃক্ষের দেহত্বকে, পাতায় তৈলাক্ত রস সঞ্চিত করে রেখেছে। সূচাগ্র পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষের মধ্যে হয়তো চীর গাছের দেহত্বকে বেশী পরিমাণ তৈলাক্ত রস সঞ্চিত রয়েছে। চীরগাছের পাতা যেখানে পড়ে, সে ভূমির ক্ষারত্ব নষ্ট হয়ে যায়। কালক্রমে মাটির অম্লত্ব বৃদ্ধি পায়।

গোয়ালদামের ডাকবাংলো বেশ সাজানো গোছানো। সামান্য ঢালের মুখে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। বাংলোয় বেশ কয়েকটি ঘর, রান্না ঘর, চৌকিদারের ঘর। ডাক-বাংলোর বারান্দায় বসে বসে দূরে দেখা যায় তুষারবৃত নন্দাঘুন্টি পর্বত। ১৯৬০ সনে বেলা এগারোটায় গোয়ালদাম পৌঁছেছিলাম, ডাংগোলী থেকে আট মাইল পথ অতিক্রম করে। শাদীলালের দোকানের পাশেই চায়ের দোকান। সেখানে বসেই ভাত, ডাল আর ট্রাউট মাছের ঝোল খেয়েছিলাম। সেখান থেকে সোজা নেমে গিয়েছিলাম দেবল।

১৯৭১ সনের গোয়ালদামের অদ্ভুত পরিবর্তন দেখি এগারো বছরের মধ্যেই। শাদীলালের দোকান কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে। চারপাশে বড় বড় দোকান। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাব নেই দোকানগুলোয়। জামা, জুতো, পশমের তৈরী পোশাক-পরিচ্ছদ, ছাতা, লাঠি। পাহাড়ী অঞ্চলে চলবার উপযোগী মোটামুটি সব কিছুই পাওয়া যায়। পাহাড়ী অঞ্চলে চলবার জন্য বর্ষাতি টুপিও রয়েছে। এ ছাড়াও দই, দুধ, দুগ্ধজাত খাবার মেলে দোকানগুলোয়। ছোটো খাটো হোটেলও রয়েছে। সকালের দিকে বাজার বসে সেখানে। শাকসব্জী, মাংস, ডিম সবই মেলে। ১৯৭১ সনে দেখি গোয়ালদাম থেকে বাসরাস্তা চলেছে থারালীর দিকে। থারালী থেকে সোজাসুজি যাওয়া যায় কর্ণপ্রয়াগ। কুমায়ুনের সঙ্গে গাড়োয়াল অঞ্চলের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন হয়েছে। গোয়ালদামের পরিবেশ, অবস্থান দেখে হিল স্টেশন বলা ভুল হবে না। অদূর ভবিষ্যতে বড় বড় হোটেল, রেস্ট-হাউজ আর সুদৃশ্য বাড়ী গড়ে ওঠা অবাস্তব নাও হতে পারে। তখন হয়তো ভ্রমণ পিপাসু এসে

হোটেলের বারান্দায় বসে বসে উপভোগ করতে পারবে। সারাদিন বসে বসে দেখবে নন্দাঘুন্টির তুষারধবল শৃঙ্গ। গোয়ালদাম সরযু ও পিণ্ডারী উপত্যকার জলবিভাজিকায় অবস্থিত। এখান থেকে পায়ে হেঁটে এগিয়ে আলিবুগিয়াল, বৈদিনী বুগিয়াল পেরিয়ে কুয়ারী গিরিপথ যাওয়া যায়। কুয়ারী গিরিপথ পেরুলেই গাড়োয়াল হিমালয়ে তপোবন ছাড়িয়ে যোশীমঠ যাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এইজন্যই অতীতের পর্বতারোহী, অভিযাত্রীদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল গোয়ালদাম।

১৯০৫ সনে ও ১৯০৬ সনে প্রখ্যাত হিমালয় অভিযাত্রী ডাঃ লঙস্টাফ এসেছিলেন গোয়ালাদাম। গোয়ালদাম থেকে এগিয়ে গিয়েছিলেন আলিবুগিয়াল, বৈদিনী বুগিয়াল পেরিয়ে গিমতলি। কুনোল, সুতোল পেরিয়ে তিনি নিশ্চয়ই গিয়েছেন কুয়ারী গিরিপথ। লঙস্টাফ, নিশ্চয়ই গোয়ালদামের ডাকবাংলোয় রাত্রি বাস করেছিলেন। অত পুরনো ডাকবাংলোয় ভিজিটর বই ছিল না। ১৯৩২ সন থেকে শুরু হয় ভিজিটর বই। এতে প্রথম স্বাক্ষর রয়েছে ডাঃ লঙস্টাফের পুত্র সি জি. লঙস্টাফের। জানা নেই লঙস্টাফ পুত্র কেন এসেছিলেন কুমায়ুনে। ১৯৩২ সনের মে মাসে প্রখ্যাত অভিযাত্রী হিমালয়ান ক্রনিকলের লেখক মার্সেল কুজ এসেছিলেন এই পথে। গোয়ালাদামের ডাকবাংলোয় রাত্রি বাস করতে হয়েছিল তাঁকে। চারদিকের প্রাকৃতিক পরিবেশ, অপরূপ নির্জনতা হয়তো ভাল লেগেছিল তাঁর। গোয়ালদাম থেকে চলে গিয়েছিলেন, ফিরে আসেন নি। ডাকবাংলোর ভিজিটর বইয়ে ফিরতি পথের স্বাক্ষর নেই।

ঠিক দুই বৎসর পর ১৯৩৪ সনের ১৩ই মে ডাকবাংলোয় এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন প্রখ্যাত পর্বতারোহী এরিক শিপটন্ ও এইচ্ ডব্লু টিলম্যান। তাঁরা নন্দাদেবী পর্বতের মূল গিরিশিরার ভৌগোলিক পরিবেশ সমীক্ষার জন্য গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য, নন্দাদেবী শৃঙ্গ আরোহণের প্রচেষ্টা। তখনকার দিনে রাণীক্ষেত, আলমোড়া অঞ্চলে বাস রাস্তা ছিল। পর্বতারোহীদের গোয়ালদাম যাত্রার জন্য পদযাত্রাই সুবিধেজনক ছিল। কুমায়ুনের এই অঞ্চল থেকে পায়ে হেঁটে গিরিপথ পেরিয়ে যেত তপোবন, যোশীমঠ। ঠিক সতেরো দিন পরে ২৯শে মে তারিখে টিলম্যান, ডব্লু এফ্ লুমিস্ গোয়ালদামে এসে হাজির হয়েছিল ডাকবাংলোয় রাত্রি বাস করবার জন্য। সম্ভবতঃ নন্দাদেবীর দুর্ভেদ্য গিরিশিরা অতিক্রম করে নন্দাদেবী শৃঙ্গ আরোহণের সম্ভাব্য পথের নিশানা হয়তো পেয়েছিলেন। ডাকবাংলোর ভিজিটর বইয়ে শিপটনের স্বাক্ষর ছিল না। হয়তো উপস্থিত থাকলেও সই করেননি ভিজিটর বইয়ে। ১৯৩৬ সনে দুই বৎসর পরে ১০ই জুলাই নন্দাদেবী অভিযানে এসেছিলেন টিলম্যান, গ্রাহাম

ব্রাউন, ওডেল, পিটার লয়েড, লুমিস্, হাউস্টন্ ও এরিক শিপটন। নন্দাদেবী শৃঙ্গ আরোহণের পর তাঁরা এ পথেই হয়তো এসেছিলেন। তবে ভিজিটর বই সে সাক্ষ্য দেয় না। পরবর্তী বৎসরই ১৯৩৭ সনে ৫ই জুলাই তারিখে প্রখ্যাত পর্বতারোহী ফ্র্যাঙ্ক স্মাইথ এসেছিলেন গোয়ালদামে। নন্দনকাননে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত করার পর এসেছিলেন তিনি হিমালয়ের বিচিত্র ফুল সংগ্রহ করতে। তার আগে তিনি কামেট পর্বত শৃঙ্গ আরোহণ করে নন্দনকানন থেকে পৌঁছে গিয়েছিলেন যোশীমঠের পর তপোবন। সেখান থেকে কুয়ারী গিরিপথ অতিক্রম করে এসেছিলেন গোয়ালদাম। বাংলোর ভেতরে বাস করা হয়তো রীতিবিরুদ্ধ, তাই বাংলোর সামনে প্রাঙ্গণে তাঁবু খাটিয়ে রাত্রিবাস করেছিলেন। ভিজিটর বইয়ে তাঁর স্বাক্ষর রয়েছে আজো। তারপর দু বৎসর অতীত হবার পর গোয়ালদামের ডাকবাংলোয় আশ্রয় নিয়েছিলেন প্রখ্যাত উদ্ভিদ বিজ্ঞানী জোয়ান মার্গারেট লেগী। তিনি ছিলেন লণ্ডনের কিউ বোটানিক্যাল গার্ডেনের উদ্ভিদবিজ্ঞানী। সেখানকার জন্য হিমালয়ের বিচিত্র ফুলের নমুনা ও বীজ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। রাত্রিবাস করেছিলেন ডাকবাংলোয়, শুধু নাম, সই আর তারিখ, কোন মন্তব্য নেই। হয়তো ভেবেছিলেন ফেরার পথে এই ডাকবাংলোয় রাত্রিবাস করবেন। ভাললাগা মনটা রেখে যাবেন ভিজিটর বইয়ের মন্তব্যে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তা আর হয় নি।

গোয়ালদাম থেকে লেগী কুয়ারী গিরিপথ পেরিয়ে গিয়েছিলেন যোশীমঠে। সেখানে থেকে পৌঁছে গিয়েছিলেন ভ্যুইণ্ডার উপত্যকায়। ২৫শে মে থেকে ২৫শে জুন, এই একমাস সময়ের মধ্যে লেগী ভ্যুইণ্ডার উপত্যকায় অবস্থান করবার জন্য পাকাপাকি ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁবু খাটিয়েছিলেন সেখানে। ফুলের নমুনা সংগ্রহ করতে শুরু করেছিলেন তিনি। ৪ঠা জুলাই তারিখে লেগী ভ্যুইণ্ডার উপত্যকা অর্থাৎ নন্দনকাননে ফুলের নমুনা সংগ্রহ করতে গিয়ে পাহাড়ের ধার থেকে পা হড়কে পড়ে গিয়েছিলেন নীচে। সেখানেই প্রাণ হারিয়েছিলেন তিনি। তাঁর সমাধিস্থল আমি কয়েকবার দেখেছি। ১৯৭৩ সনে দেখেছি, তাঁর সমাধিস্থানের ওপরকার শ্বেতপাথরের ফলকে লেখাগুলি বুঝি লুপ্ত হতে চলেছে। সমাধিস্থানের অনেক জায়গায়ই গিয়েছে ভেঙে। চার পাশের একোনাইট আর ডেলফিনিয়ামের গাছগুলো, যা ১৯৫৯ ও ১৯৬২ সনে দেখেছিলাম, সে গাছ ১৯৭৩ সনে লুপ্ত হয়ে গেছে। সমাধিস্থানের চারপাশে রোডোডেনড্রন ক্যাম্পিল্যুলাটামের চার পাঁচটা গাছ আর তার গায়ে ভুর্জ গাছ ছিল। জানিনা, লেগী সেই গাছগুলো দেখেছিলেন কিনা। ১৯৫৯ ও ১৯৬২ সনের সেই গাছগুলো ১৯৭৩ সনেও বেঁচে রয়েছে।

তবে গাছের ডালপালা ভাঙা। কাছেই পাথর সাজিয়ে রেখেছে বকরিওয়ালারা। লেগী গোয়ালদাম থেকে ওয়ান গ্রাম পেরিয়ে আলিবুগিয়াল ও বেদিনী বুগিয়াল গিয়েছিলেন নিশ্চয়ই। প্রাক-বর্ষায় ফুলের ঝলমলে বুগিয়ালগুলোয় রাত্রিবাস করেছিলেন। হয়তো বা ভেবেছিলেন ফেরবার সময় বুগিয়ালগুলোয় অবস্থান করে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন।

১৯৩৯ সনে ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে সুইস অভিযাত্রীদল গোয়ালদামে এসে হাজির হয়েছিলেন। রাত্রিবাস করেছিলেন তাঁরা ডাকবাংলোয়। ভিজিটর বইয়ে স্বাক্ষর করেছিলেন আন্দ্রেরস, স্টেউরী, জগ ও হার্বার্ট। চৌখাম্বা অভিযানে সাংঘাতিক হিমানী সম্প্রপাত থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে রতবন, গৌরীপর্বত শৃঙ্গে আরোহণ করেছিলেন তাঁরা। ফিরতি পথে আর আসেন নি গোয়ালদামে। তারপর ঠিক আট বৎসর পর ১৯৪৭ সনের ১০ই সেপ্টেম্বর আন্দ্রেরস দলবল নিয়ে হাজির হয়েছিলেন গোয়ালদামে। ভিজিটর বইয়ে স্বাক্ষর করেছিলেন ম্যাডাম লোনার আর রাম-রাহুল। ১৪ই সেপ্টেম্বর এসেছিলেন গ্রোভার ও স্যাটার। ১৭ই সেপ্টেম্বর এসেছিলেন ডিটার্ট ও আন্দ্রেরস। তাঁরা কেদারনাথ পর্বত, সতোপন্থ শৃঙ্গ আরোহণ করবার পর বালবালা শৃঙ্গে আরোহণ করেছিলেন সরস্বতী উপত্যকায় পৌঁছে কালিন্দী খাল অতিক্রম করবার পর। তারপর সেখান থেকে বদ্রীনাথ, যোশীমঠ পেরিয়ে গোয়ালদাম এসেছিলেন কুয়ারী গিরিপথ অতিক্রম করে। তাঁদের স্বাক্ষর দেখে মনে হয়—শৃঙ্গ আরোহণের পর ডাকবাংলোয় হাজির হয়ে বিজয় উৎসব করেছিলেন।

১৯৪৭ সনের পর অন্য কোন বিদেশী অভিযাত্রী আসেন নি গোয়ালদাম। দেশ স্বাধীন হয়েছে, বিদেশী পর্বত অভিযাত্রীদের ভীড় কমতে শুরু হয়েছিল। তবু ১৯৫০ সনের ১২ই মে তারিখে স্কটিশ হিমালয়ান অভিযানের অভিযাত্রীরা এসেছিলেন গোয়ালদামের ডাকবাংলোয় রাত্রিবাস করবার জন্য। ভিজিটর বইয়ে স্বাক্ষর ছিল ম্যাককিনন্, মারে, স্কট ও ওয়ারের। ১৯৫১ সনে ১লা জুলাই মাসে গোয়ালদামের ডাকবাংলোয় রাত্রিবাস করেছিলেন নিউজিল্যাণ্ডের অভিযাত্রী—লো, কটার, রিডিফোর্ড, এডমণ্ড হিলারী ও বুন্সা। গোয়ালদামের ডাকবাংলোয় এই সর্বশেষ বিদেশী অভিযাত্রীদের রাত্রিবাস। ১৯০৫ সন থেকে শুরু করে ১৯৫১ সন পর্যন্ত হয়তো সব অভিযাত্রীই ওয়ান গ্রাম পেরিয়ে আলিবুগিয়াল পেরিয়ে গিয়েছিলে কুয়ারী গিরিপথে। কারণ, কুয়ারী গিরিপথ পেরিয়ে তপোবন ও যোশীমঠ যাওয়াই ছিল অভিযাত্রীদের পক্ষে সুবিধেজনক। বুগিয়ালে রাত্রিবাস করবার কথা কেউ

তেমন করে লেখেননি তাঁদের কোন বইয়ে। গোয়ালদামের ডাকবাংলোর নির্জনতায় সমস্ত প্রাঙ্গণ ভরে থাকতো ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা আর নানাধরনের লিলি ফুলে। ১৯৭১ সনের আমূল পরিবর্তনে—ডাকবাংলোর প্রয়োজনীয়তা কমে গিয়েছে। অভিযাত্রীরা খুব কমই আসেন। বাসরাস্তা এগিয়ে এসেছে। দ্রুত এগিয়ে চলার যুগ, অভিযাত্রীরা বাস থেকে নেমেই পথ চলা শুরু করে। ডাকবাংলোয় অবস্থান করে সময় যাপন করার মতো সময় তাঁরা পান না। বাংলোর সামনের প্রাঙ্গণে ঘেরা ফুলগুলো অযত্নে বেড়ে ওঠে।

ঘুম ভাঙে খুব ভোরেই। সারারাত বোধ হয় বৃষ্টি হয়েছিল। আর তারই রেস ইল্‌সেগুড়ি বৃষ্টি। ডাকবাংলোয় কাচের সার্সিতে দেখি কুয়াশা। ডাকবাংলোর সামনে নানা রঙের জিনিয়া, অ্যাস্টর আর লিলি ফুটেছে। ছোট ছোট চন্দ্রমল্লিকা আর ডালিয়ার পাপড়ির ওপরে বৃষ্টির ফোঁটা রয়েছে জমে। এই ফুলগুলোর কতকগুলি কোলকাতার বিভিন্ন শখের বাগানে দেখি নভেম্বরের শেষের দিকে। ডিসেম্বর, জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারীতেও দেখি। লিলি ফুলগুলো বর্ষায় ফোটে। গোয়ালদামে দেখি বর্ষা আর বসন্তের ফুল এক সঙ্গে ফুটে রয়েছে। পদযাত্রা শুরু করবার জন্য প্রস্তুতি চলে। জানি সূর্য উঠছে; কিন্তু সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগবে। ভোরের হিমেল পরিবেশ ছড়িয়ে রয়েছে চারধারে। সবাইকে শয্যা ত্যাগ করবার তাড়া দেওয়া হয়েছে খুব ভোরে গরম চা বিছানার কাছে পৌছে দিয়ে। মগভর্তি চা নিয়ে বাইরের দিকে তাকাই। হুকুম সিংকে বলি—মরশুম খুব খারাপ।

হুকুম সিং হাসে আমার দিকে তাকিয়ে—মরশুম আচ্ছাই হ্যায় সাব।

—সে কি! অবাক হয়ে তাকাই। চারদিকে কুয়াশা, ইল্‌সেগুড়ি বৃষ্টি বন্ধ হয় নি।

হুকুম সিং স্বচ্ছন্দভাবে হেসে আবার বলে—যাত্রার এই তো আচ্ছা মরশুম। হিমালয়ের ফুল ফোটার এই তো সময়। আকাশে বাদল থাকবে, তবে তো···

হ্যাঁ, তাই তো, ভুলেই গিয়েছিলাম আমি। মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াশায় মাটির বুককে নরম করবে। ফুলের পাপড়ি আরো উজ্জ্বল আরো অপরূপ হবে।

গোয়ালদাম থেকে দেবলের দূরত্ব মাত্র ছয় মাইল। সমস্ত পথটাই প্রায় উৎরাই। পিচ্ছল পথ চীরগাছের ভিড় ঠেলে নেমে গিয়েছে পিণ্ডার উপত্যকায়। এই পিচ্ছিল পথ বেয়ে অবতরণ করতে করতেই বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। পাহাড়ের গায়ে থোকা থোকা মেঘ সূর্যের প্রখর কিরণে পরাভূত হয়ে পালাবার পথ খুঁজছে। পাহাড়ের

গায়ে ফার্ন গাছগুলো সজীব হয়ে উঠেছে। পাথর আর ফার্ন গাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখি অসংখ্য জোক। বৃষ্টির জল পেয়ে নড়া চড়া করতে শুরু করেছে। মানুষের রক্তের গন্ধ শুঁকছে মাথা বার করে। ফার্ন গাছ আর ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে ফিকে গোলাপী রঙের ও হলদে রঙের দু চারটে ফুল দেখে হঠাৎ থমকে দাঁড়াই। দূর থেকে অচেনা ফুল ভেবে অবহেলা করতে চেয়েছিলাম। অচেনা মানুষের সঙ্গে পথে দেখা হলে যেমন ক্ষণিকের জন্য দৃষ্টি বিনিময় হতেই পাশ কাটাতে চাই, ঠিক তেমনি। কিন্তু ভাল করে তাকাতেই চিনতে পারি অতিপরিচিত ফুল—ইম্‌পেসান্‌স (IMPATIENS) দীর্ঘকালের অতিপরিচিত ফুল। হিমালয়ের পথে পথে সর্বত্র দেখি। প্রায় ৪০০০ ফুট উচ্চতা থেকেই অনেক জায়গায় স্যাঁতসেঁতে ভিজে মাটিতে ঝরনার ছিটকে যাওয়া জলে সিক্ত মাটির বুকে অজস্র ইমপেসানস্ গাছ জন্মায়। হলদে, গোলাপী, হাল্‌কা গোলাপী, সাদা রঙের এই ফুল প্রায় ডজনখানেক প্রজাতি ছড়িয়ে রয়েছে হিমালয়ের বিভিন্ন উচ্চতায়। ফুলের কোন গন্ধ নেই। হিমালয়ের নিম্ন-উপত্যকায় বড় বড় গাছ আর বড় বড় ফুল। উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গাছ ছোট হতে শুরু করে। ফুলের আকৃতিও ছোট হতে থাকে।

গাছের সামনে দাঁড়িয়ে দেখি ভাল করে। ভেড়া বা ছাগলে নিশ্চয়ই মুড়ে খেয়েছিল। তাই ভগ্নশাখা, ছিন্নপাতা। তবু সব শত্রুর দৃষ্টি এড়িয়ে গুটিকয়েক ফুল ফুটে রয়েছে উজ্জ্বল হয়ে। বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে বেশ কিছু সময় আগেই। আকাশে তখনো মেঘ, চীরগাছের ছায়ায় স্বল্প আলোয় দেখা যাচ্ছিল ইমপেসানস্-এর ফুলগুলো। ফুলের যদি আলোই না থাকতো, তাহলে এমন অস্পষ্ট আলোয় এতদূর থেকে দেখা যাচ্ছিল কেমন করে? চীরগাছের ভিড় কমে গিয়েছে, সামান্য নীচেই পিণ্ডারী গঙ্গা দেখা যাচ্ছিল। গোয়ালদাম থেকে দেবলে পৌঁছোবার আগেই পিণ্ডারী উপত্যকার বুকে দেখা যাচ্ছিল নন্দাকেশরী। নন্দাকেশরী থেকে চড়াই ভেঙে পাহাড়ের ওপরে পৌঁছে গেলে বিখ্যাত ব্রহ্মতাল দেখতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মতালের সামান্য নীচেই বেগুনতাল। হিমালয়ের বুকে হ্রদ দুটি ভ্রমণকারীদের ভাল লাগবে। বেগুনতাল থেকে একটি পথ চলে গিয়েছে বেগম গ্রামে। বেগম গ্রামের নীচে মান্দোলী গ্রাম। অপর পথ চলে গিয়েছে ওয়ান গ্রামে।

পিণ্ডারী গঙ্গার ওপরকার ঝুলন্ত সেতু পেরিয়ে পৌঁছে যাই নন্দাকেশরী। নন্দাকেশরী পিণ্ডারী গঙ্গার তটরেখা থেকে মাত্র কয়েকশ' ফুট উঁচুতে অবস্থিত। পিণ্ডারীর তটরেখায় সবুজ ধানের খেত দেখা যায়। বেলা প্রায় আড়াইটে নাগাদ দেবলের ডাকবাংলোর সামনে এসে পৌঁছে যাই। ডাকবাংলোর সামনে ঘাসে

ছাওয়া প্রাঙ্গণ। চারপাশে চীর আর দেওদার গাছ। নীচেই পিণ্ডারী গঙ্গা আর কোয়েল গঙ্গার সঙ্গমস্থল। ডাকবাংলো থেকে দু ফার্লং দূরে দেবলের দোকানপাট। সেখানে ফরেস্ট গার্ডের ঘর। ১৯৬০ সনে আমি সেখানে রাত্রিবাস করেছিলাম।

দেবলের দোকানপাটগুলোর এমন কিছু পরিবর্তন ঘটেনি এগারো বৎসর পরেও। নতুন যাত্রী দেখে দোকানদারের কোন উৎসাহ নেই; কেউ এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়। অথচ ১৯৬০ সনে স্থানীয় অধিবাসীরা কি অদ্ভুত সমাদর করেছিল। রান্না করে খাইয়েছিল একজন দোকানী বড় বড় ট্রাউট মাছ যোগাড় করে। সেই পুরনো দিনের দেবলের বিখ্যাত গাইড বচীরাম এসেছিল আমার কাছে। অনেকরাত পর্যন্ত রূপকুণ্ডের গল্প করেছিল। বচীরাম এগারো বৎসর পর হয়তো বৃদ্ধ অশক্ত হয়েছে। খবর দেবার পরও বচীরাম কিন্তু আসে নি দেখা করতে। স্থানীয় লোকদের কাছে শুনি, বচীরাম ভালই আছে। ১৯৬০ সনের পর থেকে ১৯৭১ সনের মধ্যে অনেক বাঙালী অভিযাত্রী এসেছিল কোলকাতা থেকে। গাইড হিসাবে বচীরাম আর কোথায়ও যায় নি। নন্দাকেশরী থেকে দেবল পর্যন্ত চওড়া রাস্তা হয়েছে। রাস্তা এগিয়ে গিয়েছে দেবল ছাড়িয়ে। স্থানীয় অধিবাসীদের বিশ্বাস, বাসরাস্তা গোয়ালদাম থেকে লোহাজঙ পর্যন্ত চালু হবে। সবার কাছে শুনে মনে মনে খুশী হই। এই স্বপ্নের কথা ১৯৬০ সনে লোহাজঙে দর্জির দোকানে বসে বসে বলেছিলাম।

আকাশ পরিষ্কার। কাছেই কোয়েল ও পিণ্ডারী গঙ্গার সঙ্গমস্থল দেখি। এই সঙ্গমস্থলে প্রচুর ট্রাউট মাছ পাওয়া যায়। সঙ্গমস্থলে ছোট একটা মন্দির রয়েছে। দেবলের উচ্চতা ৪০০০ ফুটের বেশী নয়। পাহাড়ের গিরিশিরা বেয়ে উঠেছে পাইন, দেওদার আর চীরগাছ। এই অঞ্চলে রোডোডেনড্রন আর বেবিয়ামের সাক্ষাৎ পাওয়া উচিত ছিল। ওক গাছের সন্ধান করি কোয়েল গঙ্গার ওপারে।

পরদিন ভোর হতেই দেবল ছেড়ে এগিয়ে চলি মান্দোলীর দিকে। পথ এগিয়ে চলে কোয়েল গঙ্গার ধার ঘেঁষে। সারাপথ জুড়েই ছোট ছোট গ্রাম। তারই পাশ দিয়ে পথ। প্রতিটি বাড়ীর সামনে আরুফল আর বেদানার গাছ দেখি। আরুফল অনেকটা পীচফলের মতো। তবে আকৃতিতে ছোট, সামান্য টক-মিষ্টি স্বাদ। বগ্রীগড়ের ডাকবাংলো কোয়েল গঙ্গার ওপারে। নদী পেরুবার জন্য সেতু বানানো হয়েছে। ১৯৬০ সনে আমরা গাছের ডাল বেয়ে নদীর ওপারে গিয়েছিলাম। আর আমাদের লাল সিং খচ্চর নিয়ে নদীর জল ভেঙে ওপারে

গিয়েছিল। পথের এই পরিবর্তন স্থানীয় মানুষদের আশ্বাস দিয়েছে। বাস চলবে—সভ্যতা এগিয়ে যাবে। অবশ্য বগ্রীগড় পেরুতেই পাথর ফেলে বেশ চওড়া রাস্তা বানানোর চেষ্টা হয়েছে দেখতে পাই। পথ চলতে চলতেই হঠাৎ খেয়াল হয় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়েছে। মান্দোলীর চড়াই ভাঙবার মুহূর্তেই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি শুরু হয়। প্রচণ্ড বৃষ্টি। মুহূর্তের মধ্যে ভিজে যাই সবাই। বৃষ্টির জল কল কল করে নেমে আসছিল ওপরের ঢাল বেয়ে। জলের সঙ্গে দেখি অসংখ্য জোঁক কিলবিল করছিল। ভেজা পিচ্ছিল পথ বেয়ে বেয়ে এগিয়ে চলি। প্রায় সন্ধ্যা নাগাদ মান্দোলী গ্রামে পৌঁছে যাই সবাই ভিজে পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে। মান্দোলীর উচ্চতা ৭৫০০ ফুটেরও বেশী। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় হাত-পা কাঁপছিল ঠক্ ঠক্ করে। সূর্য অস্ত গিয়েছিল। স্বর্গের মেঘ যেন ধীরে ধীরে নেমে এসে বাসা বাঁধছিল পাহাড়ের গায়ে গায়ে। মেঘের ভিড় ঠেলে সূর্যের শেষরশ্মি উঁকি দেবার চেষ্টা করছিল। গ্রামের ইস্কুল বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলাম সবাই। দীর্ঘ এগারো বৎসর পর মান্দোলী গ্রামের খুব সামান্যই উন্নতি দেখতে পাই। ইস্কুলের নিজস্ব বাড়ী হয়েছে। কিন্তু ইস্কুলের বেঞ্চি নেই, দু-একটি চেয়ার-টেবিল মাত্র। ব্ল্যাকবোর্ড, মানচিত্র কোনটাই নেই। শিক্ষকরা মাইনে পান না নিয়মিতভাবে। কাছেই হেলথ সেন্টার হয়েছে। সাধারণ ফার্স্ট এডের ওষুধ রয়েছে মাত্র। কর্মচারীরা দুঃখ করেন। সরকারী সাহায্য মেলে না সময় মতো। দু-তিনটে টাইফয়েডের রুগী। ক্লোরোমাইসেটিন যোগাড় করবার জন্য আলমোড়া যেতে হয়। গোয়ালদাম থেকে মান্দোলী পর্যন্ত পাশ করা ডাক্তার নেই। দেশসেবা করবার জন্য এত কষ্ট করে অর্থ ব্যয় করে ডাক্তার হয়ে কেন আসবে এই দুর্গম পাহাড়ে। আমাদের সঙ্গে ডাক্তার স্বপন রয়েছেন জেনে প্রচুর রুগী এসে যায়। মাথাধরা, সর্দি-কাশি, জ্বর, পেটের অসুখ, এইসব সাধারণ অসুখের জন্য গাছ-গাছড়াতেই বিশ্বাস করে। ১৯০৫ সন থেকে ১৯৫১ সন পর্যন্ত বিদেশী অভিযাত্রীরা এই পথে যাতায়াত করতেন। তাঁদের দলের ডাক্তাররা যত্ন করে চিকিৎসা করতেন গ্রামবাসীদের। ১৯৬০ সনে মান্দোলী গ্রামের ওপারে বেগম গ্রামে রাত্রিবাস করেছি। অভিযাত্রী বা কোন ভ্রমণকারী দেখলে গ্রামের অধিবাসীরা ডাক্তারের খোঁজ করতো। দলে ডাক্তার নেই, তাতে কি—ওষুধ তো রয়েছে! দরিদ্র গ্রাম, দারিদ্র্যকে এরা ঈশ্বরের অভিপ্রেত ভেবেই জীবন কাটায়। জীবন-মৃত্যুকে ভাগ্যের হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিতে থাকে। গ্রামবাসীরা অসুখে-বিসুখে হিমালয়ের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা গাছ-গাছড়ার ওপর নির্ভর করে। উচ্চ হিমালয়ে অজস্র গাছ, লতা, গুল্ম। সেইসব উদ্ভিদের ভেষজগুণ গ্রামবাসীরা

জানে। হিমালয়ের সর্বত্র এই উদ্ভিদের অপরূপ ফুল! নন্দনকানন, নন্দনবন তাইতো ছড়িয়ে রয়েছে ঈশ্বরের উদ্যানে।

ঈশ্বরের উদ্যানের প্রথম তোরণদ্বার মান্দোলী গ্রাম। উচ্চতাবৃদ্ধির জন্যই উদ্ভিদের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় এই গ্রাম থেকে। ভোর হতেই গ্রাম পেরিয়ে বিশাল প্রাচীন দেওদার গাছের পাশ দিয়ে এঁকে-বেঁকে পথ চলা শুরু হয়। মান্দোলী গ্রাম থেকে ওয়ান গ্রামে যাবার পথে রয়েছে ছোট্ট গিরিপথ, নাম লোহাজঙ। মাইল খানেকের দূরত্ব কিন্তু হাজার ফুটেরও বেশী উচ্চতা পেরুতে হয়। এই সামান্য দূরত্ব ও বেশী উচ্চতার জন্য উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এখানে শীতে প্রচুর তুষারপাত হয়। তুষার সঞ্চিত হয়ে স্থায়ী হয় মাস দুয়েক। উদ্ভিদের জীবনযাত্রাকে স্থগিত রাখতে হয়। তুষারের আস্তরণ বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে থাকতে হয় গ্রীষ্মের দিনগুলির জন্য। সূর্য কখন উজ্জ্বল হবে, কবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাবে চারদিকে! আড়ষ্ট নিদ্রামগ্ন উদ্ভিদের ঘুম ভাঙবে, তুষারগলা জলে সিক্ত মাটির বুক চিরে কচি পাতা মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। অজস্র ফুলের কুঁড়ি দেখা দেবে। ফুল ফুটে আলোর বন্যা দেবে ছড়িয়ে। মান্দোলী বা লোহাজঙকে হিমালয়ের উচ্চ উপত্যকা বলা চলে না।

মান্দোলী ত্যাগ করে চড়াইয়ের মুখে দেখি সাইপ্রেস গাছ আর তারই তলায় পাহাড়ের ঢালের মুখে দেখি কিছু কিছু জেনসিয়ানার নীল ফুল। তার কাছেই অজস্র সাদা অ্যাস্টর। গতকালের বৃষ্টির পর আকাশ গাঢ় নীল হয়েছে। সূর্য উঠেছে, ফুলগুলো যেন শিশির সিক্ত। রাস্তার ধারে চীরগাছের অদূরেই ওকগাছ আর তার পাশেই রোডোডেনড্রন আরবোরিয়াম। অনেকগুলো পুরনো গাছ আর তাকে ঘিরে অনেকগুলো ছোট ছোট চারা গাছ। এই সব অল্প বয়সের গাছগুলোয় দু' এক বছর পরই ফুল ফুটতে শুরু করবে। আগস্ট মাস, এপ্রিলেও লাল ফুল ফুটেছিল অজস্র। পাহাড়ের ঢালে ছোট বড় অজস্র সাদা আর হলদে রঙের লিলিফুল ফুটেছে। সাদা রঙের অজস্র লিলির মাঝে মাঝেই দেখি কাঁচা সোনা রঙের জিউম এলিটাম। জিউমের ফুলগুলো যেন অস্বাভাবিক বড়। বুঝতে পারি, নতুন গাছ তাই নতুন ফুল। নতুন জীবন আস্বাদনের বিচিত্র আনন্দ। গাছের মূল স্ফীত, কন্দ মূল বলা চলে। সামান্য মাটি খুঁড়ে কয়েকটি গাছের মূল বের করি। মূল ভাঙ্গতেই বেশ একটা সুগন্ধি পাওয়া যাচ্ছিল। জিউমের মূল ভেষজগুণ সম্পন্ন। শুনেছি, গাছের মূল শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। ঐ মূল গুড়ো করে গরম জলে

মিশিয়ে খেলে নাকি বলবৃদ্ধি হয়। এই গাছের রস সঙ্কোচক, সামান্য কষায় স্বাদ-যুক্ত। কাশ্মিরী অধিবাসীরা এই গাছগুলোকে গুগ্‌ মূল বলে। জিউমের আর একটি প্রজাতির নাম জিউল আর্বানাম। এই গাছের মূলে ইউগেনল রয়েছে। মূলে ডোলটয়েল তেলে—লবঙ্গ তেলের গন্ধ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই গাছের মূলে শতকরা নব্বই অংশ লবঙ্গ তেলের সমতুল গুণযুক্ত তেল রয়েছে। এই তেল সঙ্কোচক, পচন নিরোধক। মূলটি মূলতঃ টনিক হিসাবে স্থানীয় অধিবাসীরা ব্যবহার করে থাকে। লোহাজঙের কাছে ঢালের মুখে অজস্র ফুল ফুটে রয়েছে। ভিজে মাটির বুকে যেন এক অপরূপ বেডের সৃষ্টি করেছে। ১৯৬০ সনে লোহাজঙে পৌছেছিলাম বিকেলবেলায়। সমস্ত অঞ্চল জুড়ে তেমন ফুল দেখেছি বলে মনে পড়ে না। চলতে চলতে থমকে দাঁড়াই দল ছাড়া হয়ে। সঙ্গীরা একে একে এগিয়ে যায়। যাবার সময় একবার আমার দিকে তাকায়, ভাবে এই সামান্য চড়াই পেরুতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, তাই বিশ্রাম। অনেকের হাতেই ক্যামেরা, ছবি তোলার বিষয় বস্তু নেই। দ্রুত পা চলতে চলতে মাড়িয়ে যায় জেনসিয়ানা, লিলি আর জিউম এলিটাম। উচ্ছ্বাসে আনন্দে তাদের পদতল মথিত করে দ্রুত এগিয়ে চলে সবাই। সবাই পৌছে যেতে চায় কোথায় জানে না তারা। পায়ের তলা দেখবার সময় কোথায়! অথচ চড়াইয়ের মুখে ফুলগুলো ঢল ঢল চোখে মেলে তাকায় সবার দিকে। পা ফেলবার আগে একবার দেখ আমাদের, আমাদেরও তো কথা রয়েছে—আমাদের পরিচয়, আমাদের কত রস, যা ঐ মৌমাছি, প্রজাপতি ছুটে আসে দূর থেকে দেখে। তোমরা দেখতে পাওনা? ফুলগুলো নীরব। তাদের ভাষা কেউ বোঝে না। ছুটে চলা পদযাত্রীরা তাই জানতেও চায় না কিছুই। আমি কিন্তু বারবার তাকিয়ে দেখি জিউম এলিটামগুলোকে। কাঁচা সোনা রঙের পাপড়ি, পুংকেশর ও গর্ভকেশর, পরাগ কোষ সব দেখলে গোলাপফুলের মতোই দেখা যায়। তাই এই ফুলের পরিচয়টাও গোলাপজাতীয়।

জিউস এলিটামের ফুলগুলো দেখতে বেশ ভাল লাগে। কাঁচা সোনা রঙের পাপড়িগুলো পুংকেশর গর্ভকোষ আর পরাগকোষ, সবগুলোই যেন সোনালীরঙে মাখামাখি। ফুলের পাপড়িবিন্যাস, গঠনপ্রকৃতি ঠিক গোলাপফুলের মতো। তাই হয়তো এই ফুলগুলোকে গোলাপজাতীয় বলে উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা চিহ্নিত করেছেন।

শখের বাগানে যদি এমনি জিউস এলিটামের একটা বড় ধরনের বেড থাকতো, দেখি আর কল্পনা করি। পাপড়ির বর্ণ ও ফুলের বিভিন্ন অংশগুলো বারবার দেখে

মন ভরে যায়। যে কোন নার্শারী ফুলের চাইতেও সুন্দর। কল্পনা করি, হিমালয়ের নির্জনে ফুটে ওঠা এই সুন্দর ফুলগুলো কোলকাতার জনবহুল স্থানের কোন এক বাগানে সাজিয়ে রাখতে। ছবি তুলে রেখে দিতে চাই। কিন্তু ছবি তুলবার মতো উপযুক্ত যন্ত্র যে আমার কাছে নেই!

১৯৬০ সনে যখন রূপকুণ্ডে গিয়েছিলাম, তখন আমার নিজস্ব কোন ক্যামেরা ছিল না। এমন দুর্গম জায়গায় যাব অথচ ক্যামেরা নেই ছবি তুলবার জন্য! আমার এক সহকর্মী অমল দাস তার ক্যামেরা দিয়েছিল প্রায় জোর করেই। কিন্তু ক্যামেরা ব্যবহার করতে জানি না। অমল নানাভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিল, কেমন করে ছবি তুলতে হয়। ফোল্ডিং ক্যামেরা, একটি রোলে বারোটি ছবি তোলা যায়। আমি নিয়েছিলাম মাত্র চারটি রোল। রেল কোম্পানীতে সাধারণ কেরাণীর চাকুরী করি, আর্থিক অবস্থাও তেমন নয় যে প্রচুর ফিল্ম নিয়ে যাবো।

তারপর রূপকুণ্ডের পথে গাছপালা, সবুজ তৃণভূমি, বিচিত্র বর্ণের ফুল দেখেছি অজস্র। ফুলের ছবি তোলবার লোভ হলেও ছবি তুলবো কেমন করে? অমল কাগজে লিখে দিয়েছিল কিরকম পরিবেশে, কিভাবে ছবি তুলতে হবে। দু'চোখ ভরে নানাবর্ণের ফুল দেখে গিয়েছি। রূপকুণ্ডে পৌঁছে ছবি তুলেছি ভয়ে ভয়ে। এ পথে আর কোনদিন যাওয়া হবে কিনা জানি না! আশঙ্কা, ছবিগুলো যদি যথার্থই না ওঠে, ফিরে এসে সবাইকে যদি না দেখাতে পারি? ছবি অবশ্য উঠেছিল। স্মরণীয় সে ছবি। ছবির মধ্যে আমার আশা-আকাঙ্ক্ষার চিত্র যেন পরিস্ফুটিত হয়েছিল। পরে রূপকুণ্ড সম্বন্ধে আনন্দবাজার পত্রিকায় রবিবাসরীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেদিনের ঘটনা আজও আমার মনে পড়ে।

আনন্দবাজার পত্রিকার অফিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম কি একটা কাজে। রাস্তায় এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। হিমালয় প্রেমিক। রূপকুণ্ডে গিয়েছিলাম সে জানতো। বন্ধুটি রূপকুণ্ডের কথা উঠতেই ছবি দেখতে চাইল। ছবিগুলো দেখছিল আর আমার কাছ থেকে সব জানতে চাইল। রাস্তার ওপাশে একজন ভদ্রলোক সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে আসছিলেন। আমাদের কথাবার্তা শুনছিলেন। আমার তোলা ছবিগুলো দেখছিলেন। দেখতে দেখতে ভদ্রলোক বলেছিলেন: আপনি বুঝি ঘুরে এলেন রূপকুণ্ড থেকে? মাত্র এই কটা ছবি তুলেছেন?

আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকাতেই, তিনি বললেন: চলুন না, আমার অফিসে! ছবিগুলো দেখা যাবে, গল্পও শোনা যাবে আপনার কাছ থেকে।

—কোথায় আপনার অফিস?

ভদ্রলোক বললেন—এই কাছেই, আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসে !

ভদ্রলোকের সঙ্গে গিয়েছিলাম তাঁর অফিসে। চা-বিস্কুট আনলেন। যত্ন করে দেখলেন ছবিগুলো। আমার ভ্রমণের গল্পও শুনলেন আগ্রহ করে। শেষে বললেন - আপনি রূপকুণ্ডের গল্প যেমন করে আমার কাছে বললেন এমনি করেই একটা লেখা নিয়ে আসুন না আমার কাছে! আনন্দবাজার পত্রিকায় সেটা ছাপানোর ব্যবস্থা করা যাবে।

অন্য একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন আমার পাশে। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন -ওঁকে চিনতে পারেন নি বুঝি ?

বললাম—না।

—রমাপদ চৌধুরী।

আমাকে কোন কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই রমাপদবাবু বললেন—এত কম ছবি ? এমন যায়গায় গিয়ে এই সামান্য কটিমাত্র ছবি ?

বললাম আমার ক্যামেরা নেই। অন্যের ক্যামেরা, তার ওপর বেশী ফিল্ম-কিনার মত অবস্থাও আমার নেই।

—আপনার ছবিগুলো খুবই ভাল হয়েছে। ঠিক আছে, আপনি সময় নষ্ট না করে বাড়ী চলে যান। রূপকুণ্ডে কিভাবে গিয়েছিলেন, কেমন দেখেছেন, মোটামুটি গুছিয়ে লিখে নিয়ে আসুন। কালকেই চাই। দেখা যাক কি করা যায় !

পরদিন বহুকষ্ট করে লিখে নিয়ে এলাম ছয় পাতার একটি লেখা। রমাপদবাবু চটকরে চোখ বুলিয়ে নিলেন আমার লেখাগুলোয়। লেখাটা নামিয়ে রেখে বললেন, এ রকম ক' পাতা লিখতে পারবেন ? বেশ কিছুটা বিব্রত হয়ে তাকালাম রমাপদবাবুর মুখের দিকে। রমাপদবাবু বললেন—ঠিক্ আছে, যতটা পারেন লিখে যান। কোথায় থাকেন আপনি ?

—মুরিতে।

—মুরি ! আমার তো খুবই পরিচিত জায়গা।

আমি মুরিতে কাজ করি ইষ্টার্ণ রেলওয়েতে, কন্‌ষ্ট্রাকশন ডিপার্টমেন্টে।

—ঠিক আছে। কবে মুরি যাবেন ?

—পরশু।

সেখানে যাবার আগে আরো ছ-সাত পাতা লিখে নিয়ে আসবেন। মুরি পৌঁছেই আট-দশ পাতা লিখে রেজেষ্ট্রি করে পাঠাবেন।

রূপকুণ্ড দেখে আসার কথা লিখেছিলাম রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায়।

রহস্যময় রূপকুণ্ড বই প্রকাশিত হয়েছিল রমাপদবাবুর উৎসাহে। তারপর লিখেছিলাম 'পথের তীর্থে', সিকিম, গৌরীগঙ্গা, হিমালয়ের ফুল, গঙ্গার কথা। হিমালয় ভ্রমণ করেছি, বই লিখেছি হিমালয় সম্পর্কে। সীমিতসংখ্যক পাঠক-পাঠিকা! দামী ক্যামেরা কেনা হয়ে ওঠে নি। হিমালয় ভ্রমণের সময় অনেকের হাতে দেখেছি দামী দামী ক্যামেরা। ক্যামেরা দিয়ে তারা নিজেদের ছবি তোলে। ফুল দেখার সময় কেউ দাঁড়ায় না। দাঁড়ালে সঙ্গীরা অধৈর্য হয়। তারা যেমন করেই হোক পদযাত্রা সমাপ্ত করতে চায়। ক্যামেরা নেই, তাই চোখ ভরে দেখি, অতৃপ্ত দেহ-মন। চোখদুটো কি ক্যামেরা হতে পারে না। সেই দুঃসহ বেদনা বুকে চেপে থাকি। ঈশ্বরের উদ্যানের অপরূপ চিত্র আমার মনের মণিকোঠায় তুলে রাখি সযত্নে। কাউকে দেখাতে পারি না যে ছবি, তাই লিখে রাখতে চাই।

লোহাজঙের পথ বেশ স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। পথের ধারে পাহাড়ের ঢালের গায়ে গায়ে রোডোডেনড্রন আরবেরিয়ামের গাছ যেন সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে। মনে হয়, সুদূর অতীতে কোন পুষ্পরসিক ছোট ছোট চারাগুলো সংগ্রহ করে সযত্নে লাগিয়েছিল। তারপর সেই পথভোলা পুষ্পরসিক ভুলে গিয়েছিল গাছগুলোর কথা। হয়তো চলে গিয়েছিল অন্য কোথাও নতুন যায়গায় পাহাড়ের ঢালের মুখে নতুন করে রোডোডেনড্রনের চারাগাছ লাগাবার জন্য। হিমালয়ের অনেক যায়গায় এমনি সাজিয়ে রেখেছে অপরূপ ফুলগুলো। কাজ করে গিয়েছে, ফুল ফোটা দেখার কথা ভাবেনি। এপ্রিল মাসে সমস্ত সারিবদ্ধ রোডোডেনড্রনের টকটকে লালফুল ফুটে চারদিক আলোকিত করে। আগষ্ট মাস, সবফুল ঝরে গিয়েছে। ফল হয়েছে ডালে-ডালে, পাতায় পাতায়। দূর থেকে মনে হয় কুঁড়ি। রোডোডেনড্রনের গাছের ছায়ায় গিরিপথ পৌঁছেছিলাম। সামনেই সেই পুরনো মন্দির, ঘণ্টা রয়েছে ঝুলানো। ১৯৬০ সনের লোহাজঙ, ১৯৭১ সনে ভোল বদলে গিয়েছে। চায়ের দোকান, ডালডায় ভাজা পকৌড়ি, লাড্ডু। একটি দর্জির দোকান রয়েছে, তবে সেই মালিক আর দুর্গা কোথায় জানি না। সেই দর্জির দোকানেই রাত্রিবাস করেছিলাম দেবল থেকে এসে ১৯৬০ সনে। দুর্গা মান্দোলী গ্রাম থেকে আলু, কাঁচালঙ্কা এনে দিয়েছিল। ঘি, আলু-ভাতে রান্না করা খাওয়া শেষ করে দুর্গার কাছে বসে বসে গল্প শুনেছিলাম। ওকে বলেছিলাম, অনেক যাত্রী আসবে এইপথে। এগারো বছরের মধ্যেই আমার সে কথা সত্যে পরিণত হয়েছে।

সূর্যের আলো সতেজ হতে চলেছে। আমার সঙ্গীরা সবাই এসে বসেছে রোদে পিঠ ঠেকিয়ে। লোহাজঙের স্বল্প পরিসর বুগিয়াল। উত্তরদিকে দূরে আলিবুগিয়াল

দেখতে পাওয়া যায়। দক্ষিণে কোয়েল গঙ্গার ঢালু উপত্যকা ছবির মতো দেখা যায়। বহুদূরে পাহাড়ের গায়ে গায়ে ঘন সবুজ বন। পাহাড়ের ওপরে সাদা সাদা মেঘ পেজা তুলোর মতো থোকা থোকা জমে রয়েছে। তার ওপরে সূর্যের লোহিত আভা সুন্দর দেখায়। লোহাজঙের স্বল্প পরিসর ময়দানে মসৃণ ঘাসের কার্পেট দিয়ে আবৃত। সেই মসৃণ ঘাসের মাঝখান থেকে মাথা উঁচু করে রয়েছে গাঢ় হলদে রঙের কম্পোজিটা আর পোটেন্টিলার ফুলগুলো! বৃষ্টি আর শিশিরে ভিজে ফুলের কুঁড়িগুলো চোখ মেলে তাকিয়ে রয়েছে। এইসব হলদে ফুলের ভীড় ঠেলে উঁকি দিয়েছে সাদা রঙের এনাফেলিস গাছ। প্রায় ফুট খানেক দীর্ঘ গাছে অজস্র ফুল। মসৃণ পাপড়ি, পার্চমেণ্ট পেপারের মতো স্বচ্ছ ও সুন্দর। সামনে ঢালের মুখে হলদে রঙের পোটেন্টিলা আর কাঁচা সোনারঙের জিউম এলিটাম। সুন্দর, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। পোটেন্টিলা ফুলগুলো জিউমের তুলনায় ক্ষুদ্রাকৃতি। সবুজ ঘাসের ডগায় হলদে রঙের ফুলগুলো সুন্দর মানিয়েছে। পোটেন্টিলার ফুলগুলো গোলাপ-জাতীয়। সেদিক দিয়ে জিউমের সমগোত্রীয়। হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে পঁচিশটারও বেশী প্রজাতি দেখতে পাওয়া যায়। প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উচ্চতা থেকে শুরু করে ষোল হাজার ফুট উচ্চতায় এই ফুল দেখা যাবে। ফুলের কোন গন্ধ নেই। উচ্চ উপত্যকায় ফুলগুলোর মূল স্ফীত হবার প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়। মূলে ভোলাটয়েল তেল থাকে, সেই তেল গন্ধযুক্ত। পাতা ও কাণ্ডে মসৃণ রোম থাকে। সবই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, তুষারপাত থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা। নিম্ন তাপমাত্রায় যাতে জীবনের চিহ্ন বজায় রাখতে পারে। জিউমের একাধিক প্রজাতি হয়তো আছে! তবে লোহজঙে মাত্র দুটি প্রজাতি দেখি। স্থানীয় লোকেরা এই গাছকে গুগমূল বলে জানে।

জিউম এলিটাম আর পোটেন্টিলা দেখতে দেখতে চোখ পড়ে যায় একটা মরা পাইন গাছের দিকে। গাছের গুঁড়ির গায়ে লতিয়ে উঠেছে জিরানিয়াম নেপালেন্সিস্। আলো আর ছায়ার আড়ালে অজস্র গাঢ় গোলাপী রঙের জিরানিয়াম। বহুদূর থেকেই নজরে পড়ে ফুলগুলোকে। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা হয়তো কোন একবালে গিয়েছিলেন নেপাল-হিমালয়ে ফুলের সন্ধানে। সন্ধানী দৃষ্টির সামনে ধরা পড়েছিল এই উজ্জ্বল বর্ণের ফুল। ফুলের পরিচয় দরকার। গোত্র-জাতি জানা প্রয়োজন। নেপাল-হিমালয়ে দেখা গিয়েছিল তাই নাম 'জিরানিয়মি নেপালেন্সিস। স্থানীয় লোকজন এই গাছকে বলে রতনজোত। জিরানিয়াসি পরিবারের এই গাছের চৌদ্দ পনেরটার চাইতেও বেশী প্রজাতি দেখতে পাওয়া

যাবে হিমালয়ের সর্বত্র। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা হয়তো ভেবেছিলেন এই প্রজাতি শুধুমাত্র নেপাল-হিমালয়েই দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু এই প্রজাতি হিমালয়ের অনেক স্থানেই ৪০০০ হাজার ফুট উচ্চতা থেকে শুরু করে প্রায় ৪০,০০০ হাজার ফুট উচ্চতা পর্যন্ত দেখা যায়। ভিজে মাটি, আর্দ্র বাতাস, হাল্‌কা রোদ, ধূপছায়ায় এই জিরানিয়াম্নি যেন ফুটে থাকে অজস্র। উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফুলের ঔজ্জল্য হারিয়ে যেতে থাকে। তবে আকৃতি ছোট হয় না। পাথরের ধারে আর্দ্র মাটি বেয়ে লতিয়ে যায় গাছগুলো। অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় অজস্র ফুল পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সঙ্গীরা অনেকেই ফুল দেখে এগিয়ে আসে। মূল্যবান ক্যামেরা নিয়ে ঘিরে ফেলে অজস্র ফুলগুলোকে। ফুলগুলো শান্ত, স্তব্ধ, স্নিগ্ধ দৃষ্টি মেলে তাকায়। ভয় পেয়ে, তাড়া খেয়ে পালাতে পারবে না, জানে। অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও করতে পারে না। ছবি তোলার উৎসাহ কমে যায় ধীরে ধীরে। অচেনা ফুলকে চিনে রাখবার জন্য নানা প্রচেষ্টা দেখি। নির্দয়ভাবে ফুল ছিঁড়ে ফেলা, পাতাগুলো শুকে দেখা, ফুল শুকে-নির্গন্ধ ফুলকে ছিড়ে কুটি কুটি করে ফেলে দেওয়া, ছড়িয়ে রাখা রয়েছে যত্র-তত্র। সর্বোপরি দু চারটে ছোট গাছকে উপড়ে নিয়ে পথ চলতে চলতে অনেকেই ফেলে দেয় পথের ধারে। আমি দেখি আর বেদনা বোধ করি। ফুলের কোন গন্ধ নেই,—তবু ফুল ছিড়ে গন্ধ শুকে পথের ধারে ফেলে দেওয়ার অনাদর বুকে লাগে। তাকিয়ে দেখি পথের ধারে উজ্জ্বল ফুলগুলো মৃত্যুর বেদনায় পাংশু হয়ে ম্লান হয়ে গেছে। সারা পথেই ফুল, গাছের আড়ালে, পাথরের ফাঁকে···। ফুল দেখা, ছিড়ে শুকে কুটি কুটি করে ফেলে দেওয়া, এ সবই ফুলকে ভালবেসে স্মরণ করে রাখার নমুনা কিনা জানি না। অবশ্য ছবি তোলার পেছনে স্মৃতিচিহ্ন রাখবার কথা মনে হয়। ফুল নম্র, স্তব্ধ প্রসন্নতায় মন ভরিয়ে রাখে। অত্যাচার, মৃত্যুর ভয়েও বিষণ্ণতা স্পর্শ করতে পারে না কিছুতেই।

সব চাইতে জীবন্ত ফুলের ছবি তুলতে পারতো হিমাদ্রি। কিন্তু সে যে বন্দুকহীন শিকারী। আমার সঙ্গেই ঘুরে ঘুরে দেখে। তারিফ করে বলে ছবি তুলে মস্ত বড় করে বাঁধিয়ে রাখলে কেমন দেখা যায়? ঘরের দেয়ালে রাখা সেই ফুলের ছবি বিছনায় শুয়ে শুয়ে দেখে চোখ বন্ধ করে মুহূর্তের মধ্যেই চলে যাওয়া যাবে লোহাজঙের সেই স্থানে। যেখানে অজস্র ফুল ফুটে রয়েছে উজ্জ্বল হয়ে।

সময় পেরিয়ে যায়। লোহাজঙের ছোট মন্দিরের ঘণ্টা বাজিয়ে একে একে সবাই এগিয়ে যায় ধীরে ধীরে। রোডোডেনড্রন গাছের ছায়ায় ছায়ায় পথ।

চলতে চলতে কেমন যেন আনমনা হয়ে যাই। পথের পাশে পাহাড়ের গায়ে গায়ে বড় বড় রোডোডেনড্রন আরবোরিয়াম গাছ। রক্তরাঙ্গা গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল, ছায়াপথ যেন উজ্জ্বল হয়ে যায় কল্পনায়। সেই আলোর পথ ধরে এগিয়ে যাই সামান্য চড়াই আর উৎরাই পেরিয়ে।

পথের ধারেই দেখি জিরানিয়াম নেপালেনসিস আর তার ফাঁকে ফাঁকে অ্যানিমনের সাদা ফুল। জিরানিয়াম নামটির উৎস গ্রীক শব্দ জিরানোজ থেকে। জিরানোজ (Geranose) অর্থ সারস পাখী। হিমালয় ছাড়া আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকার পার্বত্য অঞ্চলে পরিবেশ অনুযায়ী স্থানগুলোতে অজস্র দেখতে পাওয়া যাবে জিরানিয়াম ফুল। তবে হিমালয়ের চার হাজার ফুট উচ্চতা থেকে ষোল হাজার ফুট পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যাবে জিরানিয়ামের চৌদ্দটি প্রজাতি। লাল; গোলাপী, নীল, বেগুনী রঙের ফুল ছাড়াও কোথাও কোথাও ধব্‌ধবে সাদা রঙের জিরানিয়ামের ফুল দেখা যায়। তবে এই পথে চলতে চলতে দেখি আর খুঁজে বেড়াই। সামনেই কতকগুলো বড় বড় পাথর দেখে আমি আর হিমাদ্রি বসে পড়ি। আর সবাই ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে। স্বপন হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করল—কি হোল ?

—দেখছি চারদিকটা, আমি বলি। স্বপন আর একটা পাথরের ওপরে বসে। ওর ফরসা মুখ ঘামে ভরে গেছে।

স্বপন বলে—বেশ ভালই লাগছে বসে থাকতে। চারদিকে কত ফুল, এ অঞ্চলের ভেজিটেশন বেশ ভাল। খুব বৃষ্টি হয় এ অঞ্চলে।

সুজল ও অমিয় এগিয়ে এসে আমাদের দেখে থমকে দাঁড়ায়। হ্যালো ডাক্তার! কি দেখছো ?

—ফুল আর প্রজাপতি !

—প্রজাপতি তুমিই দেখো, ফুল দেখুক বীরেনদা !

—না, প্রজাপতি তোমাদের জন্য ধরবার চেষ্টা করছি !

সুজল ও অমিয় হাসে। লাভ নেই ডাক্তার। তুমিই বরং চেষ্টা করো।

—সিনিয়ারদের ছেড়ে প্রজাপতি আমার কাছে আসবে কেন ?

ওরা হাসে, হাসতে হাসতে চলে যায়। সুজলকে সবাই ঠাট্টা করে কনফার্মড্‌ ব্যাচেলর বলে। ঠাট্টা করে সবাই রসিকতা করে বলা হয় নানা কথা। সুজল সব হেসে উড়িয়ে দেয়। হিমালয় দেখতে দেখতে চোখ সব সময় ওপরে থাকে আর কিছুই দেখবার সুযোগ পাই নি।

দলের মধ্যে সব চাইতে ঝড়ের বেগে ছোটে রমেনদা। রমেনদার কাঁধে প্রচুর মালপত্র, হাল্কা শরীর। সবাই ঠাট্টা করে বলে পাখা লাগানো আছে পিঠে। স্বপন উঠে দাঁড়ায়। না, আর বিশ্রাম নয়. বিকেলের দিকে এ অঞ্চলে আবার বৃষ্টি হয়। হাঁটা শুরু করি।

আমরাও উঠি, সামনে অনেকগুলো এবড়ো-খেবড়ো পাথরগুলোর আড়ালে অজস্র কোরাইডালিস। হলদে রঙ ফুলগুলোর। গাছগুলো যেন লতিয়ে পাথরগুলো প্রায় ছেয়ে ফেলেছে। কোরাইডালিসের বেশ কয়েকটি প্রজাতি রয়েছে। হলদে, হালকা গোলাপী. হালকা নীল রঙের ফুল সচরাচর ছয়-সাত হাজার ফুট উচ্চতা থেকে শুরু করে চোদ্দ-পনেরো হাজার ফুট পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায় হিমালয়ের অনেকস্থানেই।

বেশ কিছুটা উৎরাইয়ের পর একটা ঝরণা পেরিয়ে আবার চড়াই। সবাই এগিয়ে গিয়েছে। সুস্পষ্ট পথরেখা চলে গিয়েছে চড়াই পথে। পথের ধারে হালকা গোলাপী রঙের পেডিকুলারিস। একসঙ্গে এত ফুল দেখে হিমাদ্রি দাঁড়িয়ে দেখে। পেডিকুলারিসের কাছেই অজস্র জিরানিয়াম নেপালেন্সিসের গাঢ় গোলাপী ফুল। স্বপন আমার দিকে তাকিয়ে বলে দেখেছেন কত ফুল?

আমি বলি– এই উচ্চতায় জিরানিয়াম নেপালেন্সিসের বাসস্থান। বৃষ্টি, কুয়াশা আর হালকা রোদ, ঐ ফুলগুলোর ঔজ্জ্বল্য যেন আরও বাড়িয়ে দেয়।

স্বপন বলে—এর চেয়ে বেশী উচ্চতায় এই ফুল আর দেখা যাবে না?

—যাবে। তবে, এই প্রজাতি নাও পাওয়া যেতে পারে। সেখানকার জিরানিয়ামের রঙের ঔজ্জ্বল্য আর দেখা যাবে না। গাছের মূল স্ফীত দেখা যাবে।

স্বপন চলতে চলতে বলে—এর কারণ?

—কারণ গাছগুলোর মূলে প্রচুর কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন আর ফ্যাট থাকে। ফ্যাট অর্থ ভোলাটয়েল তেল থাকে স্ফীত মূলে। সেই তেলে ভেষজগুণ থাকে। জিরানিয়াম নেপালেন্সিসের মূলে নাকি দাঁতের যন্ত্রণা উপশম হয়।

পথ চলতে চলতে এগিয়ে চলি, গল্প করি। হিমালয়ের উচ্চ উপত্যকায় উদ্ভিজ্জের স্ফীত মূল হওয়ার কারণ নিয়ে নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য শুনেছিলাম। বলি, সেসব কথা। অস্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষকে যেমন নানা অসুবিধা, বিপদ, বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়, ঠিক তেমনি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয় উদ্ভিজ্জকেও। নিম্নচাপ, নিম্নতাপমাত্রা, প্রচণ্ড তুষারপাত আর হিমশীতল পরিবেশের মধ্যে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কথা ভাবতেই মানসচক্ষে শীতের তুষারে

নিমজ্জিত উদ্ভিজ্জের দুঃসহ অবস্থা ভাবি। এই তুষার গলতে কমপক্ষে তিন মাস সময় লাগে। এই সময় হিমশীতল পরিবেশে গাছগুলোর মূল কিন্তু তাপমাত্রা সংরক্ষণ করে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। বরফ গলা জলে সিক্ত মাটির বুকের উষ্ণতা স্পর্শ করে স্কন্দমূল দ্রুত দেহে রস সঞ্চার করে। দেখতে দেখতে মাটির বুক জুড়ে কচি পাতা আত্মপ্রকাশ করে। মে মাসের গোড়াতেই ফুল ফুটতে শুরু হয়। বীজের সঞ্চার হয় দ্রুতবেগে। বীজগুলো শীতের প্রথমেই মাটির বুকে ঝরে পড়ে। প্রকৃতির এক অপরূপ সংরক্ষণাগারে বীজগুলো সজীব থাকে। অপেক্ষা করতে থাকে পরবর্তী বরফ গলার সময় পর্যন্ত। নিম্নতাপে উদ্ভিজ্জের বীজ প্রয়োজনের অতিরিক্তই কার্বো-হাইড্রেট ফ্যাট, প্রোটিন সংগ্রহ করে থাকে ভবিষ্যতের জন্য। মে মাসে ফুলগুলোয় বীজে রূপান্তরিত হয় জুলাই মাসে। বর্ষার তুষারপাতে আবার মাটির বুকে বরফের তলায় আশ্রয় নেয় ডিসেম্বরের শীতে। জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী-মার্চ পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকতে হয় বীজগুলোকে। বীজগুলোর প্রোটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াস মৃত হয় না তুষারে চাপা থাকলেও। স্ফীত মূলগুলোয় সঞ্চিত খাদ্য ও বীজে প্রচুর সঞ্চিত তৈলজাতীয় রস—প্রচুর ঠাণ্ডায় ভ্রূণ, গাছের মূল তাপ সংরক্ষণ করে প্রাণ বাঁচিয়ে রাখে। লোহাজঙ গিরিপথ থেকে ওয়ান গ্রাম পর্যন্ত প্রায় পুরো পথটাই উৎরাই। ওক্ আর রোডোডেনড্রন গাছের অদ্ভুত সখ্যতা দেখা যায় পথ চলতে চলতে। এর মধ্যে সামান্য সমতল স্থান পেলেই কাঁধ থেকে বোঝা নামিয়ে ঘাসের বুকে শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। শুয়ে শুয়ে দেখা যায় গলথেরিয়া, হেনিক্রেগমা ফুল ফুটে রয়েছে সব গাছেরই। এর মধ্যে এনাফেলিসের দু-তিনটে প্রজাতি সারা পথেই দেখতে পাই। এরা যেন অমর, ফুলগুলো চক্‌চক্ করে। গাছের সব জায়গায় মসৃণ তুলোর মতো আবরণ। কোন কোন গাছে রোয়াগুলো বেশী, আবার কোন কোন গাছে কম। তবু ফুলগুলোর আকৃতি-প্রকৃতির মধ্যে তফাৎ খুবই কম। এনাফেলিস হিমালয়ের প্রায় সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। পথ চলতে চলতে মাড়িয়ে যায় পথ যাত্রীরা। দু-হাত দিয়ে অকারণে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলে দেয় পথের মাঝখানে। এরা মানুষের অত্যাচার নীরবে সহ্য করেও অমর। সেই অমরত্বের স্বাক্ষর দেখতে পাওয়া যায় বদ্রীনারায়ণ মন্দিরে পুজোর ডালির মধ্যে। গঙ্গোত্রী মন্দিরে গঙ্গামায়ের গলায় শোভা পেতে দেখেছি। এমন ইংরেজী নাম—কম্পোজিটা পরিবারের এই ফুলের যদি একটা বাংলা নাম থাকতো!

বিশ্রাম শেষ হয়। ঘাসের বিছানা ত্যাগ করে আবার উঠে পড়ি। পথের

ধারে পৌছেই তাকাই জিরানিয়াম নেপালেন্‌সিসের দিকে। এই ফুল নেপাল-হিমালয়ের দুর্গম আর দীর্ঘ পথ পেরিয়ে কি করে এসেছিল লোহাজঙ গিরিপথে, জানি না। সেখান থেকে চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে আবার আমাদের সাথে সাথেই চলেছে ওয়ান গ্রামে। পথের ধার কোরাইডালিসের দু-তিনটে প্রজাতি চোখে পড়ে। ওয়ান গ্রামে পৌছুবার মাইল দুয়েক আগে প্রচুর ভাঙ্ গাছ দেখা যায়। হিমালয়ের অনেক জায়গাতেই ভাঙ্ গাছ রয়েছে। এগুলো ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা হওয়াই সম্ভব। স্থানীয় অধিবাসীদের ভাঙ্ গাছের পাতা আর তামাক পাতা মিশিয়ে বিড়ি বানিয়ে ধূমপান করতে দেখেছিলাম, ১৯৬০ সনে রূপকুণ্ডে যাবার পথে। আমার সঙ্গী রথীন গুপ্ত গাইড রাইচাঁদের সঙ্গে বসে বসে দু'চার বার বিড়িতে টান দিয়েছিল। শরীর গরম হয় চট করে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডাতেও কষ্ট কম হয় ভাঙ গাছের শুকনো পাতা বিড়ির সঙ্গে মিলিয়ে ধূমপান করলে। আমরা অভ্যস্থ নই। হিমাদ্রি দু-তিনবার টান দিয়ে কাশতে কাশতে অস্থির হয়ে গিয়েছিল।

ওয়ান গ্রামে পৌছবার প্রায় মাইলখানেক আগে বেশ একটা বড় জলধারা, কাছাকাছি বসি পাথরের ওপরে। মোটামুটি প্রশস্ত জায়গা জুড়ে ক্যানাবিস্, ইণ্ডিকার গাছ। এবড়ো-খেবড়ো ছড়ানো পাথরের গায়ে বেয়ে উঠেছে কোরাই-ডালিস। হলদে ফুল ফুটে রয়েছে অজস্র। দূরে উঁচু পাইন গাছে ছাওয়া সুউচ্চ গিরিশিরা। এই গিরিশিরা পেরিয়ে আরো উঁচুতে উঠলে কুকিনাখাল। ১৯৬০ সনে গভীর জঙ্গল পেরিয়ে তিলবুড়ি, লাললিংড়া গিরিশিরা পেরিয়ে পৌছে গিয়েছিলাম কুকিনাখাল। তারপরই বিস্তীর্ণ তৃণভূমির ঢালে ব্রহ্মতাল। পাথরের ওপরে বসে থাকা যায় না নিশ্চিন্ত মনে। ভিজে জায়গা দিয়ে বেয়ে বেয়ে উঠছিল ছোট বড় অজস্র জোক। কুয়াশা আর ঝরণার জলে সমস্ত অংশটাই জল-কাদায় ঢাকা। ভাঙ্ গাছের মাঝখানে বিছুটি গাছ। জলধারার পাশেই আট হাজার ফুট উচ্চতায় দেখা যায় বহু পরিচিত সেই হলদে রঙের টক ফলের গাছ। নাম HIPPOPTIAE RHAMNOIDES ১৯৬২ সনে ভুাইণ্ডার গ্রাম পেরুতেই এইগাছ দেখেছিলাম অজস্র। নীলগিরি অভিযানের সময় চন্দন সিং এই ফল সংগ্রহ করে মূল শিবিরে প্রতিদিনই চাটনি খাওয়াতো খাবার শেষে। কাচা লঙ্কা, নুন আর তেল মিশিয়ে পিষে চাটনী বানাতো। খুবই মুখরোচক হোত। পাথরের ওপরে বসে বসে দেখি ফলগুলো পুষ্ট হয়ে পেকেছে।

হুকুম সিংকে বলি—এই ফল নিয়ে গেলে হয় না, চাটনী বানাবার জন্য ?

হুকুম সিং হাসে—সাহেব লোক এসব খাবে না।

—জংলী ফল, কি হবে খেলে ? ভয় পায় সবাই।

ওয়ান গ্রাম প্রায় সাড়ে আট হাজার ফুট উচ্চতায় পাহাড়ের ঢালের গায়ে অবস্থিত। বেশ একটা বড় জলধারা (যাকে স্থানীয় লোকেরা রাবণ-গঙ্গা বলে) পেরিয়ে গ্রামে পৌছতে হয়। রাবণ-গঙ্গাকে আবার কেউ কেউ বলে নীল গঙ্গা। স্থানীয় অধিবাসীরা এই জলধারা সুন্দর ভাবে ব্যবহার করে। এই জলই তারা পানীয় হিসাবে ব্যবহার করে। জলধারার ঢালের দিকটায় দেখি পানচাক্কী। সমস্ত গ্রামের অধিবাসীরা গম, রায়দানা পিষিয়ে নেয়। জলের ধারে পাথরের গায়ে অসংখ্য জোক। আমাদের গায়ের গন্ধে সচকিত হয়ে ওঠে। জলের ধারে শুকনো পাথরের ধারে বেশ কয়েকটা হলদে রঙের ইমপেশান ফুল ফুটে রয়েছে।

পানচাক্কীর মালিক একজন স্থানীয় বৃদ্ধা। আমাদের দেখে খুবই খুশী হয়ে ওঠে। বৃদ্ধার বয়স জিজ্ঞাস করলেই হাসে। দূরের ঐ পাহাড়ের গা বেয়ে মস্ত বড় ধ্বস নেমেছিল, সেই সময় তার বয়স কম। সেই বয়সে এই পানচাক্কী চালাতো তার মা। হিমালয়ের প্রায় সর্বত্রই এই পানচাক্কীর প্রচলন ছিল সুদূর অতীতকাল থেকেই। ঘুরে ঘুরে দেখি আর অবাক হই। এই সব অশিক্ষিত মানুষ, যারা বর্তমান সভ্যতার আলো দেখতে পায়নি, তারা সাধারণ মালমসলা দিয়ে কেমন সুন্দর গম পেষাই করছে জলধারাকে সম্বল করে। এরা হাইডেল পাওয়ার সম্পর্কে কিছুই জানে না। টারবাইন সম্পর্কে কোন ধারনা নেই। সাধারণ কাঠ-দড়ির সাহায্যে এমন নিপুণ ব্যবস্থা করেছে ভাবা যায় না। জলধারার প্রধান নির্গমন পথ রুদ্ধ করে ভিন্ন পথে নিয়ন্ত্রিত করে, ছোট ছোট পাথর সাজিয়ে ছোট ঘরের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত করানো হয়েছে। একটি গোল পাথরের চাকী দিয়ে বানানো সাধারণ যাতা। এই যাতাকে ঘুরানো হয়েছে কনভয় বেল্টের পরিবর্তে দড়ির সাহায্যে। এই দড়ি বেল্টের একটি অংশ, যাতার সঙ্গে পেচানো—অপর অংশ একটি কাঠের তক্তা দিয়ে বানানো চাকার গায়ে যুক্ত। কাঠের তক্তাযুক্ত চাকাটিকে টারবাইন বলা চলে। চাকাটা জলধারার মধ্যে নিমজ্জিত। জলের স্রোতে চাকাটি বন্ বন্ করে ঘুরতে থাকে। ঘুরন্ত চাকার সঙ্গে যুক্ত দড়ির বেল্ট যাতার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় যাতাটিও বেগে ঘোরে। পানচাক্কীর যাতা ঘোরানো নিয়ন্ত্রণ করা হয় জলস্রোতের নির্গম পথ রুদ্ধ করে বা পথ খুলে। সুদূর প্রাচীনযুগের হাইডেল পাওয়ারের নিদর্শন দেখতে হলে হিমালয়ের গ্রামগুলিতে ঝরণার ধারে পানচাক্কী দেখতে হবে। জলধারার নির্গমন পথ দুটি। একটি পথ দিয়ে জলধারা কাঠের

চাকা যুক্ত টারবাইনের ভেতরে প্রবাহিত করানো হয়। অপর নির্গমন পথ দিয়ে জলধারা সোজা প্রবাহিত হয়। দুটি নির্গমন পথই পাথর দিয়ে রুদ্ধ ও খোলার ব্যবস্থা রয়েছে।

১৯৬০ সনের দেখা ওয়ান গ্রামের বেশ পরিবর্তন দেখি। নতুন নতুন বাড়ী হয়েছে। কাঠের জানালা-দরজা যুক্ত ঘর। শ্লেট পাথরে ছাওয়া ঘরের সংখ্যা বেশ কিছু কমেছে। পরিবর্তন আমার চোখেরও। লোহজঙ থেকে ওয়ান গ্রাম পর্যন্ত বিচিত্র ফুলের সম্ভার আমাকে এক নতুন জগতের আস্বাদ এনে দিয়েছে। গ্রামের ভেতর দিয়ে চলি। যেখানে সেখানে দাঁড়াই। এই ওয়ান গ্রাম যেন আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। গ্রামের যে ঘরটায় আমি আর রথীন গুপ্ত রাত্রিবাস করেছিলাম, সে ঘর আর খুঁজে পাই না। যে ঘরটায় স্বামী প্রণবানন্দজী বাস করতেন, সে ঘরটিও আর দেখতে পাই না। সেই সেদিনের দরিদ্র মানুষগুলো আমাদের সামনে এসে অভিনন্দন জানায়। যখন জানতে পারে আমি আজ থেকে এগারো বছর পূর্বে এই গ্রামে এসে ক'দিন কাটিয়েছিলাম, তখন সসম্ভ্রমে আমার দিকে তাকায়। আবার অভিনন্দন জানায়। এইসব দরিদ্র মানুষগুলোর গুটি কয়েক আমার সঙ্গে গিয়েছিল রূপকুণ্ডের পথে। শুকরিতে বৃষ্টিঝরা রাত্রে আশ্রয় নিয়েছিলাম এদেরই বানানো ঝুপড়ির মধ্যে। ঘাসের কুটিরে রাত্রিবাস করেছি এদের সঙ্গেই। এইসব দরিদ্র মানুষ ভেড়া-বকড়ি নিয়ে যায় বাগচো। বাগচোর কাছে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি। সেই তৃণভূমিতে রয়েছে কুট গাছ আর কুড় গাছ। দুটিই ওষুধের গাছ। ওয়ান গ্রাম থেকে পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরাও আসে। কুট গাছ (সস্যারিরা লাপ্পা) আর কুড় গাছ (পিক্রোজা কারু) তুলে নিয়ে চলে যায় গ্রামে। গাছগুলো শুকিয়ে বিক্রয় করে। কুট গাছ ফুসফুস সবল রাখে। ব্রংকাইটিস, হাপানী, সর্দি কাসির পক্ষে উপকারী। পিক্রোজা কারুর ভেতরে পিক্রোজিন নামে অ্যালকলয়েড আছে। পেটের পক্ষে খুবই উপকারী, পেটের অসুখজনিত জ্বরের পক্ষেও উপকারী। দুই গাছই তেতো স্বাদ যুক্ত। এই সব জংলী দাওয়াই গাছ তোলা চলে শীত আসবার আগে পর্যন্ত। মেয়েরা অবশ্য সমস্ত সংসার গুছিয়ে রাখে। শস্য সংরক্ষণ করে, সন্তানদের দেখাশুনা থেকে সংসারের যাবতীয় কাজ করে মেয়েরা। পুরুষদের সঙ্গে সমান পাল্লা দিয়ে বুগিয়ালে জংলী দাওয়াই গাছ সংগ্রহ করে নিয়ে আসে ঘরে। পুরুষরা অলস প্রকৃতির। হাতে অর্থ বেশী হলেই মদ খেয়ে আর জুয়া খেলে উড়িয়ে দেয়। হিমালয়ের প্রায় সর্বত্রই মাতৃতান্ত্রিক সমাজ। ওয়ান গ্রাম, উচ্চ হিমালয়ের পথে

এই শেষ গ্রাম বলা চলে। ওয়ান থেকে বাগচো যাবার পথ চলে গিয়েছে কুনোল, স্থতোল, রামনী গ্রামের দিকে। স্থতোল থেকে কুমারী গিরিপথ যাবার রাস্তা। গিরিপথ পেরিয়ে বকড়িওয়ালারা কুমায়ুন থেকে পৌছে যায় গাড়োয়ালে-তপোবনে। তপোবন থেকে একটি পথ চলে গিয়েছে নিতি গিরিপথের দিকে। অপর পথ চলে গিয়েছে যোশী মঠ। এইসব পথের নিশানা ওয়ান গ্রামের লোকদের নখদর্পণে। এই পথের মধ্যেই রয়েছে অপরূপ বুগিয়াল।

ওয়ান গ্রামের অনেক যায়গায় দেখি রুমেক্স গাছ। নিম্ন অঞ্চল বলে গাছগুলো দীর্ঘ, পাতাগুলো বড়। গাছের ডগায় ডগায় ফল প্রায় শুকিয়ে গিয়েছে। এই গাছগুলো বয়ে নিয়ে যায় ভেড়া, ছাগল। বুগিয়ালে ছড়িয়ে পড়ে রুমেক্স গাছ এক স্থান থেকে অপর স্থানে। ওয়ান গ্রামের শেষ প্রান্তে পাহাড়ের ঢাল পেরিয়ে অপরূপ স্থানে ওয়ান গ্রামের বন বিভাগের ডাকবাংলো। ডাকবাংলোর কাছেই লাটু দেবতার মন্দির। বিপদে-আপদে, ঝড়-বৃষ্টি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে লাটু দেবতা গ্রামবাসীদের একমাত্র সহায়। গ্রাম পেরিয়ে ডাকবাংলোর দিকে যাবার পথে জিউমের অজস্র কাঁচা সোনা রঙের ফুল। পথের রেখার দু' পাশের ফুলগুলো দেখে বসে পড়ি। ঢালের মুখে বলেই এত ফুল। বৃষ্টি হলে জল জমতে পারে না। তুষারপাত হলেও তুষার জমে থাকতে পারে না সহজে। গাছগুলো তাই হিমশীতল স্পর্শ থেকে কিছু কাল রেহাই পায়। আমাদের দলের সংখ্যা চল্লিশ জনেরও বেশী। সবাইকে অনুরোধ করি, ফুলগুলো যেন না মাড়িয়ে যায় কেউ। এই গাছগুলো যে ওষুধ! এই গাছের শিকড়ে যে তেল রয়েছে তার সঙ্গে অত্যন্ত দামী লবঙ্গ তেলের মিল রয়েছে। গন্ধ ও গুণাগুণ বিচার করলে প্রায় সমধর্মী। একে একে সবাই চলে যাওয়া পর্যন্ত বসে বসে দেখি। একসঙ্গে এত ফুল আর দেখিনি। মনে মনে বুঝি ঈশ্বরের উদ্যানে পৌছে গিয়েছি। উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্লান্ত যাত্রীরা বসে পড়বে, বিশ্রাম নেবে। চারপাশের বিচিত্র ফুলের মিছিলের মধ্যে ক্লান্ত চোখ মেলে দেখবে তাকিয়ে তাকিয়ে। মন ভরে যাবে, ক্লান্তি দূর হবে মুহূর্তের মধ্যে। আবার নতুন উৎসাহ, নতুন উদ্দীপনা নিয়ে এগিয়ে চলবে। জিউমের অসংখ্য ফুলের ভীড় দেখতে দেখতে ধীরপদে এগিয়ে চলি। সঙ্গীরা একে একে এগিয়ে যায় ঝড়ের বেগে, সামান্য চড়াই ভাঙ্গলেই ওয়ানের ডাকবাংলো। সেখানে আজকের মতো পদযাত্রার সমাপ্তি। বিকেল হতে চলেছে, আকাশও মেঘাচ্ছন্ন- দূরে বোধহয় কুক্কিনাখাল। সেইস্থান পেরিয়ে গোয়ালদামের জলভরা মেঘ

এসে ঝরে পড়বে। সবাই তাই তাড়াতাড়ি চলেছে। কাছেই একটা জলধারার পাশে বসে পড়ি পাথরের ধারে। দু'চোখ বন্ধ করে ঝরণার গান শুনি। মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখি জলধারার গা বেয়ে অজস্র জিরানিয়াম নেপালেন্‌সিস্‌, পোটেন্টিলা আর মাঝে মাঝে অ্যানিমনের ছোট ছোট ঝোপ! সেই ঝোপের ভেতরে অনেকগুলো করে অ্যানিমন ফুটে রয়েছে। ঝিরঝিরে বাতাস ভেসে আসছিল বহুদূর থেকে। বাতাস বন্ধ হলেই বৃষ্টি হয়তো শুরু হবে। বৃষ্টির জল পেয়ে ফুলগুলোর কোমল পেলব পাপড়ি যাবে নষ্ট হয়ে। ফুলগুলো হয়তো ফুটেছে ভোরবেলায়। মৃত্যু হবে এত স্বল্প সময়ের মধ্যেই! আর অপেক্ষা করা যায় না। সঙ্গীরা চলে গিয়েছে সবাই। এতক্ষণে হয়তো পৌঁছেও গিয়েছে ডাকবাংলোয়। ওয়ান গ্রামের চারপাশেই উঁচু পাহাড়। আর সেই পাহাড়—পাইন, দেওদার গাছে ঢাকা। আকাশে মেঘ জমলেই তা ধীরে ধীরে নামতে শুরু করে! পাইন আর দেওদার গাছের পাতায় পাতায় আশ্রয় নেয়। গাছের পাতাগুলো সাদা মেঘে যেন স্নান করে ওঠে।

ডাকবাংলোর কাছাকাছি এসেই দেখি অজস্র জিরানিয়াম, পেডিকুলারিস আর ইমপেসন্‌স্‌। সবগুলো ফুলই গোলাপী। মাঝে মাঝে অনেক এনাফেলিস ফুলও ফুটেছে। উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই গাছগুলো বেটে খাটো হয়েছে। গাছ মাটি থেকে মাত্র ইঞ্চি চারেক হবে। গাছের ডগায় ডগায় অনেকগুলো ফুল। ফুলের পাপড়িগুলো নীলাভো। অ্যানিমন শব্দটি গ্রীক নাম Anemose থেকে এসেছে। Anemore অর্থ wind। ঝিরঝিরে বাতাস পেলে সমস্ত ফুলগুলো সজীব হয়ে ফুটে ওঠে বলেই হয়তো ফুলগুলোর অ্যানিমন নামকরণ হয়েছিল। ভালভাবে লক্ষ্য করি, এগুলো হয়তো অ্যানিমন রিভ্লোরা স্কন্দমূল, মূলের গায়ে গোছা গোছা পশমের মতো অসংখ্য অস্থায়ী গুচ্ছমূলে ঢাকা। মূল ভাঙলে বেশ সুন্দর গন্ধ পাওয়া যায়। ডাকবাংলোর ঠিক কাছাকাছি আসতেই দেখি আর একটি ঝরণা। উঁচু ঢালু যায়গা থেকে জলধারা নেমে আসছিল কল কল শব্দ করে। জলধারার দু' পাশে পাড়ের দিকটায় অসংখ্য সূর্যমুখী ফুলের মতো হলদে বড় বড় ফুল দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি। এই ফুল অজস্র দেখেছিলাম ঘাংঘড়িয়া পেরুতে। কম্পোজিটা জাতের ফুল। ফুলের নাম ইন্থলা গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা। কম্পোজিটা পরিবারের এই জাতীয় ফুলগুলোর তিন চারটি প্রজাতি দেখতে পাওয়া যায়। তার মধ্যে খুব পরিচিত ইনুলা[১] রেসিমোসা ও ইনুলা গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা। ফুলের বর্ণ উজ্জল

১. ইন্থলা গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা।

হলদে। ইনুলা রয়েলিয়ানা ফুলের বর্ণ কমলা হলদে রঙের। ইনুলা রেসিমোসা ফুলের বর্ণ হলদে। ফুলগুলো দেখতে পাওয়া যায় ৯০০০ ফুট উচ্চতা থেকে শুরু করে ১৪০০০ ফুট উচ্চতায়। আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে এই ফুল দেখতে পাওয়া যায়।

যতদূর জানা যায় ইনুলা ফুলের নামকরণ করেছিলেন রোমানরা। এই ফুলের জন্ম সম্পর্কে একটি প্রচলিত কাহিনী ছিল। ট্রয়ের রাজকন্যা হেলেন ছিলেন অপরূপা সুন্দরী। ট্রয়রাজ্যে যুদ্ধ হয়েছিল– ধ্বংস হয়েছিল এই রাজকন্যা হেলেনের জন্য। এই অপরূপা সুন্দরী হেলেনের চোখের জল থেকে জন্ম হয়েছিল এক বিস্ময়কর ফুলের। ফুলের নামকরণ হয়েছিল তাই ইনুলা হেলেনিয়াম বা হেলেনুনা। হেলেনুনা কথাটির অর্থ ছোট্ট হেলেন। ইনুলা কম্পোজিটা পরিবারের বিখ্যাত ফুল। সূর্যমুখীর চাইতেও সুন্দর দেখতে। পাপড়িগুলো সরু সরু, ঘন সন্নিবেষ্টিত চন্দ্রমল্লিকার পাপড়ির মতো। ঝরণার ধারে ইনুলা গাছগুলো যেন পরপর সাজানো, অনেকগুলো করে ফুল। দূর থেকে সূর্যমুখী বলে ভুল করা অসম্ভব নয়।

ইনুলা দেখতে দেখতে কেমন যেন সব ভুলে গিয়েছিলাম। যায়গাটা ছেড়ে আসতে ইচ্ছে করছিল না। কাছেই একটা পাহাড়ের গা ঘেসে গোলাপী রঙের অসংখ্য ইমপেসেনস্। ডাকবাংলো দেখা যাচ্ছিল উঁচুতে। সঙ্গীরা সবাই চলে গিয়েছে, বিশ্রাম করছে হয়তো। আমি একটা পাথরের ধারে বসে থাকি। সবাই চলে গেছে! যাক! অন্ধকার হয়তো নেমে আসবে। অদূরে গিরিশিরার ওপরে পাইন আর দেওদার গাছের ভেতর থেকে কুয়াশা আসছিল। ইনুলার চোখ দুটো যেন সজল দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিল। বাতাসে দোল দিয়ে যায় ইমপেসেনস গাছগুলোয়। হুকুম সিং ছিল সবার পেছনে। আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে।

আমাকে ডাকে সাব, সাব?

আমি যেন চমকে উঠি—হাঁ...

—চলিয়ে সাব?

—হাঁ, চল।

—তুম থক্ গিয়া সাব?

হুকুম সিংএর দিকে তাকাই। হুকুম সিং বলে—আন্ধেরা হো গয়া, জল্‌দি জল্‌দি চলিয়ে সাব। পা আর চলতে চায় না যেন। চোখের সামনে উজ্জল হয়ে ভাস্বর হয়ে থাকে ইনুলা গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা। আনমনা হয়ে চলতে চলতে কখন যেন পৌঁছে যাই ডাকবাংলোয়। শীত গ্রীষ্ম যেন ভুলে গিয়েছি। হুকুম সিং ভাবে, আমি সত্যি সত্যি ভীষণ ক্লান্ত। আমার কাঁধ থেকে রুকস্যাক নামিয়ে ঘরে নিয়ে যায়। মগ

ভর্তি চা আর বিস্কুট নিয়ে আমার হাতে দেয়। চোখের সামনে ইনুলার হলদে ফুলগুলো ফুটে রয়েছে অসংখ্য। যেন ঝরণার জলের ধারা থেকে কুয়াশার মতো আসা জলকণা ইনুলার পাপড়িগুলো চক্ চক্ করছে। হেলেনের চোখের জল জমে জমে ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে ঈশ্বরের উদ্যানে।

ওয়ান গ্রামে দু'রাত্রে বাস করতে হয়েছিল ১৯৬০ সনে। তবে ডাকবাংলোয় উঠিনি। কারণ, ওয়ান গ্রামের ভেতর দিয়ে চলে গিয়েছিলাম শুক্রিতে। সেখান থেকে বাগচো। ফেরবার সময় বগুয়াবাসা থেকে সোজা চলে এসেছিলাম ওয়ান গ্রামে। তাই ডাকবাংলোয় অবস্থান করার কোন সুযোগই হয়নি। ১৯৭১ সনে ওয়ানগ্রামে ডাকবাংলোর সামনে নাতিপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে শুয়ে বসে কাটিয়েছি। ঘাসে ঘাসে ছাওয়া সেই প্রাঙ্গণ। রোদ উঠলে শুয়ে থাকতে ভালই লাগে। একধারে দু'তিনটে ফিউনারাল্ সাইপ্রেস্ গাছ। পাইন জাতীয় এই গাছ সব অঞ্চলে দেখা যায় না। গাড়োয়ালে গঙ্গোত্রী অঞ্চলের কাছে জাংলায় দেখেছিলাম কয়েকটি গাছ। দার্জিলিংএ চার্চের সামনে দুটো গাছ দেখে থমকে গিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই সাহেবরা লাগিয়েছিল যত্ন করে। ওয়ান গ্রামে এই গাছগুলোকে লাগিয়েছিল, জানি না। এ গাছের নামকরণ সম্পর্কে আমার এক বন্ধু বলেছিল গল্পচ্ছলে। ভগবান যীশুর বধ্যভূমির নাম গল্‌গথা। সেখানে ফিউনারাল্ সাইপ্রেসের গাছ রয়েছে অনেকগুলো। ভগবান যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করে রেখেছিল সেখানে। কোন অপরাধ তাঁর নেই, ঈশ্বরকে ভালবেসে মানুষদের ভালবাসেন তিনি। এই মারাত্মক ভালবাসা সেকালের শাসকদের আসন টলিয়ে দিয়েছিল। বিচারে মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল সেদিন। অগণিত নরনারী, তাঁর ওপরে অন্যায়, অবিচার আর অত্যাচারে মর্মাহত হয়েছিল। সে এক করুণ শোকাবহ দৃশ্যে বিশ্বপ্রকৃতিই যেন মুহ্যমান হয়েছিল। সেদিন গলগথায় বদ্ধভূমির পাশেই দীর্ঘদেহী বৃক্ষগুলি ভগবান যীশুর মৃত্যু যন্ত্রণায় আকুল হয়ে করুণ স্বরে বিলাপ করেছিল। বৃক্ষগুলির সমস্ত পাতা যেন মর্মান্তিক বেদনায় নুইয়ে পড়েছিল। ফিউনারাল্ সাইপ্রেসের পাতাগুলো নুইয়ে পড়া, সেখানে একটানা করুণ শব্দের সৃষ্টি হয়। সাইপ্রেস যেন যীশুর শোকে মাথা নত করে ক্রন্দন রত। এই বিশেষ ধরণের কনিফেরাস-এর নাম হয়তো হয়েছিল ফিউনারাল সাইপ্রেস্।

ভাগীরথীর পথ ধরে ধারালীর পর জাংলায় কয়েকটি ফিউনারাল সাইপ্রেস গাছ চীর আর দেওদার গাছের মাঝখানে দেখেছিলাম। গাছের পাতাগুলো যেন ঝুলছিল, বাতাসে কাঁপছিল আর এক অদ্ভুত ধরণের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ওয়ান গ্রামের গাছ কটিও পাইন, চীর আর দেওদার গাছগুলোর মাঝখানে যেন সম্পূর্ণ

আগন্তুক। মনে হয়েছিল, কোন এক প্রকৃতি বিজ্ঞানী এই গাছ এনে সযত্নে লাগিয়েছিলেন ওয়ান গ্রামে, এই সুন্দর পরিবেশকে আরো স্মরণীয় করবার জন্য। ওয়ান গ্রামে আমি কয়েকবার গিয়েছি। চারপাশটা ঘুরে ফিরে দেখেছি। বুগিয়ালে প্রবেশ করবার মুখে ছোটখাটো বুগিয়াল রনকধর। তারপর উৎরাই, ছোট্ট জলধারা কেউ কেউ বলে নীলধারা···। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছে যেন। ওয়ান গ্রামের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অজস্র অ্যানিমন। আগস্টের শুরুতে ফুল ফুটতে শুরু করে· সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত ফুল ফুটিয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। বীজ হয়, পুষ্ট হয়। তারপর শুরু হয় বীজ ছড়িয়ে পড়ার কাজ। বীজের গায় তুলার মতো লম্বা লম্বা আঁশ রয়েছে। বাতাসে ভর করে উড়ে যায় দূরে দূরে· উপত্যকার ঢালে ঢালে · জলার ধারে নরম মাটির বুকে আটকে থাকে। ঠিক তার পরের বছর এলেই নিশ্চয়ই দেখতাম, অজস্র অ্যানিমন ফুল ফুটিয়ে প্রজাপতির দলকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছে। ওয়ান গ্রামে বেশ উচ্চ স্থানেই দেখেছি অ্যানিমন বিফ্লোরিয়া। এই অঞ্চলে তিন রকমের নমুনা দেখেছি। ডাকবাংলোর কাছাকাছিই দেখি সবকটাই। ভালই লেগেছে। এই গাছগুলো সুসংবদ্ধভাবে লাগাতে গেলে শিক্ষিত মালীর প্রয়োজন হোত। কিন্তু ঈশ্বরের উদ্যানে তদারক করবার কোন প্রয়োজন হয় না। অ্যানিমনগুলোর উচ্চতা দু'থেকে তিনফুট। পাতাগুলো বড, ফুলগুলোও বড় বড়। পাপড়ির গায়ে ঈষৎ হলদে আভা, আর সেই হলদে আভা গাঢ় হয়েছে গর্ভকোষের দিকটায়। পুংকেশর সোনালী রঙে রঞ্জিত, পরাগের রঙও সোনালী। অ্যানিমন - র‍্যানানকুলাস পরিবারভুক্ত। হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে ৬০০০ ফুট উচ্চতা থেকে শুরু করে প্রায় ১০,০০০ ফুট উচ্চতায় ফুলগুলো বসবাস করে। মোটামুটি দশ থেকে বারোটি প্রজাতি দেখতে পাওয়া যায় এই উচ্চতার মধ্যে। ওয়ান গ্রামের আশে পাশে দেখেছি অ্যানিমন ফ্যাল্‌কনারি ও অ্যানিমন বিফ্লোরা। অ্যানিমন ফ্যালকনারি অবশ্য লোহাজঙ থেকে অবতরণের পথে ওয়ান গ্রামের দিকে দেখা যায় পাথরের গায়ে গায়ে। অন্যান্য ফুলগুলোর মধ্যে অ্যানিমন রুপিকুলা (নীলাভো রঙের ফুল), অ্যানিমন সবটিউমিলোবা (হলদে রঙের ফুল) ১০,০০০ ফুট উচ্চতায় দেখতে পাওয়া যায়। গাছগুলো খুবই ছোট, মূল স্কন্দজাতীয়···। উচ্চতার জন্য···শীতে তুষারপাত হয় বলেই সম্ভবতঃ মূলে সুগন্ধি ভোলাটয়েল তেল রয়েছে। ওয়ান গ্রাম পেরিয়ে ডাকবাংলোর ওপরে পাহাড়ের ঢালের মুখে রয়েছে অজস্র কোরাইডালিস গোভানিয়া হলদে রঙের ফুল। প্রায় ৮০০০ ফুট উচ্চতা থেকে শুরু করে ১০,০০০ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত এই ফুল দেখতে

পাওয়া যায় পাথরের খাদের মধ্যে। ঝড়, বৃষ্টি, তুষারপাত প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে বাঁচবার জন্য গাছগুলো পাথরের ফাটলে, না হয় পাহাড়ের গায়ে কার্নিশের ধারে লতিয়ে থাকে। কোরাইডালিসের সন্ধান এমনি প্রাকৃতিক পরিবেশেই দেখতে পাওয়া যায়। কোরাইডালিস শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ করুডালস থেকে। করুডালস সারসজাতীয় পাখী। প্রখ্যাত উদ্ভিদ বিজ্ঞানী গোভান-এর নামকে স্মরণ করে এই প্রজাতির নামকরণ হয়েছে। কোরাইডালিস গোভানিয়া। এই গাছের মূল-এ ভেষজ গুণ রয়েছে। শোনা যায়, এই গাছের মূল টনিকের কাজ করে। কোরাইডালিসের গাছগুলো দেখতে দেখতে হঠাৎ নজরে পড়ে বেগুনী রঙের পেডিকুলারিস সাইফোনান্থা। হিমালয়ের অনেক উপত্যকায় ৮০০০ ফুট উচ্চতা থেকে শুরু করে ১৩০০০ হাজার ফুট উচ্চতায় দেখতে পাওয়া যায়। প্রজাতির নামকরণ সম্পর্কে এক অদ্ভুত ধারনা ছিল। উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে মেষ পালকরা মেষের দল নিয়ে যেতো. উচ্চ উপত্যকায়। সেই উপত্যকায় অজস্র ফুল দেখা যেতো। মেষ চারণের পর ঘরে ফেরবার সময় দেখা যেতো অধিকাংশ মেষের গায়ে পশমের ভেতরে বাসা বেঁধেছে অসংখ্য উকুন। মেষপালকরা এর কারণ খুঁজে পেতে না পেয়ে নির্দোষ ফুলগুলোকে উকুনের বংশ বৃদ্ধির কারণ হিসেবে প্রচার করেছিল। উচ্চ উপত্যকায় এমন সুন্দর ফুলগুলোকে ভুল বুঝেই নাম করেছিল পেডিকুলারিস। পেডিকুলারিস শব্দটি জন্ম হয়েছে ল্যাটিন পেডিকুলাস থেকে। পেডিকুলাস অর্থ উকুন।

কোরাইডালিস ফিউমারিসিয়া পরিবারভুক্ত, পেডিকুলারিস স্ক্রফুল্যারিসিয়া পরিবারভুক্ত ফুল। উভয় পরিবারের মধ্যে উচ্চ হিমালয়ের বিভিন্ন অংশে দশটি করে প্রজাতি রয়েছে।

ওয়ান গ্রামের পাদদেশ থেকে ডাকবাংলোর আশে পাশে দেখতে পাওয়া যায় অ্যাস্ট্যার-এর দু তিনটে প্রজাতি। মোটা দুটি ছোট ছোট ফুল, হাল্কা নীলাভো, সাদা, ঈষৎ হলদে রঙের। প্রায় ৬০০০ ফুট উচ্চতা থেকে ১৪০০০ ফুট উচ্চতায় অ্যাস্টার দেখতে পাওয়া যাবে হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে। উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে ফুলের সংখ্যা কমে যেতে থাকে। ওয়ানের ডাকবাংলো পেরিয়ে নিশ্চিন্ত, নির্ভরশীল উষ্ণ আশ্রয় ত্যাগ করে এগিয়ে যেতে হয়েছিল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, চারপাশে গাঢ় কুয়াশা। গাছতলা দিয়ে এগুতেই গাছের পাতা থেকে ফোটা ফোটা জল পড়ে গায়, মাথায় মুখে দু চার ফোটা পড়তেই গা শির শির করে ওঠে ঠাণ্ডা লেগে। সামান্য পথ পেরুতেই ঝির ঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়। গাছের ছায়ায় ছায়ায় চলে লাভ নেই। হিমাদ্রি এই ফাঁকে ছাতা বার করে নেয়। হিমালয়ের পথে চলতে সে সঙ্গে ছাতা

নিয়ে যেতে ভোলে না। ডাকবাংলোর পরিসীমা পেরিয়ে চড়াইয়ের মুখে ঝরণা ডিঙ্গোতে গিয়ে থমকে দাঁড়াই। ঝরণার জলের দুপাশে অসংখ্য ইনুলা গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা। কুয়াশা আর ঝির ঝিরে বৃষ্টির জলে ফুলগুলো যেন ছল ছল চোখ মেলে তাকিয়ে রয়েছে। ইনুলা গ্র্যাণ্ডিফ্লোরার গাছের মূলে ভেষজ গুণ রয়েছে। সুগন্ধি ভোলাটয়েল তেল রয়েছে। ইনুলার জলভরা চোখের ছবি দেখতে দেখতে স্যাঁতসেতে পাথর, জল কাদা, নরম মাটিযুক্ত চড়াই পেরিয়ে এক সময় ওয়ান গ্রামের সর্বশেষ কটা ঘর আড়াল করে পৌছে যাই রনকধর। ছোটাখাটো বুগিয়াল বলা চলে। সবুজ ঘাসে ঢাকা নাতিপ্রশস্ত ময়দান জুড়ে দেখি অজস্র পেটোন্টিলা আর কম্পোজিটার হলদে ফুল। সবুজ ঘাসের বুকের ওপর দেখি জিউম এলিটামের বেশ বড় বড় কাঁচা সোনার রঙের ফুল। এই সব হলদে ফুলের মেলা অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাড়িয়েই যেতে হয়। বৃষ্টি তখন ধরেছে। রোদের হালকা তেজ লাগে আমাদের সর্বাঙ্গে। রনকধার থেকে অবতরণ শুরু হয়। আমার সঙ্গে হিমাদ্রি স্বপনও অবতরণ করতে থাকে। নীচে নীলধারা, ছোটখাটো জলধারা। কাছাকাছি এসে জলধারার শব্দ শুনি। কাঠের তক্তা দিয়ে বানানো সেতু পেরিয়ে ওপারে সবাই বিশ্রাম নেয়। জলধারার দুধারে অসংখ্য হলদে ও গোলাপী রঙে ইমপেশনস্ ফুল ফুটে রয়েছে। ইমপেশনস্ গাছের গায়ে গা লাগিয়ে বসবাস করছে বিছুটি পাতার গাছ। বিছুটি গাছ অবশ্য হিমালয়ের সর্বত্রই ৪০০০/৫০০০ ফুট থেকে শুরু করে ১০,০০০ ফুট উচ্চতায় দেখতে পাওয়া যায়। তিন চারটে প্রজাতি দেখেছি হিমালয়ের বিভিন্ন উচ্চতায়। অত্যন্ত স্যাতসেতে ঠাণ্ডা যায়গা বেছে নিয়ে এই গাছ বেশ সতেজ ও পুষ্ট হয়ে ওঠে। ঝরণার জলের ছিটে এবং কুয়াশা এ গাছকে যেন শক্তিশালী করে তোলে। পথযাত্রীদের এরা যেন দু'চোক্ষে দেখতে পারে না। অবশ্য যাত্রীরা পরিচয় পেলে আর উপায় নেই। লাঠি থাকলে পিটিয়ে গাছের পাতা, কাণ্ড ভেঙ্গে দেয়। অবশ্য সামান্য অসতর্ক হয়ে পথ চলতেই একটু স্পর্শ, ফল হাতে হাতে। কয়েক ঘণ্টা চুলকানির পর জ্বালা বোধ। আক্রান্ত স্থান ফুলে যায়। ১৯৬৫ সনের স্মৃতি জেগে ওঠে। ত্রিশূলী পর্বত অভিযানে গিয়েছিলাম সেবার। মুন্সিয়ারী থেকে সকালে রওনা হয়ে বেলা দুটোয় পৌছে গিয়েছিলাম লিলাম গ্রামে। স্টোভ জালিয়ে ছুঙে চা বানাচ্ছিল। হঠাৎ দেখে আমাদের শেরপাদের মধ্যে সোনা, টোপকে দুটো কাঠির সাহায্যে বিষাক্ত বিছুটি গাছের ডগা ছিড়ে নিয়ে সংগ্রহ করছিল চটের বস্তার মধ্যে। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি। এই বিষাক্ত গাছ দিয়ে কি করবে এরা ?

ছুঙেকে জিজ্ঞাসা করি—এই সব বিছুটি গাছের ডগা দিয়ে কি হবে ?

ছুঞ্চে চায়ে চিনি মেশাতে মেশাতে বলে অত্যন্ত সহজভাবে—স্যুপ বানায় গা সাব।

—স্যুপ! বিছুটি পাতা দিয়ে! আমি ভয়ে আৎকে উঠি। অবিশ্বাসের দৃষ্টি মেলে তাকাই ছুঞ্চের মুখের দিকে। পথ চলতে চলতে ইতিমধ্যেই বার কয়েক বিছুটি পাতার স্পর্শ লেগেছিল। ছুঞ্চে হাসে আমার দিকে তাকিয়ে। চা পান করতে করতে দেখি বিছুটি গাছের কচি ডগাগুলো বেশ সন্তর্পণে জল দিয়ে ধুয়ে বড় প্রেসার কুকারে ঠেসে ভর্তি করে ওরা সবাই মিলে। তারপর আন্দাজ মত জল, হলুদের গুড়ো, লঙ্কা গুড়ো, নুন, পেয়াজ কুচি দিয়ে প্রেসার কুকারে সেদ্ধ করতে শুরু করে। সেদ্ধ হতেই কুকার নামিয়ে ফেলে ছুঞ্চে। ঠাণ্ডা হতেই কুকারের ঢাকনা খুলে ভাল করে দেখে নেয়। ডালের কাটা দিয়ে সিদ্ধ পাতাগুলো ভাল করে মিশিয়ে ফেলে। আগ্রহভরে তাকিয়ে দেখি সুন্দর সবুজ রঙের স্যুপ। সামান্য মাখন মিশিয়ে ছুঞ্চে চামচে করে তুলে মুখে দিয়ে পরীক্ষা করে নেয়। বেশ তৃপ্তির হাসি হেসে বলে আমার দিকে তাকিয়ে—সাব্, স্যুপ বন্ গিয়া। টেষ্ট করো তারপর বিনা সঙ্কোচে আধ মগ গাঢ় সবুজ রঙের স্যুপ আমার হাতে তুলে ধরে।

কি সাংঘাতিক! আমাকে কি জোর করে এই বিষাক্ত স্যুপ খাইয়ে দিতে চায়? ছুঞ্চে হা হা করে হাসে।—সাব্, ঘাবড়াও মাৎ। বহুৎ আচ্ছা লাগে গা। ছুঞ্চে হাসে আমার দিকে তাকিয়ে।

অবশেষে মন্ত্রমুগ্ধের মতো মুখে তুলে ধরি বিছুটি পাতার স্যুপ। অস্বীকার করবার উপায় নেই। স্যুপ সত্যি সুস্বাদু। আমাদের দলের সবাই মগ নিয়ে এসে স্যুপ খায়। খায় আর হো হো করে হাসে। বিছুটি পাতার স্যুপ একথা কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না।

নীলধারা আর বিছুটি গছের ভীড় এড়িয়ে চড়াই ভাঙ্গতে হয়। আকাশ মেঘে ঢেকে যায়। হলদে আর গোলাপী রঙের ইমপেশনস্ ফুল দেখে নিই আর একবার। জানি এই পথে এ ফুল আর দেখা যাবে না। হিমালয়ের প্রায় সর্বত্রই ৬০০০ ফুট উচ্চতা থেকে দেখা যাবে এই ফুলগুলো। বর্ষার শেষে গাছগুলো পুষ্ট হয়ে ফুল ফুটতে থাকে। গাছের কাণ্ড, মূল প্রায় দোপাটিজাতীয়। ভিজে স্যাতসেতে মাটির বুকে ইমপেশনস্ গাছ বাসা বাধে। অজস্র ফুল স্ফোটকজাতীয় ফল। ফল পাকলেই সামান্য ছোয়া পেতেই শব্দ করে ফেটে বীজ দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ে। এমনি করে গাছ ছড়িয়ে পড়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে। দশটি প্রজাতি হিমালয়ের বিভিন্ন উচ্চতায় দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে তিনটি প্রাজাতি ১৩০০০ ফুট উচ্চতায় দেখা যায়। সাদা, গোলাপী, হলদে রঙের ফুলই সাধারণতঃ

দেখা যায়। গাঢ় লাল, গাঢ় বেগুনী, নীল রঙের ইমপেশনস্ আমি কখনো দেখিনি। ইমপেশনস্ গাছ চার থেকে ছয় ফুট দীর্ঘ হয়। এগুলো অবশ্য ৫০০০ ফুট থেকে ৮০০০ ফুট উচ্চতায় সীমাবদ্ধ। নরম কাণ্ড, পাতা, কাণ্ডে প্রচুর জলীয় পদার্থ দেয়া যায়। ভেড়া ছাগল···মহা আনন্দে এই গাছ মুড়ে খায়। এ সব অত্যাচার থাকা সত্ত্বেও গাছগুলোর ভগ্ন শাখা-প্রশাখায় নতুন পাতা গজিয়ে নতুন উদ্যমে অজস্র ফুল ফুটিয়ে ভরিয়ে রাখে চারদিক। উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গাছ ছোট হয়। ফুলের পরিমাণ যায় কমে। শুকনো বা জলশূন্য স্থানে ইমপেশনস বাসা বাঁধতে পারে না। তবে পাথরের ফাটলে···চুইয়ে পড়া জলে সিক্ত স্থানে ইমপেশনসের গাছ দেখতে পাওয়া যাবে

নীলধাধা পেরিয়ে চড়াই পথ উঠে গিয়েছে গভীর বনের মধ্যে। বনের তলদেশ পরিষ্কার। পাইন দেওদার গাছের তলায় আর কোন আগাছা নেই। গাছের গুঁড়ির কাছে পাথরের গায়ে বিচিত্র বর্ণের ছত্রাক দেখতে দেখতে এগিয়ে চলি। সামনে শুধু চড়াই, ধাপে ধাপে পথ যেন উঠে মিলিয়ে গিয়েছে গভীর বনভূমির মধ্যে। নীল আকাশের নিশানা হারিয়ে গিয়েছে। তবে আকাশের বুক থেকে থোকা থোকা গাঢ় সাদা মেঘ যেন পাইন, দেওদার গাছের ডগা ভর করে নেমে এসেছে বনানীর মাঝখানে। সেই মেঘ-মাটি আর পাথরগুলোকে ভিজিয়ে অদ্ভুত স্যাঁতসেঁতে পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। গাছের পাতা ঝরে ঝরে জমেছে পথের ধারে। কেমন এক অদ্ভুত গন্ধ, কেমন যেন ক্লান্তি অবসন্নতা। যেন অনন্তকাল ধরে স্বর্গের সিঁড়ি পেরুতে পেরুতে এগিয়ে চলেছি ঈশ্বরের উদ্যানের উদ্দেশ্যে। আনমনা চলতে চলতে এক সময় ক্লান্ত ঘর্মাক্ত কলেবর নিয়ে থমকে দাঁড়াই ছোট-খাটো তৃণভূমির সামনে। তবে কি এই আলিবুগিয়াল অথবা বৈদিনী বুগিয়ালের প্রবেশদ্বার? হুকুম সিং আমার সামনে সামনে চলে। কাছেই ভূজবন আর তার কাছেই গায়ে গা ঠেকিয়ে দেহের উষ্ণতা স্পর্শ করে রয়েছে রোডোডেনড্রন কাম্পিন্যুলাটাম। কাঁঠাল পাতার মতো প্রশস্ত পাতা, পাতার এক দিকটায় যেন মখমলের মতো আস্তরণ। হুকুম সিং বলে এর নাম ত্রিথাক্। এই ত্রিথাকের শেষ প্রান্ত থেকে দুটি পথ চলে গিয়েছে দু দিকে বিস্তীর্ণ তৃণভূমির দিকে। একটি তৃণভূমি বৈদিনী বুগিয়াল, অপরটি আলি বুগিয়াল। আমি বুঝতে পারি বৃক্ষসীমার প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছি। দীর্ঘদেহী বনভূমির শেষ প্রহরী ভূজ গাছ আর রোডোডেনড্রন ক্যাম্পিন্যুলাটাম। স্থানের উচ্চতা নিশ্চয়ই ১০,০০০ ফুটের ওপরে।

ভূজগাছকে (Batula Utilis) সীমান্তের প্রহরী বলা যায়। তবে প্রহরী একা থাকতে ভয় পায়, তাই সঙ্গী অপরূপা গোলাপী ফুল যুক্ত রোডেনডনড্রন

ক্যাম্পিন্যুলাটাস। ভূর্জ গাছের কাণ্ড পাতলা কাগজের মতো আবরণ দিয়ে পরতে পরতে ঢাকা থাকে। তুষারপাত, হিমশীতল প্রবাহ থেকে ভূর্জগাছ তার দেহ ও ত্বকের তাপ সংরক্ষণ করে পাতলা আবরণের পোশাক পড়ে। রোডোডেনড্রন ক্যাম্পিন্যুলাটাসের সমস্ত দেহ শীতের তুষারাতে ঢাকা অবস্থায় কচিপাতা আর ফুল ফোটার কাজ ব্যহত হতে দেখিনি। তাই বৃক্ষ সীমান্তে এই অপরূপ প্রহরী দেখা যায়।

ত্রিথাক্ এর স্বল্প পরিসর তৃণভূমিতে অজস্র অ্যাকোনাইট, অ্যাষ্টার, আর কম্পোজিটার হলদে ফুল মনকে ভরিয়ে রাখে। ত্রিথাকের শেষ চড়াইয়ের মুখে পাইন, দেওদারের বেশ কিছু গাছ দেখি। গাছের তলা দিয়ে পথ চলে গিয়েছে বৈদিনীবুগিয়ালের দিকে। বাঁদিকে মোড় ঘুরে গিয়েছে আলিবুগিয়ালের পথ। দুটি পথই আমার যেন অতি পরিচিত। তবে আলিবুগিয়ালের পথে সামান্য চড়াই ভাঙ্গতেই দেখা যায় বিশাল তৃণভূমির অনেকগুলো ছোট ছোট পাহাড়। তৃণভূমির পাদদেশে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় কুয়াশা এসে ঢেকে ফেলে চারদিক। সামান্য সময় পরই বৃষ্টি শুরু হয়। আকাশ ঢেকে যায় গাঢ় মেঘে। প্রচণ্ড বেগে শুরু হয় বৃষ্টি, বিস্তীর্ণ তৃণভূমির মধ্যে আশ্রয় নেই কোথায়ও। অসহায় অবস্থায় বৃষ্টির জলে স্নান করি সবাই। তবে পথ চলা বন্ধ করে না কেউ। প্রায় ঘন্টাখানেক চড়াই ভাঙ্গতেই বৃষ্টির বেগ কমে যেতে থাকে। আরও ঘন্টাখানেকের মধ্যে বৃষ্টি বন্ধ হয়। সামনেই তৃণভূমির এক পাশে এসে দেখি এনাফেলিসের উদ্যানে প্রবেশ করেছি।

১৯৭১ সনের আলিবুগিয়ালের স্মৃতি ভুলতে পারি না। বৃষ্টি বন্ধ হলেও চার পাশের গুমোট ভাব রয়েছে। চড়াই ভেঙ্গে চলতে চলতে মাঝে মাঝে দেখি পেছন ফিরে তাকিয়ে। ফেলে আসা পথ যেন আরো সুন্দর। বড় বড় গাছ যে ত্রিথাকে সর্বশেষে দেখেছি. সেগুলো আমাদের অনেক নীচে ছবি হয়ে রয়েছে। সেখানে রোদের খেলা···আকস্মিক মন্ত্রবলে বড় বড় গাছ ক্ষুদ্র হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে ভাবতে ভাবতে কুয়াশায় ঢাকা তৃণভূমির ঢাল বেয়ে এগিয়ে চলি। মাঝে মাঝে ঝোড়ো বাতাস হিমশীতল জলীয় বাষ্প বয়ে নিয়ে এসে আমাদের ভেজা দেহমনে শিহরণ জাগিয়ে যায়। নীচের উপত্যকা থেকে যেন গাঢ় মেঘ তাড়া খেয়ে উঠে আসে ওপরে। আবার বৃষ্টি শুরু হয়, প্রচণ্ড বৃষ্টি। তৃণভূমির ওপরের ঢাল থেকে বৃষ্টির জল যেন কল্ কল করে নেমে এসে আমাদের জুতো মোজা জামা আবার ভিজিয়ে দেয়। সবাইকে নির্দেশ দেওয়া হয়, কেউ যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে না ভেজে। এই প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যেই পথ চললে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পাবে। শরীর গরম থাকবে। দলের মধ্যে নন্দী পথ চলতে চলতে বলছিল অমরনাথ যাত্রার কথা। সেবার অমরনাথে

প্রচণ্ড বৃষ্টি আর তুষারপাতে বেশ কয়েকজন যাত্রী প্রাণ হারিয়েছিল। নন্দী সেই যাত্রীদের মধ্যে একজন। মহাগুনাস থেকে অবতরণের সময় যাত্রীরা সবাই লক্ষ্য করেছিল···কালো মেঘ এসে ঢেকে ফেলেছে চারধার। তারপর তুষারপাত শুরু হয়েছিল···তুষারপাত আর ঝোড়ো হাওয়া। যাত্রীরা ভয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পাথরের দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিল আশ্রয় ভেবে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় প্রথম পড়ে গিয়েছিল কয়েকজন বৃদ্ধা, বৃদ্ধ। চোখের সামনে হিমশীতল বাতাসে আর তুষার-পাতে ঠাণ্ডায় মৃত্যুর দৃশ্য দেখে সবাই আর্তনাদ করতে শুরু করেছিল। এর মধ্যেই অনেক যাত্রী জমে যাওয়া হাত পা নিয়ে ধুকতে ধুকতে অবতরণ করছিল। নন্দীর সঙ্গী ছিল দুজন তরুণ-তরুণী। ওরা স্বামী-স্ত্রী। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় চোখের সামনে তরুণী স্ত্রী ঢলে পড়ে প্রাণ হারিয়েছিল পাহাড়ের ঢালের মুখে। নন্দী সাংঘাতিক ভয় পেয়েছিল। অ:শ্য শক্ত সামর্থ অনেক যাত্রীরা এই মারাত্মক ঠাণ্ডায় যুদ্ধ করে পৌঁছে গিয়েছিল তাবুতে। উচ্চ হিমালয়ের পথে তুষারপাত বা বৃষ্টিতে উন্মুক্ত স্থানে দাঁড়িয়ে থাকা সাংঘাতিক বিপজ্জনক। হিমালয় ভ্রমণের বিপদও যেমন অনেক তেমনি বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে পথ চলার উপায়ও সহজ। ঘর থেকে বেরুবার সময় যেমন পথ চলার মন্ত্রে দীক্ষা নিতে হয়েছে বিপদে-আপদে, প্রাকৃতিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে সে মন্ত্র ভুলে যাওয়া চলবে না, সমস্ত বিপদ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ই তো পথযাত্রীদের সামনে পরীক্ষার মতো এসে হাজির হয়। পরীক্ষায় উত্তরণ হলেই তো ঈশ্বরের উদ্যানে প্রবেশ করা সম্ভব! সেখানে প্রবেশ করবার পর সমস্ত দুঃখ-বেদনা, ভয়, অস্বস্তি·· আনন্দে পর্যবেশিত হবে।

ধীরে ধীরে বৃষ্টির প্রকোপ কমতে থাকে। আকাশ পরিষ্কার হতে শুরু করে। উপত্যকা সুন্দর ছবির মতো হয়ে যায়। চারপাশটা আলোয় আলোয় যায় ভরে। আমরা এনাফেলিস রয়েলির বাগানের ভেতর দিয়ে যেন এগিয়ে চলেছি। প্রায় ফুটখানেকের বেশী দীর্ঘ গাছগুলো। ডালে ডালে পাতায় পাতায় অসংখ্য ফুল। বেশ বড় বড় ফুল, পার্চমেন্ট পেপারের মতো পাপড়িগুলো জলে কুয়াশায় কাবু হয়ে যায় না। চওড়া পাতাগুলোর আর গাছের গায়ে তুলোর মতো আঁশ। এই মসৃণ আঁশ হাত দিয়ে তুললে মনে হয় খুবই উন্নত ধরণের তুলো। এই তুলোর মতো আঁশ বেশ দাহ্য পদার্থ। কারণ এই আঁশ সংগ্রহ করে কুলিরা সযত্নে রাখে ঝুলির মধ্যে। পড়ে দেখেছি··একটি লোহা দিয়ে পাথরের সঙ্গে ঠুকে এই আঁশে আগুন ধরায়। যত্র তত্র পথ চলতে চলতে বিশ্রামের ফাঁকে বিড়ি ধরিয়ে নেয় এই আগুন জ্বালিয়ে। দেয়াশলাই বা আধুনিক যুগের লাইটারও ব্যবহার তারা করে না। ভাবি, বিজ্ঞানের যুগ থেকে হঠাৎ আমি চলে এসেছি কয়েক হাজার বছর পিছিয়ে।

সে যুগই যেন রামায়ণ-মহাভারতের যুগ। আমি সেই রামায়ণ-মহাভারতের দেশে চলতে চলতে পৌঁছে গিয়েছি স্বর্গের নন্দনকাননে।

এনাফেলিস কম্পোজিটি পরিবারের একটি সুন্দর জাতের ফুল। হিমালয়ের প্রায় ৬০০০ ফুট উচ্চতা থেকে শুরু করে ১৬০০০ ফুট উচ্চতায় বারোটি প্রজাতি দেখতে পাওয়া যায়। উচ্চতা বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে গাছগুলো ছোট হতে থাকে। ফুলগুলোও ছোট হয়। গাছের ডালে তুলোর মতো আঁশের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। উদ্ভিদের দেহের তাপ মাত্রা সংরক্ষণের জন্য এই অদ্ভুত প্রাকৃতিক ব্যবস্থা। প্রচণ্ড তুষার পাতে বা বৃষ্টিতে এনাফেলিসের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয় না সচরাচর। ফুল থেকে বীজ হয়। বীজের ডগায় দীর্ঘ রোঁয়া থাকে। সেগুলো বাতাসে উড়ে বেড়ায় একস্থান থেকে অন্যস্থানে। তারপর কোথাও স্যাতসেতে মাটি বা পাথরের গায়ে আশ্রয় নিয়ে অবস্থান করে শীতের তুষারপাত পর্যন্ত। গ্রীষ্মের পর বীজের অঙ্কুরোদগম হয়ে গাছ হতে থাকে। জুলাই-আগস্ট মাসে এনাফেলিসের ফুল দেখা যায় সর্বত্র। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বীজ পাকবার সময় এসে যায়।

ইতিমধ্যে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ঝোড়ো হাওয়ার প্রকোপ কমলেও কিছু আছে। সেই হিমশীতল হাওয়া অবশিষ্ট মেঘ যেন তাড়িয়ে নিয়ে ছুটে চলেছে পশ্চিম দিগন্তে। সূর্য মুখ তুলে তাকিয়েছে মেঘের ফাঁক দিয়ে। আমরা এগিয়ে চলেছি সূর্যের উষ্ণতা সারা গায়ে মেখে। বেলা প্রায় তিনটে·· চারদিকে ময়দান আর ময়দান। বিশাল গলফ্ খেলার মাঠ। মাঝে মাঝে সামান্য ঢালু অংশ। তবে যেদিকেই তাকাই, সেদিকে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি। সামান্য দূরেই ছোট বাংলোর মতো। আলিবুগিয়ালের ফরেষ্ট বাংলো। কাঠ দিয়ে বানানো। আমরা সবাই তার ভেতরে ঢুকে পড়ি। দুটো ঘর···। বেশ খানিকটা বারান্দার মতো। একটা ঘরে হুকুম সিং দলবল নিয়ে দখল করে। সেখানেই ষ্টোভ জালিয়ে গরম জল বানাতে শুরু করে। আমরা সবাই ভিজে গিয়েছি। পথ চলতে চলতে ঠাণ্ডা বোধ তেমন মনে হয়নি। ঘরে বসবার সঙ্গে সঙ্গে কাঁপুনি শুরু হয়। ইতিমধ্যে দু তিন জন বকরিওয়ালা এসে হাজির হয় ডাক্তারের খোঁজে। তাদের সঙ্গী অসুস্থ হয়ে সামান্য নীচেই ঘাসে ছাওয়া ঝুপড়ির মধ্যে আশ্রয় নিয়ে রয়েছে। স্বপন ডাক্তার মানুষ। যেতে হয় ওদের সঙ্গে। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে স্বপন দুজন বকরিওয়ালার সঙ্গে ফিরে। ডাক্তার সাহেবকে ওরা ভেট দিয়েছে প্রচুর, মোষের দুধ আর মাখন। স্বপন হেসে জানায় সবাইকে·· চায়ের পরিবর্তে সবাই একমগ দুধ পাবে। গরম দুধ, শরীর গরম হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে আকাশ পরিস্কার হয়েছে। সবাই ভিজে জামা পরিবর্তন করে বাইরে এসে দাঁড়ায়। সামনেই নন্দাঘুন্টি আর ত্রিশূল

পর্বতমালা, নীল আকাশের বুকে শ্বেত শুভ্র পর্বতশৃঙ্গগুলো অপরূপ দেখায়। হাওয়ার দাপট বন্ধ হয়ে গিয়েছে। গরম দুধ পান করে সবার ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। আমি বাইরে থেকে দাঁড়িয়ে দেখি নীল আকাশ আর সবুজ ঘাসের রাজ্য।

আলিবুগিয়ালের উচ্চতা ১২০০০ ফুটের সামান্য বেশী। ঘাসে ঢাকা বিস্তীর্ণ প্রান্তর। মাঝে মাঝে ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে এই অপরূপ তৃণভূমি। কোথাও উঁচু ঢিবির মতো, কোথাও বা ঢিবিগুলোর ধারে পাথরের খাঁজ। খাঁজের ধারে ঘাসের ডগা যেন দীর্ঘ হয়ে উপচে পড়েছে। আর সেই ঘাসে ঢাকা পাথরের খাঁজের ভেতর থেকে মাথা উঁচু করে রয়েছে কোরাইডালিসের হলদে ফুল। বেশ উজ্জ্বল চক্‌চকে হলদে ফুল। সবুজ আর হলদে রঙের অপরূপ মিশ্রণ। বারবার দেখেও যেন সাধ মেটে না। নির্জন নিস্তব্ধ ঘাসের প্রান্তরের স্নিগ্ধ প্রশান্তির মধ্যে কেমন যেন আনমনা হয়ে যাই। এই নীরব নিস্তব্ধতার মধ্যেই যেন অনুভব করি এক অদৃশ্য প্রাণপুরুষের উপস্থিতি। তাঁরই নির্দেশেই কি এত সৌন্দর্য! সবুজ ঘাস, গাঢ় সবুজ, কোথাও সোনালী রঙের মসৃন ঘাস। যেন অপরূপ গালিচা পাতা রয়েছে বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে। আর সেই গালিচার বুকে হলদে, সাদা, বেগুনী, লাল, গোলাপী-নীল রঙের অজস্র ফুলগুলো বুঝি এক বিস্ময়কর কারিগরের নিখুঁত গালিচায় বোনানো অপরূপ অলঙ্করন। ফুলগুলোর কোন গন্ধ নেই, যা দূর থেকে মনকে আকর্ষণ করতে পারে। ভাবি, নাই বা থাকুক গন্ধ, অসংখ্য ফুলের ভীড়ের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি আর ছবি তুলে রাখি মনের মণিকোঠায়। সামনেই ছোট আধভাঙ্গা ফরেষ্ট বাংলো। তার বারান্দায় আমাদের সহযাত্রীরা বসে বসে কলরব করে। সেই ফাঁকে স্বপনের কাছে আর একজন বক্‌রিওয়ালা এসে নানা অসুখের কথা বলে। সামান্য নীচেই ঝুপড়ির ধারে ওদের ভেড়া বক্‌রি থাকে। মাঝে মাঝে পশুচিকিৎসক আসে ভেড়া বকরিগুলো দেখবার জন্য। কিন্তু, নির্জন বুগিয়ালে মাসের পর মাস ধরে অবস্থানকারী বকরিওয়ালাদের দেখা-শুনা, অসুখ-বিসুখ দেখবার মতো কোন চিকিৎসক নেই। স্বপনকে পেয়ে বক্‌রিওয়ালারা যেন আশ্বস্ত হয়।

হুকুম সিংকে নিয়ে আমি বিস্তীর্ণ ঘাসের রাজ্যের মাঝখানে এগিয়ে যাই। এ অঞ্চলের পথ-ঘাট, ঘাস-পাতা হুকুম সিং-এর অতি পরিচিত। সবুজ ঘাস আর ফুলের ভেতর থেকেই খুঁজে খুঁজে বার করে দেখায় পাহাড়ী ওষুধের গাছ। হুকুম সিং জানায় এই হিমালয় জুড়ে জড়ি-বুটি ছড়িয়ে রয়েছে পাহাড়ী মানুষ এইসব গাছ গাছড়া দিয়ে রোগের সাথে লড়াই করে। গাছটি তুলে বলে, এ গাছটাকে পাহাড়ী মানুষরা বলে কটকি, কুট।

হিমালয়ের প্রায় সর্বত্রই ১১০০০ ফুট উচ্চতা থেকে শুরু করে ১৩৫০০ ফুট পর্যন্ত এই গাছ দেখতে পাওয়া যায়। ছোট ছোট গাছ…প্রায় লতিয়ে যায় মাটির বুকে। গাছের মূল সামান্য স্থুল হয়। গাছটির নাম পিক্রোজা কারু। মান্দোলী, ওয়ান, গ্রাম থেকে পাহাড়ী মানুষরা আসে এই গাছ সংগ্রহ করার জন্য। প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করে নিয়ে যায় গ্রামে। রোদে শুকিয়ে বস্তাবন্দী করে বিক্রয় করে। গাছগুলোর শুকনো পাতা জলে সেদ্ধ করে ওষুধ হিসাবে পান করে অসুস্থ মানুষরা।

পিক্রোজা কারু—স্ক্রফুলারিনা পরিবারের মূল্যবান প্রজাতি। পিক্রোজা গ্রীক শব্দ, নামটির অর্থ—'পিকুরজ্'। তিক্তস্বাদ যুক্ত, রিজার অর্থ—মূল। তিক্তস্বাদ যুক্ত যে গাছের মূল তার নাম পিক্রোজা।

পিক্রোজা কারু গাছটির—কারু শব্দটি পাঞ্জাবী ভাষা, অর্থ তিক্তস্বাদ। উদ্ভিদের নামেই জানা যায় এর পরিচয় সম্পর্কে। পিক্রোজা কারুর মধ্যে পিক্রোজিন্ নামে যবক্ষার বা আলকলয়েড রয়েছে। এই পিক্রোজিন পেটের অসুস্থতাজনিত জ্বরের পক্ষে খুবই উপকারী। দীর্ঘ জ্বরে ভোগার ফলে দুর্বলতা দেখা দিলে পিক্রোজাকারু টনিকের কাজ করে। উচ্চ হিমালয়ে এই উদ্ভিদের ভেষজজ্ঞান সম্পর্কে আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। হয়তো আরো কোন দুরারোগ্য রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা রয়েছে এই পিক্রোজাকারুর। পাহাড়ের ঢা'ল বেয়ে চলতে চলতে আর একটি মূল্যবান ভেষজগুণ সম্পন্ন উদ্ভিদের সঙ্গে পরিচয় মেলে। হুকুম সিং একটা গাছ টেনে তুলে নিয়ে আমায় দেখায়। অনেকটা পিক্রোজাকারুর মতোই। তবে ভালভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় এটি একটি নতুন প্রজাতি। হুকুম সিং বলে—এ গাছটিকে আমরা কুড় গাছ বলি। সর্দি-কাশির পক্ষে খুবই উপকারী। উদ্ভিদটি আমার খুব পরিচিত। কম্পোজিটা পরিবারের অন্তর্গত সস্যুরিয়া বর্গের এটি মূল্যবান প্রজাতি—সস্যুরিয়া লাপ্পা। হিমালয়ের প্রায় সর্বত্রই ১১০০০ ফুট উচ্চতা থেকে শুরু করে ১২০০০ ফুটের ওপর পর্যন্ত এই গাছটির দর্শন মিলবে। সস্যুরিয়া লাপ্পার মূল পাতার রস শ্বাসনালী, ফুসফুসের নানা রোগের উপশম করে। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় সস্যুরিয়া লাপ্পার মূল অরিষ্ট সর্দি, ব্রঙ্কাইটিস এবং কাশিতে উপকার হয়। আমি এই অরিষ্ট ব্রঙ্কিয়াল হাঁপানিতে ব্যবহার করে উপকার লক্ষ্য করেছি। সস্যুরিয়া লাপ্পা—কফনাশক, বিসর্প, বায়ু, কুষ্টরোগে উপকারী বলে আয়ুর্বেদশাস্ত্রে উল্লেখ আছে।

এই অঞ্চলের আর একটি উল্লেখযোগ্য ভেষজ গুণযুক্ত গাছ খাড়া পাথরের গা থেকে সংগ্রহ করে। পূজায়, শুভকাজে এই গাছ ধূপ-ধূনার মতো ব্যবহার করে। গাছটি সুগন্ধযুক্ত, এর নাম জটামাংসী। ভ্যালেরিয়ানেসি পরিবারের একটি খুবই

মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য ভেষজগুণ যুক্ত গাছ। প্রায় ১২০০০ ফুট উচ্চতা থেকে শুরু করে ১৫০০০ ফুট উচ্চতায় খাড়া পাথরের গায়ে এই গাছগুলো জন্মে। এই গাছ সংগ্রহ করা খুবই কষ্টকর। স্থানীয় অধিবাসীরা এই গাছ সংগ্রহ করে শুকিয়ে বিক্রয় করে। আয়ুর্বেদে এই গাছকে তিক্ত কষায় রস, মেধাজনক বল ও কান্তিবর্দ্ধক বলে উল্লেখ করেছে। হিষ্টিরিয়া, বুক ধড়ফড়ানি রোগে ব্যবহার করা হয়। টনিক হিসাবে এই গাছ বিশেষ উপযোগী। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় এই গাছের অরিষ্ট বানিয়ে আমি হিষ্টিরিয়ায় আশু ফলপ্রদ লব্ধ করেছি। জটামাংসীর মূলে ভোলাটায়ন তেল রয়েছে। আরো হয়তো নানা রোগের উপকারী এই গাছের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে।

চলতে চলতে হুকুম সিং-এর কথা শুনি। হুকুম সিং বলে—সাব, এই বুগিয়াল আমার ভাললাগে। ছোটবেলায় বাবা'র সঙ্গে আসতাম এই বুগিয়ালগুলোয়। ছোট ঝুপড়ি বানিয়ে বাবার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে জড়ি বুটি সংগ্রহ করতাম। তিন চার মাস থাকতুম এই ঘাসের রাজ্যে। চারদিকে সবুজ ঘাস আর রঙ বেরঙের ফুল। এর মধ্যে আমাদের ভেড়া আর বকড়িগুলো মহানন্দে চরে বেড়াতো। মাঝে মাঝে দেখতাম বড় বড় শিংযুক্ত হরিণের দল, বড় বড় পেচানো শিংযুক্ত বরালের দল। বড়াল ঠিক হরিণও নয় আবার ভেড়াও নয়। মুখটা হরিণের মতো তবে শিং দেখে মনে হবে ভেড়ার। পুরুষগুলোর মাথায় পেচালো শিং। এক একটি দলে তিরিশটি বড়াল দেখতে পাওয়া যায়। এতগুলো বড়ালের মধ্যে মাত্র তিন চারটে পুরুষ, বাদবাকীগুলো মাদী বড়াল। মাদী বড়ালগুলোকে সামনে পেছনে ও মাঝখানে পাহারা দিয়ে নিয়ে চলে। খুবই দ্রুত বেগে চলে। বুগিয়ালের আগে ত্রিথাকে মাঝে মাঝে দেখা যায় কস্তুরী মৃগের দল। সামান্য নীচে গভীর বনের মধ্যে ভাল্লুক। ছোটবেলা থেকে এই সব দেখে দেখে অভ্যাস হয়ে গেছে। বাঘ আছে কিনা জানা নেই। হিমালয়ের এমন অপরূপ স্থান, যেখানে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, ঝড়, বৃষ্টি, তুষারপাত ·· সবকিছু নিয়েই এই দুর্গম পথ বেয়ে চলতে হুকুম সিং-এর বুঝি রক্তে নেশা জমে গেছে। আলি বুগিয়ালের ঘাসের ঢাল বেয়ে কখনো উৎরাই কখনো চড়াই ভেঙ্গে এগুতে থাকি···বেশ কিছুটা। পথ নেই, যেখান থেকে খুশী পথ চলা শুরু করা যায়। শুধু ঘাসের বুকে অজস্র গোলাপী রঙের পেডিকুলারিস, সাদা এনাফেলিস, হাল্কা গোলাপী আর নীলাভো রঙের অ্যাস্টার লাল, হলদে রঙের পোটেন্টিলার ওপর দিয়ে পথ চলতে হয়। মাঝে মাঝে ডেলফিনিয়ামগুলো যেন মাথা উঁচু করে থাকতে দেখি। সামনে পাথরের গায়ে নীলাভো রঙ দেখে এগিয়ে যাই। অবাক হয়ে দেখি ··সমস্ত পাথরের

দেওয়াল বেয়ে অজস্র নীল রঙের জেনসিয়ানা মূরক্রফ্টিয়ানা। আর তারই মাঝে হালকা গোলাপী রঙের পোলাইগোনাম।

পোলাইগোনাম-পোলাইগোলাসি পরিবারের এক সুন্দর প্রজাতি। হিমালয়ে ১১০০০ ফুট উচ্চতা থেকে শুরু করে ১৬০০০ ফুট উচ্চতায় দেখতে পাওয়া যায়। পোলাইগোনামের প্রধান মূল কঠিন পাথরের ফাটলের ভেতরে প্রবেশ করে মূল বিস্তার করতে শুরু করে। বাতাস, শিশিরকণা আর প্রখর সূর্যকিরণের স্পর্শে পোলাইগোনাম-এর মূল শক্তিশালী হয়। জলকণা আর স্থানীয় তাপমাত্রায় হেরফেরে এই শক্তিশালী পোলাইখোনামের পাথর ভেঙ্গে ভেঙ্গে মূল বিস্তার করবার কাজ শুরু করে। বাইরে থেকে শিশিরকণা, তুষারকণা থেকে জল শুষে নিয়ে সূর্যের তাপের সাহায্যে ধীরে ধীরে কঠিন পাথর ফেটে ফেটে··· ভেঙ্গে গুড়ো গুড়ো হয়ে মাটিতে রূপান্তরিত হয়। আর সেই নরম গুড়ো গুড়ো মাটি পাথর অসংখ্য মূল দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখে ঝড়, বৃষ্টি, তুষারপাত থেকে ধ্বসে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করে। পোলাইগোনাম কঠিন পাথরকে নরম মাটিতে রূপান্তরিত করতে শুরু করলেই ঢালের মুখে বাসা বাধতে থাকে অসংখ্য নীল রঙের জেনসিয়ানা মূরক্রফটিয়ানা। শিশিরকণা আর কুয়াশা শুষে নিয়ে সূর্যের আলোয় সমুদ্রের মতো গাঢ় নীল হয়ে গোলাপী রঙের পোলাইগোনামগুলোকে যেন গাঢ় আলিঙ্গণে বদ্ধ রাখে আমৃত্যু। এমন এক বিস্ময়কর বন্ধুত্ব। অবাক হয়ে দেখি, মুগ্ধ হই। একেই বলে Symbiosis।

হিমালয়ের প্রায় সর্বত্রই পোলাইগোনাম্ ও জেনসিয়ানা দেখতে পাওয়া যাবে। তবে এই বন্ধুত্বের নিদর্শনের জন্য সব প্রজাতির মধ্যে নাও থাকতে পারে। হিমালয়ের নানা উচ্চতায় Symbiosis-এর অদ্ভুত নিদর্শন দেখা যাবে। একটি প্রজতি··· অপরজনকে ছেড়ে যেন বাস করতে পারে না। অথচ খাদ্য সংগ্রহে বা একে অপরের খাদ্যে ভাগ বসিয়ে বসবাস করতে হয় না। উভয়ে পাশাপাশি বসবাস করে। প্রচণ্ড শীতে, তুষারপাতে কেউ কেউ গাঢ় আলিঙ্গণের উষ্ণ স্পর্শ নিয়ে বেঁচে থাকতে চায় অনন্তকাল ধরে।

ধীরে ধীরে সূর্যের শেষ লোহিত আভা পশ্চিম আকাশ থেকে মুছে যেতে থাকে। নন্দাঘুন্টি ও ত্রিশূল পর্বতমালার শৃঙ্গগুলোয় সামান্য টকটকে লাল রঙের আভা নিঃশেষিত হতে থাকে দেখতে দেখতে। সঙ্গে সঙ্গে রাত্রির কালোছায়া এগিয়ে আসতে থাকে নিম্ন-উপত্যকা থেকে। অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে হিমশীতল প্রবাহ যেন নেমে আসে তুষারাচ্ছাদিত পর্বত-শিখরগুলো থেকে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় হাত পা অসার হতে চায়। হুকুম সিং স্মরণ করিয়ে দেয়—সাব্, আভি চলিয়ে। সর্দি লাগ যায় গা।

—হ্যা, এবার চলতে হবে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা নেমে আসছে অন্ধকার নামবার সঙ্গে সঙ্গে।

বাংলোয় ঢুকে দেখি, সবাই শোবার জন্য ব্যবস্থা করে রেখে—গল্প করতে শুরু করেছে। মগ ভর্তি চা আর চানাচুর নিয়ে সবাই যেন ভুলে গিয়েছে সবকিছু। কয়েক ঘণ্টা আগেও তারা বৃষ্টিতে ভিজে, পিছল পথ ধরে, চড়াইভেঙ্গে সারাদিনের কষ্টকর পদযাত্রার স্মৃতি বুঝি মুছে ফেলেছে মন থেকে। হাসি উচ্ছলতায় নিস্তব্ধ বাংলো মুখর হয়ে উঠেছে।

লোহাজঙ থেকে সোজা উত্তরে আলিবুগিয়াল। সোজাসুজি এই দূরত্ব তেমন কিছু নয়। স্থানীয় গ্রামবাসীরা খাড়া উৎরাই আর চড়াই অতিক্রম করে আলিবুগিয়ালে পৌঁছে যেতে পারে অতি সহজেই। তাদের কাছে এ পথ তেমন দীর্ঘ নয়, তেমন দুর্গমও নয়। গ্রাম থেকে ভেড়া-বকরি নিয়ে পথ সংক্ষিপ্ত করবার জন্য এপথ গ্রামবাসীদের খুবই পরিচিত। তারপর পৌঁছে যায় বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে। আলিবুগিয়ালের বিস্তীর্ণ তৃণভূমি আদৌ সমতল নয়। সামান্য চড়াই, সামান্য উৎরাই, যেন বিশাল ঢেউ খেলানো তৃণভূমি। এই তৃণাঞ্চলের বুকে ভেড়া-বকরি মহানন্দে চরে বেড়ায়। ঢালের মুখে অনেক স্থানেই দেখা যাবে ছোট ছোট জলধারা। তার কাছেই পাথরের পর পাথর সাজিয়ে ঘাস দিয়ে সুন্দর ঝুপড়ি দেখতে পাওয়া যাবে। ঝুপড়ির ওপরে ভুজগাছের ডাল দিয়ে মজবুত করা হয়। নীচ থেকে কাঠ নিয়ে এসে জমা করা থাকে। ঝুপড়ির মধ্যে পুরু করে ঘাস বিছানো। বৃষ্টি, তুষারপাত, ঝোড়ো হাওয়া থেকে বাঁচবার সামান্য চেষ্টা। এইসব ঝুপড়ির মধ্যে বকরিওয়ালাদের সঙ্গে রাত্রিবাস করার অভিজ্ঞতা আমার আছে। এই ঝুপড়ির মধ্যে বকরিওয়ালারা ছাতু, আলু জমা করে রাখে। এনাফেলিস গাছের গা থেকে তুলোর মতো আঁশ সঞ্চয় করে রাখে। তারপর ছোট্ট একটুকরো লোহা আর শক্ত পাথর ঠুকে আগুন জ্বালায় ঐ এনাফেলিসের সেই তুলো দিয়ে। সভ্যতার যুগে দেয়াশলাই, লাইটার না হলেও চলে। ঝুপড়িতে কাঠ জ্বালিয়ে ঘর গরম রাখার সুন্দর সুব্যবস্থা। তারপর ঐ কাঠের আগুনে ডেকচিতে জল গরম করা, চা বানিয়ে দুধ চিনির পরিবর্তে নুন আর মাখন দিয়ে চা খাওয়া এমন হিমশীতল পরিবেশে শরীর গরম করে রাখবার প্রকৃষ্ট উপায়। এইসব বকরিওয়ালারা দরিদ্র মানুষ। উচ্চ পাহাড়ী অঞ্চলে ধান অত্যন্ত মহার্ঘ, এমনকি গম ও যবও হয় না বললেই চলে। সেখানে রামদানা (অ্যামারান্থাস্) আর আলু। রামদানার বীজ পিষে নেয় পানচাক্কীতে। তারপর ঐ ছাতু ঘি দিয়ে ভেজে নুন দিয়ে জল দিয়ে ফুটিয়ে ঘন করে নেয়। এ ছাড়া আলু সেদ্ধ। এই তাদের লাঞ্চ, ডিনার। এই

দিয়েই তাদের চলে যায় তিন চার মাস। ভেড়া বকরিগুলো বড় হয়, পুষ্ট হয়, নতুন বাচ্চা হয়। শীতের আভাষ পেলেই গ্রামে ফিরে যায় অস্থায়ী আশ্রয় ছেড়ে।

এই ক্ষণস্থায়ী সংসার কিন্তু মাঝে মাঝে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয় এক বুগিয়াল থেকে আর এক বুগিয়ালে। আলিবুগিয়াল, বৈদিনী বুগিয়াল, কুরুমটোলি, বাগচো এই সব বুগিয়ালের ঘাস প্রায় একই ধরণের। ভেড়া-বকরিগুলো চরে বেড়ায় বিশাল তৃণাঞ্চলে। সবস্থানেই দেখা যাবে ঝুপড়িগুলো। শীতে তুষারপাতে ঝুপড়ির আচ্ছাদন ভেঙ্গে গেলে আবার গ্রীষ্মের শুরুতেই বকরিওয়ালারা এসে দ্রুত মেরামত করে নেয়। ঝুপড়িগুলোয় রাত্রিবাস করে দিনের পর দিন। স্থানীয় বুগিয়াল থেকে জড়ি বুটি সংগ্রহ করে। পশম দিয়ে সুতো বানায়। সুতো থেকে কম্বল, পশমের কোট, আলখাল্লা বানিয়ে নেয়। শীতের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য নানা পোশাক তৈরী হয়। এই সব বকরিওয়ালারা দুঃসাহসী। দল বেঁধে দুর্গম স্থানে এগিয়ে যায় নতুন নতুন বুগিয়াল সন্ধান করবার জন্য। ভয় নেই এদের রোগ, শোক আর মৃত্যুর। এরা সামান্যই চায়। সামান্য স্বাচ্ছন্দ্য প্রাপ্তিতেই খুশী হয়।

স্বল্প অবস্থান আলিবুগিয়ালে। তবু বারবার দেখি, মুখস্থ হয়ে যায় যেন। কাছাকাছি জলধারার গা দিয়ে ভিজে মাটিতে অনেক জায়গা জুড়ে প্রিমুলা ডেন্টিক্যুলাটার অজস্র ফুল ফুটেছিল বর্ষার আগেই। পাথরের ধারে ধারে আড়ালে কিছু কিছু গাছ দেখি শুকিয়ে রয়েছে। হালকা বেগুনী, অথবা গাঢ় বেগুনী রঙের ফুল, এপ্রিলের শেষের দিকেই নরম মাটির বুকের ওপর ফুটতে শুরু করে। মে মাসের শেষ অবধি ফুল ফুটে নিঃশেষিত হয়। এই সময়ের মধ্যেই নিম্ন-উপত্যকায় রোডোডেনড্রন আরবেরিয়ামের টকটকে লাল ফুল, ছিথাকে রোডোডেনড্রন ক্যাম্পিনুলাটায়·· হালকা গোলাপীফুল, আর আলিবুগিয়ালের উচ্চ ঢালের মুখে রোডোডেনড্রন অ্যাম্বোপোগন·· হালকা হলদে রঙের ছোট ছোট ফুল। ফুল ঝরে গিয়ে বীজ হয়েছে। ভাবি, এপ্রিল-মে মাসে যদি এই পথে আসবার সুযোগ হোত, দেখতে পেতাম দুচোখ ভরে। বসন্ত আসুক আর না আসুক, ফুলতো ফুটবেই। প্রজাপতির দল আসতো রঙিন পাখা মেলে ঝাঁকে ঝাঁকে। বসন্তের পাখীগুলো সময় ভুলে ছুটে আসতো গ্রীষ্মের সূর্যতাপ উপভোগ করবার জন্য। আলিবুগিয়ালের বিস্তীর্ণ তৃণভূমির নির্জনতা ভাঙ্গতো। আলিবুগিয়াল আমার ভাল লাগে। ভোর হতেই তো বিদায় নেবার সময় এসে যায়। তাই খুব ভোরে সূর্য উঠবার আগেই বিছানার উষ্ণ আশ্রয় ত্যাগ করি। চটপট বিছানাগুটিয়ে রুকস্যাকে পুরে নিয়ে বেঁধে ফেলি সব কিছু। তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ি বাংলো থেকে। শিশিরভেজা ঘাস, শিশিরগুলো ঠাণ্ডায় জমে সাদা সাদা গুঁড়োর মতো হয়ে রয়েছে।

তার ওপর দিয়ে চটিজুতো পায়ে এগিয়ে যাই সেই টিলার মতো যায়গাটায়। সেখান থেকে তাকিয়ে দেখি—নন্দাঘুন্টি আর ত্রিশূল পর্বতমালার সবে ঘুম ভেঙ্গেছে। সূর্য উঠেনি···কিন্তু সূর্যের সোনালী আভা পড়েছে তুষারধবল শৃঙ্গগুলোর গায়ে। সেই আভা লাল হতে থাকে দেখতে দেখতে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, পা দুটো কন্‌কন্‌ করে। পূর্বদিকের লাল আভার প্রতিফলন দেখি। নিম্ন উপত্যকায় ধবধবে সাদা কুয়াশা, সেই কুয়াশার বুকে লাল রঙের ছোপ। কতগুলো অচেনা পাখী এগিয়ে আসে আমার কাছে। ওরা আমাকে দেখে ভয় পায় না। বড় বড় দাঁড়কাক দাঁড়িয়ে রয়েছে সামান্য দূরত্ব বজায় রেখে। এরাই হয়তো গতকাল বিকেলে এসেছিল বাংলোর সামনে। আমাদের কাছ থেকে খাবার পেয়ে চিনে রেখেছে। তাই হয়তো আবার এসেছে কাছাকাছি। আমরা তো দুদিনের জন্য আগন্তুক ; জানি না, ওরা কোথা থেকে আসে, কোথায় ওদের বাসা ? এই হিমশীতল দেশে বিশাল তৃণভূমির মাঝখানে কুচকুচে কালো ঠিক কাকের মতোই দেখতে, তবে ঠোঁট লাল, এক ধরনের পাখী দূরে দূরে নেচে বেড়ায় আর শব্দ করে ডাকে। সূর্য উঠবার আগেই এই পাখীগুলোর ঘুম ভাঙ্গে। ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে যায় হাল্কা পা ফেলে ফেলে। মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়ায়, ঘাসের গোড়া খুঁটে খুঁটে কি যেন বার করে খেয়ে ফেলে।

সূর্য ওঠে। তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গগুলো যেন সোনার জলে স্নান সমাপ্ত করে নেয়। আলিবুগিয়ালের ঘুম ভেঙ্গেছে। বাংলোয় হয়তো সবাই বিছানা ছেড়ে বসে বসে গরম চা পান করছে। এবার আমাকে বিদায় নিতে হবে। ভাবতে ভাবতে ফিরে যাই বাংলোর কাছেই। চারদিক নীরব নিস্তব্ধ। শুধু পাখীগুলোর গান মাঝে মাঝে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে। হিমশীতল বাতাসের সঙ্গে গাঢ় কুয়াশা এগিয়ে আসে নিম্ন-উপত্যকা থেকে। ধীরে ধীরে গ্রাস করে আলিবুগিয়ালকে। কিন্তু সূর্যের আলো তৃণভূমির ওপরে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই কুয়াশা যেন কি অদৃশ্য নির্দেশে মিলিয়ে যায়। নীল আকাশে রক্তিম আভা। সেই রঙের স্পর্শ আকাশের বুক থেকে নেমে যায় নিম্ন উপত্যকায়। নন্দাঘুন্টির ঘুম ভেঙ্গেছে, ত্রিশূল যেন উঠে দাঁড়িয়েছে সূর্যালোকে। আলিবুগিয়াল মুখর হয়ে ওঠে।

বৈদিনী বুগিয়াল আর আলিবুগিয়াল দুটো পৃথক তৃণভূমি। বৈদিনী বুগিয়াল আমাকে বারবার যেন ডাকে। তাই আসতে হয় অদৃশ্য ইঙ্গিতে। বাস থেকে নেমেই দেখি গোয়ালদায় যথার্থই সুদৃশ্য হিল ষ্টেশন হতে চলেছে। আলো ঝলমলে ছোট্ট পার্বত্য শহর। দোকান-পাট, ছোট ছোট হোটেল। ব্যস্ততায় ভরা

গোয়ালদামের সুদৃশ্য টুরিষ্ট লজে গালিচা-পাতা ঘরে মালপত্র রেখে নরম বিছানায় বসে পড়ি। অদ্ভুত আনন্দ আমার দেহমনে। ১৯৬০ সনে আমিই তো এই স্বপ্ন দেখেছিলাম নির্জন নিঃসঙ্গ পাইনগাছের তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তেইশ বছর পর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে। সেই প্রথম দেখা গোয়ালদামের নির্জন নিঃসঙ্গ স্থানটি আর খুঁজে পাই না। দোকান পাট আর ঘর বাড়ীর ভীড়ে সেই পাইন গাছটা হারিয়ে গেছে। একটি ফরেষ্ট ডাকবাংলো, আর ছোট্ট দুটি অস্থায়ী চায়ের দোকান। গোয়ালদামে রাত্রিবাস করবার মতো আশ্রয় ছিল না ডাকবাংলো ছাড়া। ১৯৭১ সনে এগারো বছরে দেখেছি পরিবর্তনের স্পর্শ। আরো বারো বছরে গোয়ালদাম ছিল ষ্টেশন।

গোয়ালদামে টুরিষ্টদের ভীড় দেখি। বাঙ্গালীর সংখ্যাই বেশী। নানা বয়সের যাত্রী, সবাই রূপকুণ্ড থেকে ঘুরে এসেছেন। একদল যাবার জন্য তোড়জোড় করছেন। গোয়ালদাম থেকেই যাত্রাপথের রসদ চাল, ডাল, মাল মসলা নিয়ে যাওয়া চলে। শাক, শব্জী, ডিম, এমনকি টাটকা ট্রাউট মাছ সবই মিলবে।

ট্যুরিষ্ট বাংলোর প্রাঙ্গণে ফুলগাছের চাষ হয়েছে। ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, আর নানা জাতের লিলি, বড় বড় রঙ বেরঙের কস্‌মস। প্রজাপতি উড়ে বেড়ায় চার পাশে। ট্যুরিষ্ট বাংলোর দেয়াল ভর্তি দেখি অজস্র মথ, নানা জাতের মথ, আমি এমন অপরূপ আর দেখিনি। দিনেরবেলা বলে দেয়ালের গায়ে ভর্তি হয়ে রয়েছে। বাংলোর দোতলার বারান্দা থেকে দেখা যায় উত্তরে নন্দাঘুন্টি আর ত্রিশূল পর্বতমালার পর্বত শৃঙ্গ। সবুজ গাছ পালায় ঢাকা দীর্ঘ গিরি শিরার ওপরে উচ্চ গিরিশিরা। সেই গিরিশিরার শীর্ষে তুষারাবৃত পর্বত শৃঙ্গগুলি। ট্যুরিষ্ট বাংলোর বারান্দায় চেয়ার টেনে বসে বসে সারাদিন কাটানো যায় রৌদ্র সেবন করতে করতে। কোথাও না গেলেও গোয়ালদামে দিনকয়েক অবস্থান করা যায় স্বচ্ছন্দে। গোয়ালদাম থেকে সকালবেলায় বাস যায় থারালী, কর্ণপ্রয়াগ। কোন কোন বাস যায় বাগেশ্বর হয়ে ভারালী, মুন্সিয়ারী, পিথারোগড়। তবে দুঃখের বিষয়, কাঠগোদাম থেকে গোয়ালদামের বাস সংখ্যা খুবই সীমিত।

গোয়ালদাম থেকে বাস রাস্তা এগিয়ে গেছে মান্দোলী পর্যন্ত। বাস অবশ্য চলাচল করছে দেবল অবধি। দেবল থেকে মান্দোলীর বাস ১৯৮৫ সন থেকে চালু হবে হয়তো। দেবল থেকে পদযাত্রীরা সোজা যায় লোহাজঙ। সেখানে সুদৃশ্য ট্যুরিষ্ট বাংলো রাত্রিবাস করবার জন্য সুন্দর ব্যবস্থা। ১৯৬০ সনের লোহাজঙ ১৯৮৩ সনে ভোল বদলে গিয়েছে। ট্যুরিষ্ট বাংলোর প্রাঙ্গণে এসে ভাল যেমন লাগে, তেমন দুঃখও হয়। লোহাজঙের অপ্রশস্ত বুগিয়ালের বুকে অজস্র

জিরানিয়াম, পোটেন্টিলা, জিউম ফুটে আলো করে থাকতো। সে সৌন্দর্য মুছে যাবার উপক্রম। পথের কষ্ট লাঘব হয়েছে কিন্তু পথযাত্রীদের অত্যাচার গিয়েছে বেড়ে। পথের সৌন্দর্য পিপাসু সেকালের পথ ভোলা পথিক আর কোথায়? এ যুগের পদযাত্রীরা কত দ্রুত পথকে শেষ করতে চায় তারই প্রতিযোগিতা চালায়। যেন দম দেওয়া কলের মানুষ, ছুটছে দুর্বার বেগে। দম ফুরিয়ে গেলে আবার থেমে নিয়ে দম দিয়ে নেয়। লোহাজঙ থেকে ওয়ান কেউ বলে বারো কিলোমিটার পথ, কেউ বলে আরো বেশী। পথের কোন পরিবর্তন হয়নি। ওয়ান গ্রাম বৰ্দ্ধিষ্ণু হয়েছে। গ্রামের ওপরে ডাকবাংলোর পুরানো হয়ে গিয়েছে। তারই প্রাঙ্গণের কাছেই টুরিষ্ট বাংলো। গোয়ালদাম, লোহাজঙের ট্যুরিষ্টবাংলোর মতোই। অন্যান্য পদযাত্রীদের মতো এবার আমাকেও একদিন অবস্থান করতে হয়। লোহাজঙ থেকে ওয়ান পর্যন্ত সমস্ত পথের অজস্র অ্যানিমন জিরানিয়াম, অ্যাস্টার, পেডিকুলারিস কোথাও? রোডোডেনড্রন আরবেরিয়ামের অজস্র গাছ কেটে ফেলে রেখেছে স্থানীয় অধিবাসীরা। দশবছর পরে রোডোডেনড্রেনের টকটকে লাল ফুল কি হারিয়ে যাবে? ওয়ান গ্রামের ওপরের সেই পুরানো জলধারা শুষ্ক প্রায়। সেই জলধারার দু'ধারে অজস্র ইলিয়াম দেখেছিলাম। খুঁজে মাত্র তিন চারটে ফুল আবিষ্কার করতে পারলাম। টুরিস্ট বাংলোর সামনে অজস্র কসমস্ ফুল ফুটে রয়েছে। অজস্র প্রজাপতি। ভাবি, এ ছবি তুলতে পারলে কি অপূর্বই না হবে। প্রজাপতিরা খুবই চতুর। ক্যামেরা নিয়ে বসে বসে হয়রান, ফুলের ওপরে বসতে চায় না কেউই। এত ছোট ছোট চোখ দিয়ে বুঝি চিনতে পারে সহরের মানুষ-গুলোকে। কখনও ক্ষণিকের জন্য বসলেও পাখা গুটিয়ে বসে থাকে। এমন সুদৃশ্য বিচিত্র রঙে রঞ্জিত পাখা, আড়াল করে রাখতে চায় রঙের বাহার। পেছনে পেছনে সারাদিন কেটে যায় প্রজাপতির ছবি তুলবার আশায়। ফুল গাছ নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে আমাদের মতো মানুষদের অত্যাচারে। তাই মর্মাহত, বেদনায় ক্ষুব্ধ হয়ে আমাদের দেখেই দূরে সরে যায় প্রজাপতিগুলো। পাখার রঙিন চিত্র আড়াল করে রাখে ক্রুদ্ধ হয়ে। প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য হারাতে শুরু হয়েছে, তাই কীট পতঙ্গ বিদ্রোহী হতে চলেছে যেন। ওয়ানের ট্যুরিষ্ট বাংলোয় আরো দু'তিনটি দল এসেছে। সবাই হিসাব করছে, কত দ্রুত রূপকুণ্ডে যেয়ে ফিরে আসা যায়। তারই অঙ্ক কষতে শুরু করেছে ঘরে বসে। অবাক হই, সবাই তরুণ, সবারই তরুণ মন। ১৯৬০ সনে আমিও তো তরুণ ছিলাম। পদযাত্রা সংক্ষিপ্ত করবার গোজামিল যেন ভাবতে পারি নি। তাই দু চোখ ভরে দেখতে দেখতে এগিয়ে গিয়েছি। দীর্ঘ দেহী বৃক্ষের বনাঞ্চল, বিস্তীর্ণ তৃণভূমি, বিচিত্রবর্ণের ফুলের মেলা, পাখী কীট

পতঙ্গ, সব কিছুই যেন মানস পটে এঁকে রাখতে চাই। পাথরের ধারে ঝরণার পাশে থমকে দাঁড়িয়ে থাকি। খাড়া পাহাড়ের ঢাল বেয়ে রূপোলী ফিতের মতো নেমে আসা ঝরণার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভুলে যাই সব কিছু। এ সবইতো আমার পথ চলার সঙ্গী। আমার পদযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে এরাও যেন এগিয়ে চলে পথ দেখাতে দেখাতে। কি অপরূপ সাজসজ্জা! এই বিচিত্র সাজ-সজ্জা নিয়েই তো বিশাল হিমালয়! এত বিচিত্র! এত বিশাল! তাই তো বারবার আসি দেখতে!

সারাদিন ঘুরে ফিরে দেখি ওয়ান গ্রামটাকে। গ্রামের ওপরে ডাকবাংলো। আর ডাকবাংলোর পাশেই সামান্য নীচে উত্তর প্রদেশের সরকার ট্যুরিষ্ট বাংলো বানিয়েছে। বিলাসপূর্ণ কক্ষ, বাথরুম, ডাইনিং স্পেস। হয়তো বিদেশী যাত্রীদের আসবার কথা ভেবেই এই বাংলো বানানো হয়েছে। বারান্দার সামনে বাগান। কস্‌মস্‌, ডালিয়া আর চন্দ্রমল্লিকা। বাংলো দেখাশুনা করার জন্য লোক রয়েছে। হিমালয়ের বুকে লাগানো হয়েছে শৌখীন ফুল গাছগুলো। ঐ স্থান জুড়ে ছিল অ্যানিমনের অনেকগুলো গাছ। অজস্র ফুল ফুটে থাকতো। ফুলের ওপরে বসে থাকতো বিচিত্রবর্ণের প্রজাপতি। বসে বসে দেখতাম···আমাকে যেন দেখতো। আমার সঙ্গে পরিচয় যেন ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। অ্যানিমন গাছগুলো না থাকলেও কস্‌মস্‌, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা ফুলগুলোর ওপরে দেখি প্রজাপতির দল। এরা অস্থির, চঞ্চল হয়ে ছুটে বেড়ায়। হয়তো শৌখীন ফুলগুলোর সঙ্গে নতুন করে পরিচয় করতে হচ্ছে। ১৯৭১ সনে ডাকবাংলোর সামনে বসে বসে ভাবতুম, অ্যানিমনের ফুলগুলোয় বসে থাকা বিচিত্র প্রজাপতির ছবি তোলা যেতো ক্যামেরা থাকলে। এবার ক্যামেরা নিয়ে তৈরী হয়ে বসে বসে অপেক্ষা করি। প্রজাপতিগুলো যেন বুঝতে পারে আমার মতলব। ফুলগুলোর ওপরে বসতে চায় না কিছুতেই। উড়ে বেড়ায় দূর দিয়ে দিয়ে। ফুলের ওপরে বসলেও পাখাদুটো গুটিয়ে রাখে। পাখাদুটোর ভেতরে যে অপরূপ রূপসম্ভার, তা আড়াল করে লুকিয়ে রাখতে চায় আমার সামনে। কখনো বা আমাকে দেখে ঘুরে পেছন ফিরে থাকে। কি আশ্চর্য! কি অদ্ভুত রসিকতায় আমাকে বোকা বানিয়ে দেয়!

ওয়ান গ্রামের ওপারেই পাইন আর দেওদার গাছের গভীর বন। এই বনভূমির ভেতরে লুকিয়ে থাকা দীর্ঘ গিরিশিরা। এই গিরিশিরার নাম শুনেছিলাম লাললিঙরা। এই গিরিশিরার ওপরে পেঁছবার জন্য ১৯৬০ সনে সে কি মারাত্মক

প্রচেষ্টা! পথের চিহ্নমাত্র নেই। গভীর বনের ভেতর দিয়ে এলোমেলো পথ বানিয়ে এগিয়ে গিয়েছি। পাইন-দেওদার গাছের তলায় আগাছা নেই বললেই চলে। তাই গাছের তলা পরিষ্কার দেখা যায় দূর থেকেই। তবে আকাশ দেখতে পাইনি। শুধু খাড়া চড়াই ভেঙ্গে গাছের ডাল ধরে নানা কায়দা করে এগিয়ে গিয়েছি। উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘদেহী বৃক্ষের ভীড় কমতে থাকে। মাঝে মাঝে দেখা গেছে ঝোপ-ঝাড়। সাপ-খোপ থাকলেও ভাববার সময় পাইনি। পাইন আর দেওদার গাছগুলোর এক অদ্ভুত গন্ধ শুঁকে শুঁকে লাললিঙরার গিরিশিরার মাথার ওপরে পেঁাছে গিয়েছিলাম। বনভূমি অদৃশ্য, বিস্তীর্ণ তৃণভূমি সামনে। সেই তৃণ-ভূমির ঢাল বেয়ে পেঁাছে গিয়েছিলাম ব্রহ্মতাল। আকাশে মেঘ জমেছিল। বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। প্রচণ্ড বৃষ্টি, চারদিক ঢেকে গিয়েছিল মেঘে। বৃষ্টির জল তৃণভূমির ঢাল বেয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। সম্পূর্ণ ভিজে গিয়েছিলাম সেদিন। ভোর ছ'টায় ওয়ান গ্রাম ছেড়েছিলাম। ব্রহ্মতালের তীরে পৌঁছেছিলাম বেলা দুটোর সময়। আমাদের মালবাহক ওয়ান গ্রাম থেকে সোজা গোয়ালদাম গিয়ে অপেক্ষা করার কথা। আর আমরা ব্রহ্মতাল, বেগুনতাল দেখে ঢালু পথে নন্দকেশরী হয়ে গোয়ালদামে গিয়ে পৌঁছব। ভিজে জামা-জুতো নিয়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ক্লান্ত হয়ে বেল চারটায় পৌঁছে গিয়েছিলাম বেগুনতাল। সঙ্গী গাইড বলেছিল···গোয়ালদাম যাওয়া সম্ভব নয়।—তবে উপায়! বেগুনতাল থেকে উৎরাই পেরিয়ে বেলা পাঁচটায় পৌঁছে গিয়েছিলাম খপলুতাল। ব্রহ্মতাল···কিছুটা দীর্ঘাকার হ্রদ। বেগুনতালের চারধারটায় পাইন, ফার আর দেওদার গাছ। হ্রদের তীরে ছোট সর্প দেবতার মন্দিরের মতো। খপলুতাল ছোট হ্রদ। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর··· মানসিক উৎকণ্ঠা নিয়ে সব হ্রদগুলোর সৌন্দর্য বিচার করা হয়নি সেদিন। খপলুতাল ছেড়ে আমরা পৌঁছেছিলাম বেগম গ্রামে। হাত পা টলছিল। গ্রামে আশ্রয় পেয়েছিলাম সেদিন। দরিদ্র পাহাড়ী মানুষরা আমাদের অবস্থা দেখে সাদরে ঘরে তুলে নিয়েছিল। ভিজে পোশাক-পরিচ্ছদ খুলে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলাম আগুনের ধারে। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কখন যেন। গৃহস্বামীর স্ত্রী ভাত, ডাল, আলুর তরকারী খাইয়েছিল। সমস্ত পোশাক শুকিয়ে দিয়েছিল আগুনের সামনে। খুব ভোরে বিদায় নেবার সময় টাকা দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু নেয়নি কিছুতেই। বেগম গ্রাম থেকে পায়ে হেঁটে বত্রিশ মাইল পেরিয়ে সন্ধ্যায় পৌঁছে গিয়েছিলাম। গোয়ালদামের পর ডাঙ্গোলী গ্রামে। সেখানে আমাদের বিছানাপত্র নিয়ে অপেক্ষা করছিল মালবাহক।

ওয়ান গ্রাম থেকে ব্রহ্মতালের দূরত্ব ষোল কিলোমিটার। নতুন পথ তৈরী হতে চলছে। শুনেছি মান্দোলী থেকে বেগুনতাল পর্যন্ত পথ তৈরী হতে চলেছে। জানতে পারলাম, বেগুনতালে ট্যুরিষ্ট বাংলো তৈরী হবে। বাস রাস্তা মান্দোলী পর্যন্ত তৈরী হয়েছে। শুনেছি, মান্দোলী থেকে লোহাজঙ পর্যন্ত পথও বানানো হবে। দু-এক বছরের মধ্যেই বাস চলবে গোয়ালদাম থেকে লোহাজঙ পর্যন্ত। ১৯৬০ সনে লোহাজঙে দর্জির দোকানে বসে দর্জির গৃহিণী দুর্গার কাছে গল্পচ্ছলে বলে ছিলাম বাস চলাচলের কথা। ১৯৬০ সনের পর ১৯৮৩ সন, দীর্ঘ তেইশ বছর পরে আমার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে চলেছে। পাইন, দেওদার, ফার গাছে ঢাকা গভীর বনভূমির দিকে তাকাই ওয়ানের ট্যুরিষ্ট বাংলোর সামনে বসে বসে। পুরনো স্বপ্নের ছবি বাস্তবায়িত হয়েছে, এবার নতুন স্বপ্নের কথা ভাবি। জানিনা, ক'বছর পরে বাস পথ এসে যাবে ট্যুরিষ্ট বাংলোর সামনে। ১৯৬০ সনের পরিচিত দেওদার, পাইন, ফার গাছের গভীর বন আমার পরম আত্মীয় হয়ে রয়েছে। সামনের ফিউনারাল সাইপ্রেস গাছ ক'টা সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত দেখি। পড়ন্ত সূর্যালোকে স্মৃতিচারণ করি। এইসব সূচাগ্র পত্রবিশিষ্ট দীর্ঘদেহী বৃক্ষ আমার কাছে বিস্ময়কর মনে হয়। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা এই জাতীয় গাছগুলোর চরিত্রগত ও আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে নামকরণ করেছেন কণিফার (CONIFERS) বা কার্ণফেরাস্। কণিফারিয়া গোত্রের সর্বসাকুল্যে পাঁচশ প্রজাতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে পৃথিবীর বনাঞ্চলে। গ্রীষ্মপ্রধান ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে এই উদ্ভিদের দর্শন পাওয়া দুর্লভ। মোটামুটি শীতপ্রধান অঞ্চলের শুরুতেইদেখা যাবে এই দীর্ঘদেহী বৃক্ষের বনাঞ্চল। এই সূচাগ্র পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষের দেহত্বকে তৈলরস থাকে। অনেক গাছের পাতাতেও প্রচুর তৈলরস থাকে। তৈলরস আবার গন্ধযুক্ত।

আজ থেকে প্রায় তেইশ কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম সরলবর্গীয় চিরহরিৎ কণিফেরাস্ বৃক্ষের বনাঞ্চল প্রাধান্য লাভ করেছিল। এই বৃক্ষগুলো অপুষ্পক। বৃক্ষের বংশ বৃদ্ধি হয় অদ্ভুত ভাবে। বৃক্ষের সূচাগ্রপত্র পরিবর্তিত হয়ে কোণ্ বা CONE এ পরিণত হয়। এই কোণ্ পুষ্ট হয়ে পুরুষগুণ সম্পন্ন বা স্ত্রীগুণ সম্পন্ন হয়ে থাকে। পুরুষ কোণ্গুলো পুষ্ট হলে কোণের মধ্যে পরাগের সঞ্চার হয়। আর স্ত্রী কোণ্গুলোয় সৃষ্টি হয় ম্যাক্রোস্পোরস্ বা বড় বড় স্পোরস্। পরে বাতাসে পুরুষ কোণ্ থেকে পরাগগুলো উড়ে গিয়ে স্ত্রী কোন্ এর স্পোরস-এ নিষিক্ত হয়। তারপর স্ত্রী কোণগুলো আরো পুষ্ট হয়ে শুষ্ক হয়ে ঝড়ে পড়ে মাটির বুকে। সেই মাটির বুকেই নতুন গাছ জন্মলাভ করে। কণিফেরাসের কোণ্গুলো পথ চলতে

চলতেই পথচারীরা দেখেন এবং উৎসাহী পথচারীরা সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন। অনেকেরই ধারণা এগুলো পাইন, দেওদার আর চীর গাছের শুকনো ফল। এই সব শুকনো যল থেকেই গাছের জন্ম হয়। আসলে এই ফলগুলোই কোণ্। পাইন, ফার, দেওদার, চীর গাছের কোণ্‌গুলো নানা আকৃতি বিশিষ্ট। কোনটি বেশ বড় বড়, আবার কোনটি বা ছোট ছোট। তবে গঠন প্রকৃতি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, গাছের ডগার পাতাগুলোই পরিবর্তিত এবং পুষ্ট হয়ে কোণ্-এ রূপান্তরিত হয়েছে। কণিফেরাস গোত্রের অনেকগুলো প্রজাতির মধ্যে···পরিচিত প্রজাতি হল পোডোকার্পস্, ইউ, সিকিউওয়াইয়াস্, রেডউড্, পাইনাস, ফার, সাইপ্রেস, দেওদার, স্প্রুস ও জুনিপার হিমালয় অঞ্চলে ৪০০০ ফুট উচ্চতা পেরুলেই সাক্ষাৎ মিলবে কণিফেরাসের অতি মূল্যবান প্রজাতিগুলো। হিমালয়ে পাইনাস বা পাইনজাতীয় দীর্ঘদেহী চিরহরিৎ গাছের বনভূমি। পাইনাসের দুটি নিকট আত্মীয় পাইন আর ফার গাছ। এছাড়া দেওদার, সাইপ্রেস·· এই সব গাছের বনভূমি ৪০০০ ফুট থেকে ১১০০০ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যাবে। এইসব গাছগুলোর ক্ষমতা অপ্রতিহত। গাছের ত্বকে খুবই বেশী পরিমাণ তৈলরস থাকায় সমস্ত বনাঞ্চল জুড়ে আধিপত্য বিস্তার করে। এইসব অপুষ্পক বৃক্ষের যথার্থ জন্মস্থান কোথায় জানা যায় না। তবে প্যালেজোইক্ যুগের শেষটায় ফার্নজাতীয় গাছের পরই সরলবর্গীয় চিরহরিৎ কণিফার জাতীয় বনাঞ্চলের সৃষ্টি হয়। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মেসোজোইক যুগের সময় থেকে অর্থাৎ বাইশ কোটি বৎসর থেকে ষোল্ কোটি বৎসরের মধ্যে তৃণজাতীয় উদ্ভিদ জন্ম লাভ করে। তারপর আসে সপুষ্পক উদ্ভিদ। কণিফেরাস অতি শক্তিশালী উদ্ভিদ। দেহত্বকপত্রে যথেষ্ট তৈলরস থাকায় ঝরে পড়া পাতাগুলো মাটির বুকে মিশে মাটির অম্লত্ব বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। অম্লত্বের আধিক্যের জন্য মৃত্তিকায় অন্য কোন উদ্ভিদ জন্মলাভ করতে পারে না বা জন্মলাভ করলেও সহজে বসবাস করতে পারে না। এই অপুষ্পক উদ্ভিদের বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল একদা আক্রান্ত হয়েছিল উন্নত ধরণের সপুষ্পক বৃক্ষরাশির দ্বারা। এই যুদ্ধ কতকাল স্থায়ী হয়েছিল জানা নেই। তবে জয়লাভ করে অপুষ্পক উদ্ভিদ প্রাধান্য বিস্তার লাভ করতে শুরু করেছিল। তারপর বিরল হতে শুরু হয়েছিল অপুষ্পক বৃক্ষগুলি।

কণিফার বৃক্ষের অনেক প্রজাতি যেমন হিমালয়ের বিভিন্ন উচ্চতায় বসবাস 'করছে, তেমনি হিমালয়ের বাইরে আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে কণিফার বসবাস করছে সুদূর অতীত থেকে। ক্যালিফোর্ণিয়ার রেডউড্-এর গভীর বনাঞ্চল আজও বিখ্যাত। কণিফার গোত্রের রেডউডই পৃথিবীর সবচাইতে দীর্ঘ ও বিশাল

বৃক্ষ। এর মধ্যে কোন কোন গাছের গুড়ির ব্যাস নয় মিটারের চাইতেও বেশী—আশি মিটার দীর্ঘ। ৪০০০ বৎসর পূর্বের রেডউড গাছ আজও জীবিত রয়েছে কালিফোর্ণিয়ায়। দেওদার কণিফার গোত্রের মধ্যে মূল্যবান বৃক্ষ। গাছের পাতায়, গাছের ছালে সুগন্ধি তৈলরস থাকে। কাঠেও সুগন্ধি তেল থাকায় পোকার আক্রমণ হয় না কখনো। বিশেষজাতীয় দেওদার লেবাননের অতীতযুগের বৃক্ষ। শোনা যায়, খ্রীষ্ট-জন্মের ২০০০ বৎসর পূর্বে রাজা সলোমনের রাজত্বকালে এই দেওদার গাছগুলো নাকি নির্বিচারে কেটে কাঠ তৈরী করে জেরুজালেমের মন্দির নির্মাণ করা হত। কাঠ সুগন্ধযুক্ত, তাই আসবাবপত্র এবং বাক্স বানানো হত। লেবাননের সেই বিখ্যাত বৃক্ষের বন প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে। দেওদারের এক বিশেষ ধরনের প্রজাতি থুজা অক্সিডেন্টালিস্ ও থুজা প্লিকাটা। থুজা অক্সিডেন্টালিস দীর্ঘদেহ বৃক্ষ। গাছের পাতার রস ভেষজগুণযুক্ত। দেওদারজাতীয় গাছ উচ্চ হিমালয়ে দেখতে পাওয়া যাবে সর্বত্র। এই গাছগুলোর অন্যতম বর্গ সিডার (CEDAR)। কণিফার গোত্রের অপর বিখ্যাত গাছ সাইপ্রেস। সাইপ্রেসের পনেরোটি প্রজাতি দেখতে পাওয়া যায়। হিমালয়ে ফিউনারাল সাইপ্রেস একটি বিখ্যাত প্রজাতি। ফার গাছের চল্লিশটি প্রজাতি ছড়িয়ে রয়েছে কণিফারের বিস্তীর্ণ বনভূমির মধ্যে। কণিফার গোত্রের অনেক গাছের কাঠই বেশ শক্ত। সেগুলো দিয়ে ঘরবাড়ী, আসবাবপত্র বানানোর কার্যে ব্যবহৃত হয়। নরম কাঠযুক্ত কণিফার দিয়ে কাগজের মণ্ড পা ানো হয়।

ওয়ান গ্রামের সীমানা পেরুতেই শেষ কটি বাড়ির কাছাকাছি দেওদার, ফার, পাইনের অতি পুরনো গাছ কটি দেখি। গাছগুলোয় যেন বার্ধক্য এসে স্পর্শ করেছে। গাছগুলোর পাতা কমে গিয়েছে। ১৯৬০ এবং ১৯৭১ সনেও এদের দেখেছি। গাছগুলোর পরিবর্তন ঘটেনি। রনকধারের স্বল্প পরিসর বুগিয়াল পেরিয়ে অতি পরিচিত পথ বেয়ে নেমে যাই নীলধারার কাছে। কাঠের সেতু পেরিয়ে যাই। ইমপেসেনস্ এর অজস্র ফুল দেখতে দেখতে কখন যেন পৌছে যাই চড়াই-এর মুখে। চড়াই আর শুধু চড়াই। সমস্ত চড়াই পথ জুড়ে পাইন, দেওদার আর ফার গাছের গভীর বন। কণিফারের এমন সমৃদ্ধ বন খুবই কম দেখতে পাওয়া যায়। এই বনভূমির মধ্যেই নিশ্চিন্তে চরে বেড়ায় কস্তুরীমৃগ আর হিমালয়ের বিশালকায় কালো ভাল্লুক। এদের দর্শন পাওয়া খুবই ভাগ্যের ব্যাপার। কুমায়ুন ও গাড়োয়ালে ভাল্লুক অবশ্য আমি দেখেছি। খুব কাছে থেকেই দেখেছি। ওরা আমাদের যেন

সমীহ করে। এগিয়ে এসে ভয় দেখাতে চায় না। অন্ততঃ আক্রমণ করার অভিনয়ও করে না। পাহাড়ী মানুষদের ভাল্লুক এসে আক্রমণ করেছে এমন গল্প শুনিনি। গভীর জঙ্গলের তলদেশ ঝকঝকে পরিষ্কার, মাঝে মাঝে মুনিয়া পাখীর দল আমাদের শব্দে পালিয়ে যায়। প্রজাপতি দেখি মাঝে মাঝে। ভিজে পথ, স্যাতসেতে মাটির বুকে বসে পাখা মেলে। এবারে হিমালয় ভ্রমণের সঙ্গী রমেনদা, অজিত আর সুশীল। রমেনদা আর অজিত ১৯৭১ সনে রূপকুণ্ডে গিয়েছিল। সুশীলের কাছে এই পথ নতুন। রমেনদা দ্রুত চলে, অজিত মালবাহীদের নিয়ে এগিয়ে যায়। আমার পেছনে পেছনে চলে সুশীল। জানি, ইচ্ছে করেই ধীরে ধীরে চলেছে। আমি থামলেই সুশীলও দাঁড়িয়ে পড়ে। পাইন, দেওদার গাছের কোণ-গুলো তুলে নিয়ে দেখে। চড়াই পথ, বকড়িওয়ালারা এই গভীর বনভূমির ভেতর দিয়ে সুন্দর পথ বানিয়েছে—বারবার চলাচল করার জন্য। এই বনের ছায়ায় দীর্ঘ চড়াই পথ যেন শেষ হতে চায় না কিছুতেই। সূর্যের আলো ঢুকতে পারে না বনভূমির ভেতরে। মাঝে মাঝে গাঢ় কুয়াশা এসে পথ রোধ করে। কেমন যেন অদ্ভুত স্যাতসেতে পরিবেশ। আমাদের গতি যেন মন্থর হতে চায়। সময় কেটে যায় ধীরে ধীরে। ঘন বনচ্ছায়ার ভেতর থেকে আকাশটা মাঝে মাঝে উঁকি দেয়। এক সময় পাইন, দেওদার গাছের ভীড় ঠেলে আকাশ যেন আত্মপ্রকাশ করে। সে আকাশও আবার মেঘাচ্ছন্ন। ত্রিথাকের ছোট্ট বুগিয়ালে পৌঁছেই দেখি দু'এক ফোটা করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করে। পাইন, রোডোডেনড্রন ক্যাম্পিনুলাটাম আর ভুজগাছ দিয়ে ঘেরা এই বুগিয়ালের সামনে এসে থমকে দাঁড়াই। অতি পরিচিত এই ছোট তৃণভূমি। সবুজ রঙের হাটুখানেক দীর্ঘ ঘাসের বুকে লাল, হলদে, সাদা আর বেগুনী রঙের ফুলগুলো দেখি। ভুজগাছ আর পাইন গাছের সহ-অবস্থান আমি হিমালয়ের অনেক জায়গাতেই দেখেছি। ভুজগাছ আর রোডো-ডেনড্রন এরা সবাই পরম সম্পদ।

ভুজগাছ আমাদের অতি পরিচিত গাছ। জানি না, কোন এক সুদূর অতীতে মুনি-ঋষিরা ভূর্জপত্র সংগ্রহ করেই তাতে বেদ উপনিষদ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সে যুগে কাগজের আবিষ্কার হয়নি হয়তো। ভূর্জপত্রই সে অভাব পূরণ করেছিল। ভুজগাছের ইংরেজী নাম বার্চট্রি। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে এই গাছের পরিচয়, বিটুলা (BETULA)। বিটুলার সর্বসাকুল্যে চল্লিশটি প্রজাতি শীতপ্রধান স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। ভুজগাছ পঞ্চাশ থেকে ষাট ফুট দীর্ঘ হয়। তবে খর্বাকৃতি গাছও দেখতে পাওয়া যায় কুমেরু অঞ্চলের কাছাকাছি স্থানে। আঁলাস্কার ভুজ গাছও অবশ্য

দীর্ঘদেহী নয়। উত্তর আমেরিকায় ইয়লো বার্চ নামক গাছ থেকে উইণ্টার গ্রীন তেল নিষ্কাশিত হয়। এই তেল কেশবর্ধক। বিভিন্ন জাতের ভূর্জ গাছগুলোর মধ্যে বিটুলা পেণ্ডুলা (সিলভার বার্চ) পঞ্চাশ থেকে ষাট ফুট দীর্ঘ হয়। উত্তর মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি স্থানের গাছগুলোর নাম হোয়াইট্ বার্চ, কানাডা অঞ্চলে বিটুলা পিউবিসাস্ রেডবার্চ, পেপার বার্চ (বিটুলা প্যাপিরিফেরা) ৬০ থেকে ৭০ ফুট দীর্ঘ। গ্রে বার্চ (বিটুলা পপুলি ফোলিয়া) কুড়ি থেকে চল্লিশ ফুট দীর্ঘ গাছ, খর্বাকৃতি বার্চ (বিটুলা নানা) ছড়িয়ে রয়েছে অপেক্ষাকৃত উচ্চ উপত্যকায় শীত প্রধান স্থানে। হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলের বিখ্যাত ভূর্জগাছের নাম বিটুলা ইউটেলিস। ৩০ ফুটেরও বেশী দীর্ঘ গাছ। ১০০০০ ফুট উচ্চতা থেকে শুরু করে ১২৫০০ ফুট উচ্চতায় ভূর্জগাছ দেখতে পাওয়া যাবে।

ভূর্জগাছের পাশাপাশি পাইন গাছের সহাবস্থান দেখে অবাক হতে হয়। যে স্থানের মাটিতে অম্লত্ব রয়েছে, সে স্থানে ভূর্জগাছ বহাল তবিয়তে বেঁচে রয়েছে। অবশ্য পরে লক্ষ্য করা গিয়েছে মৃত্তিকায় সামান্য অম্লত্বই বার্চ গাছের পুষ্টির সহায়ক।

ত্রিথাকের ছোট্ট তৃণভূমি পেরিয়ে আবার চড়াই। বিশাল আকৃতি-বিশিষ্ট দেওদার গাছ···তবে বনভূমি নয়। শেষ পাইন আর দেওদার গাছের তলায় এসে দাঁড়াতে হয়। মূষল ধারে বৃষ্টি শুরু হয়। সবাই ছাতা বার করে নিয়ে পিচ্ছিল পথ ধরে এগিয়ে যেতে থাকি। সামনেই বিশাল তৃণভূমি···বৈদিনী বুগিয়ালের শুরু। তৃণভূমির ঢালের কাছে পাথরের গায়ে জেনসিয়ানা মুরক্রফটিয়ানা আর পোলাইগোনাম। নিল আর হালকা গোলাপী ফুলগুলো পাশাপাশি বসবাস করছে। বৃষ্টির ভেতরেই এগিয়ে চলেছি বিশাল তৃণ ভূমির চড়াই-উৎরাই-এর ঢেউ পেরিয়ে। পাতলা মেঘের ফাঁকে সূর্যদেব যেন নিস্প্রভ। বুঝতে পারি, বিকেল হতে চলেছে, বেলা প্রায় দুটো। তৃণ-ভূমির মাঝে মাঝে বকড়িওয়ালাদের ঘাসে ছাওয়া ঝুপড়ি। ঘাসের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলি। ঘাসের মধ্যে অজস্র জিরানিয়াম, পোটেণ্টিলা, এনাফেলিস, ডেল-ফিনিয়াম আর কম্পোজিটার হলদে ফুল ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র। বেলা প্রায় তিনটের সময় বৈদিনীকুণ্ডের কাছে দুটি ট্যুরিষ্ট হাটের একটিতে ঢুকে পড়ি। সেখানে ঢুকতেই বৃষ্টির প্রকোপ যেন বাড়তে থাকে, সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। কাঠের দেওয়াল, বৃষ্টির ঝাপ্টা এসে ঘরের মেঝেয় পড়তে থাকে। ঘরের ভেতরে আবার তাবু খাটাতে হয়। পলিথিন শীট্ দিয়ে কাঠের দেওয়ালের ভাঙ্গা অংশ সামলাতে হয়। বৈদিনীকুণ্ডের কাছে পুরনো ধর্মশালা আরও জীর্ণ হয়েছে। অদূরে বকড়িওয়ালারা মোটামুটি শক্ত ঝুপড়ি বানিয়েছে। আমাদের মালবাহকদের মধ্য থেকে একজন সেখান থেকে

জ্বালানী কাঠ যোগাড় করে নিয়ে আসে। আগুন জালিয়ে ঘরটা গরম করে ফেলে। চা বানানো হয়…। আমাদের পাশে অপর একটি হাটে আর একদল বাঙ্গালী তরুণ রয়েছে। ওরা রূপকুণ্ড যাবে। ওদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল লোহাজঙে।

সারারাত প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ে, মেঘের গর্জন শুনে ঘুম ভাঙ্গে। এমন পরিবেশে আর কতদূর এগুনো যাবে, জানি না। মালবাহকরাই এমনি খারাপ আবহায়ায় চলতে চাইবে না। আবার ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম ভাঙ্গে ভোর ছটায় বৃষ্টির সাময়িক বিরতি, আকাশে মেঘ। পাশের হাট থেকে তরুণদল বেরুবার তোড়জোড় করছে। মরশুম খারাপ হলেও ওরা যাবে। আমি বাইরে বেরিয়ে আসি। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা… বৈদিনীকুণ্ড থেকে নেমে আসা জলধারা কলকল শব্দে বইতে থাকে। শান্ত কুণ্ডের একপাশে ভিজে মাটির বুকে অজস্র কম্পোজিটার হলদে ফুল দেখে দাঁড়িয়ে থাকি। হিমালয়ের অন্য কোথায়ও এমন অপরূপ তৃণভূমি আছে কিনা, জানি না। তৃণভূমিরও যে এমন অপরূপ সৌন্দর্য থাকতে পারে…বৈদিনীতে না গেলে বিশ্বাস করা যাবে না। আলিবুগিয়ালের চাইতেও আরও অপরূপ, আরও বিশাল। প্রায় ১২০০০ ফুট উচ্চতা থেকে ১২৫০০ ফুটের ওপরে ঢেউ খেলানো তৃণভূমির ঘাসগুলো কোথায়ও এক ফুট, কোথায়ও মসৃণ কার্পেটের মতো। বৈদিনীকুণ্ডের কাছের ঘাসগুলো মসৃণ, সোনালী আভাযুক্ত সমস্ত তৃণাঞ্চল সমতল নয় বলে বৃষ্টি হলেও জল বেঁধে রাখতে পারে না। উচ্চতা ১২০০০ থেকে শুরু করে ১২৫০০০ ফুট বলে স্বাভাবিক অক্সিজেনও কার্বনডাই-অক্সাইডের স্বল্পতায় বৃক্ষ সৃষ্টি ব্যহত হয়। বৃক্ষ সৃষ্টির অন্যতম সহায়ক জল, সেই জলের প্রাচুর্য নেই। হিমালয়ের উচ্চ উপত্যকায় এমন অপরূপ উত্থান-সৃষ্টি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার একটি কারণ বলা যেতে পারে। চাপযুক্ত অক্সিজেন, কার্বনডাই-অক্সাইড যেমন উদ্ভিজ্জের স্বাভাবিক বৃদ্ধি, পুষ্টি ও সহজ স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা যেমন ব্যহত হয়, তেমনি জলের প্রাচুর্যের অভাব উদ্ভিদকে অস্বাভাবিক জীবনের পথে ঠেলে দেয়। নন্দনকানন, নন্দনবন, তপোবন ক্ষীরগঙ্গা উপত্যকায় ঘাস ও বিচিত্র ফুলের সমারোহ রয়েছে। পাহাড়ের গঠন-প্রকৃতি উপত্যকার ভৌগোলিক পরিবেশের সঙ্গে জলের প্রাচুর্যের অভাবে বিস্তীর্ণ তৃণাঞ্চল গড়ে ওঠে।

বৈদিনীবুগিয়ালে তবু বেশ কিছুটা সমতল অংশ রয়েছে। বুগিয়ালের বৈশিষ্ট্য বিচার করতে গেলে দেখা যায়, হয়তো কোন এক সুদূর অতীতে সীমিত জলে, জীবনযাত্রা অব্যহত রাখার জন্য উচ্চ হিমালয়ের বিভিন্ন উপত্যকায় বিভিন্ন ধরনের ঝোপঝাড় জাতীয় উদ্ভিজ্জের ভেতরে টিকে থাকার প্রতিযোগিতা চলেছিল। সেই সাংঘাতিক প্রতিযোগিতায় কয়েকটি বিশেষধরনের ঘাস প্রতিষ্ঠা লাভ করে অপরূপ

তৃণাঞ্চলের সৃষ্টি করেছে। এই তৃণাঞ্চলই পাহাড়ী মানুষদের ভাষায় বুগিয়াল। বৃক্ষসীমার ওপরে অবস্থিত বলে জলাভাবে দীর্ঘদেহী বৃক্ষ এগিয়ে আসতে পারে নি। সেখানে স্টিপা (STIPA) নামে ঘাসের দুটি প্রজাতি বৈদিনীবুগিয়ালে প্রাধান্য লাভ করেছে। মাইলের পর মাইল চড়াই-উৎরাইয়ের মুখে পাহাড়ের ঢালে গুচ্ছাকারে ছড়িয়ে রয়েছে ডায়াস্থোনিয়া। বছরের ছয় মাস বরফে ঢাকা থাকলেও ঘাস কখনো নিশ্চিহ্ন হয় না। এদের দীর্ঘস্থায়ী মূল বেঁচে থাকার উপযোগী খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করে সঞ্চয় করে রাখে। এপ্রিল-মে থেকে শুরু হয় বরফ গলতে। বরফ গলা জলে সিক্ত মাটির বুক থেকে স্টিপা ও ডায়াস্থোনিয়া নতুন করে জীবনযাত্রা শুরু করে। নিম্ন বনাঞ্চল থেকে কস্তুরীমৃগ এসে নির্ভয়ে বিচরণ করে ঘাসের রাজ্যে। স্টিপা আর ডায়াস্থোনিয়ার স্বাদ মনে করে বার বার আসে বৈদিনীবুগিয়ালে। বকড়িওয়ালারা আসে ভেঁড়া-বকরি নিয়ে। ঘাসের অসীম রাজ্য, রাজা নেই তাই স্বাচ্ছন্দ বিচরণ। দূর থেকে শুধু ঘাসের রাজত্ব ভাবলেও চলবে না। এই ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে হলদে রঙের পোটেন্টিলা, জিউম, স্যাক্সিফ্রাগা, সাদা এনাফেলিস, হলদে আর গোলাপী রঙের কোরাইডালিস আর পেডিকুলারিস। ঢালের মুখে পিক্রোজাকারু, জেনসিয়ানা মুরক্রফটিয়ানা, পোলাইগোনাম। মাঝে মাঝে জুনিপার, রোডোডেনড্রন আস্থিপোগন। চারদিকে সমস্ত যায়গা জুড়ে পাকা আপেল ফলের সুগন্ধ। এগুলোর পাতা আর ডাল সংগ্রহ করে শুকিয়ে রাখে গ্রামের মানুষগুলো। বলে ধূপ গাছ, পূজোয় ব্যবহার করা হয় ধূপ-ধূনোর মতো করে। এই গাছের পাতা পুরু। প্রচুর তৈলরস থাকে। আগুনে ফেলে দিলে কাঁচাই দাউ দাউ করে জ্বলে।

পৃথিবীতে যতরকম উদ্ভিজ্জ রয়েছে, সবদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যের দাবী করতে পারে ঘাস বা গ্র্যামিনিই গোত্রের প্রজাতিগুলো। আজ থেকে তেইশ কোটি বৎসর পূর্বে তখন পৃথিবীর বুকে দীর্ঘদেহী কণিফার অপ্রতিহত রাজত্ব করতে শুরু করেছিল। তারপরই আসে সপুষ্পক উদ্ভিদ। কণিফার-এর রাজত্ব খর্ব করতে শুরু করে গ্র্যামিনিই গ্রোত্রের প্রজাতিগুলো। পৃথিবীর উত্তর প্রান্ত থেকে শুরু করে দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র স্থলভূমিতে বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তার করে রয়েছে ঘাসের বিভিন্ন প্রজাতি। গ্রামিনিই গোত্রের ৬০০টি বর্গের মধ্যে ৭৫০টি প্রজাতি পৃথিবীর স্থলভূমির অনেক অংশই অধিকার করে রয়েছে। ঘাসের বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় প্রজাতিগুলো সমস্ত মানুষের খাদ্যের সংস্থান করে। ধান, গম, যব, তুলা ভুট্টা, ইক্ষু আমাদের মুখ্য খাদ্যবস্তু। আমাদের গৃহপালিত জীবজন্তুর অনেকগুলো জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখার জন্য এই ঘাসের

প্রয়োজন রয়েছে। এ ছাড়া উন্নতধরনের প্রজাতি বাঁশগাছ, দীর্ঘদেহী, মনুষ্যজীবনের নানা প্রয়োজন সাধন করে।

ঘাস সপুষ্পক উদ্ভিদ, একদল বীজপত্রিযুক্ত। বাঁশের মূল কাণ্ডে গাট রয়েছে আর কাণ্ডগুলো সাধারণতঃ ফাঁপা। জন্মের শুরুতেই উদ্ভিদের প্রধান মূল বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অপ্রধান হয়ে যায়। উদ্ভিদকে খাদ্যবস্তু সংগ্রহের জন্য, দেহভ'র রক্ষার জন্য অসংখ্য গুচ্ছমূলের সৃষ্টি করতে হয়। গ্র্যামিনিই গোত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যই এই।

হিমালয়ের বিভিন্ন উচ্চতায় বিভিন্ন বুগিয়ালে অবশ্য ডজনখানেক ঘাসের প্রজাতি দেখতে পাওয়া যাবে। এর মধ্য প্রধানতঃ স্টিপা (STIPA), ডায়াস্থোনিয়া (DIANTHONIA), ডিউএক্সিয়া (DEYEUXIA), ডেস্চাম্পসিয়া (DESCHAMPSIA), ক্যাটাব্রসা (CATABROSA), পাও (PAO), প্লাইসারিয়া (GLYCERIA), ফেসটুকা (FESTUCH), অ্যাগ্রপাইরাম (AGROPYRUM), এলিমাস (ELYMUS)—এইসব ঘাসগুলোর অধিকাংশ প্রজাতিই গুচ্ছযুক্ত ও দীর্ঘজীবি। হিমালয়ের সমস্ত বুগিয়ালেই প্রায় স্টিপা ও ডায়াস্থোনিয়া ঘাস দেখতে পাওয়া যাবে। হিমালয় ছাড়াও পামীর, আলতাই, টিয়েন্সান্, আন্দিজ পর্বতমালা, কেনিয়া, কিলিমাঞ্জারো অঞ্চলেও ঘাসের বিভিন্ন প্রজাতি রয়েছে। তিয়েনসান, আলতাই অঞ্চলে পাও, ফেস্টুকা, আন্দিজ পাও, স্টিপা, ফেস্টুকা দেখতে পাওয়া যাবে।

•

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি শুরু হয়। বৈদিনী-বুগিয়ালের সমস্ত তৃণাঞ্চল ঝাপসা হয়ে যায় গাঢ় কুয়াশায়। প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া ঘর থেকে বের হতেই হাত পা যেন হিম হতে চায়। মালবাহকরা বৃষ্টির মধ্যে এগিয়ে যেতে অস্বীকার করে। আমাদের পাশেই অপর একটি ঘরে বাঙ্গালী তরুণ দল কলরব করছিল। ওরা মালপত্র বেঁধে ফেলেছে। উদ্দেশ্য বৃষ্টির বেগ সামান্য কমলেই বেরিয়ে পড়ার জন্য তৈরী হবে। বৃষ্টির শব্দ, ঝোড়ো বাতাসের গর্জন শুনতে থাকি চায়ের মগ হাতে নিয়ে বিছানায় বসে বসে। কাছেই আগুন জ্বালানো হয়েছে। জমানো কাঠ প্রায় শেষ হতে চলেছে। বেলা দশটা নাগাদ বৃষ্টির বেগ কমতে শুরু করে। তরুণ বাঙালী যাত্রীরা বেরিয়ে পড়ে ঘর থেকে। বাইরে দাঁড়িয়ে দেখি বিস্তীর্ণ তৃণভূমির ঢাল বেয়ে এগিয়ে চলতে থাকে ওরা। নিম্ন থেকে উঠে আসা গাঢ় কুয়াশা এসে ওদের ঢেকে ফেলে। ঘরে ফিরে এসে রমেনদাকে বলি, আমরাও রওনা হই এবার?

আমাদের সঙ্গী অজিতের শরীর ঠিক ভাল নয়। সুশীল কিন্তু দারুণ উৎসাহে গোছাতে শুরু করে। সব কিছু গুছিয়ে ফেলবার আগে রমেনদা প্রস্তাব দেয় খিচুরি রান্না করে খেয়ে যাবো।

অগত্যা তাই। খিচুরি খেয়ে মালপত্র নিয়ে বেলা এগারোটা নাগাদ ঘর ছেড়ে আবার বেরিরে পড়ি। বৃষ্টি থেমে গেছে। আকাশের মেঘ উধাও হতে চলেছে। রোদ ওঠে···হাল্কা রোদ। সবুজ ঘাসের দেশেরদিকে একবার তাকাই। ঘাসে এমন অপরূপ সৌন্দর্য আমি আগে কখনো দেখিনি। পথ চলতে চলতে ঘাস মাড়িয়ে যাই। ভিজে ঘাস, ইচ্ছে হয় এই অপরূপ ঘাসের বিছানায় শুয়ে শুয়ে তাকিয়ে থাকি নীল আকাশের দিকে। আকাশের বুক বেয়ে ফালি ফালি সাদা মেঘ যেন ভেসে চলেছে আনমনে। আবার হয়তো কোথায় বাসা বেঁধে ঝরে পড়বে মাটির বুকে। বৃষ্টির জলে স্নান করে উজ্জ্বল ঝকঝকে হয়ে উঠবে। বারবার দেখি। চড়াই ভেঙ্গে উঠে পড়ি ওপরে। কয়েক ফুট নীচে বৈদিনীবুগিয়াল আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। সুশীল ছবি তোলে। ধরে রাখতে চায় বৈদিনীবুগিয়ালকে। রমেনদা আর অজিত দ্রুত এগিয়ে যায়। আমার পা যেন আর চলতে চায় না। রোদ উঠেছে, মিঠে রোদ। মাঝে মাঝে কুয়াশার মতো মেঘ আসে নীচ থেকে। বৈদিনী-বুগিয়াল মাঝে মাঝে ঝাপ্‌সা হয়ে যায়। দু'চোখ বারবার মুছেও যেন অস্পষ্ট দেখি।

স্বর্গোদ্যান রক্তবরণ

গঙ্গোত্রী পেরিয়ে গোমুখ আমার অতি পরিচিত। পথ চলতে চলতে আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। যেন দুচোখ বন্ধ করেও চলতে পারি। পথের ধারে কোথায় বড়বড় রোডোডেনড্রন গাছ, আরও এগিয়ে প্রাচীন পাইন আর দেওদার গাছ। তারই ছায়ায় বসেছি পাথরের ওপরে কতবার। আরও এগিয়ে গিয়ে দেখতাম অজস্র আরু ফলের গাছ কাঁচা পাকা ফল পাতায় পাতায়; পাকা ফলগুলোর কেমন যেন টক-মিষ্টি স্বাদ, আমরা খেতে অভ্যস্থ নই। ভাল্লুকের দল কিন্তু খুব ভাল বাসে এই ফল খেতে। পথের ধারে অজস্র আরু ফলের বীজ পড়ে আছে। পথের মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঝর্ণা। প্রথম প্রথম ঝরণাগুলো বড় জীবন্ত দেখতাম। শুনতাম, কস্তরীমৃগ বিশ্রাম নেয় ঝরণার ধারে, গাছের ছায়ায়। ওই গাছের ছায়ায় আমিও তো অনেকবার বসেছি। গাছের ডালে ডালে নানা রঙের পাখী, কয়েকশ ফুট নীচে ভাগীরথীর জলধারা। শব্দ শুনতে পাই না এতদূর থেকে। এই পথই আমার চোখের সামনে ভেসে বেড়ায় সর্বক্ষণ। তাই কোথাও না কোথাও যাবো ভাবতেই সেই পথের ছবি দেখতে পাই। এক সময় কেমন যেন অজ্ঞাতসারেই আমাকে সেই পথই ডেকে নিয়ে আসে গোমুখে। ভাগীরথীর উৎসস্থল গোমুখ। সেখানে অফুরন্ত শান্তি। বরফের গুহামুখ ভাগীরথীর কুলু-কুলু ধ্বনির উৎস স্থল।

এই গোমুখের বাঁদিকের দীর্ঘ গিরিশিরার নাম ভূজবাসাধর। তার গা ঘেঁষে ঘেঁষে স্পষ্ট পথের রেখা ধরে এগিয়ে গেলে ডান দিকটায় বড়বড় পাথরের ঢাল। সেই ঢাল না পেরিয়ে অস্পষ্ট পথের চিহ্ন ধরে ভূজবাসাধরের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে পৌঁছে যাওয়া যায় রক্তবরণ উপত্যকার প্রবেশ মুখে। বেশ প্রশস্ত উপত্যকা, পূর্ব-উত্তরে তুষারাবৃত শৃঙ্গগুলো থেকে নেমে আসা বরফের ধারার নাম রক্তবরণ হিমবাহ। হিমাবাহের শেষপ্রান্তে দেখা যাবে অপরূপ বরফের গুহা, এক বিস্ময়কর গোমুখ। এ যেন যথার্থ ই গরুর মুখ থেকে নিঃসৃত জলধারা, নাম কালীগঙ্গা। ১৯৭২ সনে এই রক্তবরণ উপত্যকায় গিয়েছিলাম। সেখানে প্রায় দু সপ্তাহ থাকার সুযোগ হয়েছিল আমার।

গঙ্গোত্রী হিমবাহের একটি শাখা। হিমবাহের নাম রক্তবরণ হিমবাহ। রক্তবরণ নামটি অদ্ভুত। হিমবাহের বরফের ধারা তো ধব্ধবে সাদা। বরফের রঙ আবার লাল হবে কি করে? অবাক হয়ে গিয়েছিলাম এই অঞ্চলে যাবার প্রস্তাব হতেই। এক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর অনুভূতি। নতুন অঞ্চল, নতুন পথ। মাটি, উদ্ভিজ্জ সংস্থান এই সব নিয়েই তো রক্তবরণ। পাহাড়, তুষারাবৃত পর্বত শিখর, বরফ পাথর সবই এক হলেও, সবার ভিতরে কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য থাকেই। ঐ বৈশিষ্ট্যই পথ চিনিয়ে নিয়ে যায় পথযাত্রীদের। মনে অফুরন্ত উৎসাহ আর উত্তেজনা। যেন অনাবিষ্কৃত দেশ আবিষ্কার করতে চলেছি।

১৯৩৩ সনের কথা। বিখ্যাত পর্বতারোহী মার্কোপালিস দলবল নিয়ে এসে ছিলেন রক্তবরণ উপত্যকায়। উপত্যকার নাম তাঁরা জানতেন না। নাম শুনেছিলেন হয়তো গাড়োয়ালী পথ প্রদর্শকদের কাছ থেকে। ১৯৩৮ সনে অস্ট্রোজার্মান দল এসেছিলেন এই পথে। রক্তবরণ উপত্যকায় অবস্থান করে তাঁরা শ্রীকৈলাস পর্বত শৃঙ্গে আরোহণ করেছিলেন। ১৯৩৩ সনের অনেক পূর্বে গাড়োয়ালীরা ভেড়া, বক্‌ড়ি নিয়ে আসতো। রক্তবরণ উপত্যকার অপরূপ রাজ্যে প্রবেশ করেই লক্ষ্য করেছিল রক্তবরণ হিমবাহের ধবধবে সাদা বরফের ধারার দুপাশে সঞ্চিত পাথর-গুলোর রঙ যেন কেমন রক্তিম আভাযুক্ত। এমন অদ্ভুত রঙের পাথর দেখে তারা অবাক হয়েছিল। হিমবাহের বরফের ধারার দুপাশে লালচে রঙের পাথরগুলোর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেই হিমবাহের নাম করণ করেছিল রক্তবরণ হিমবাহ। কতকাল আগের কথা জানা নেই। ভারতীয় জরীপ বিভাগ জরীপ করার সময় এই হিমবাহের বৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণ করেই সেকালের প্রচলিত নামকেই মেনে নিয়েছিল। রক্তবরণ উপত্যকা অঞ্চলে সেকালের অভিযাত্রীদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে তেমন কোন উল্লেখ যোগ্য তথ্য ছিল না।

রক্তবরণ উপত্যকা অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ, এবং উদ্ভিজ্জ সংস্থান সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য ছিল না কোথায়ও। এবারের যাত্রা পথে দুজন বিজ্ঞানী সঙ্গী হওয়ায় আমার মনটা আনন্দে ভরে গিয়েছিল। সঙ্গীদের একজন উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী বাসব। বোটানিক্যাল সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়ার কর্মী। কর্মস্থল শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন। বয়সে তরুণ, উৎসাহী ও কর্মঠ। হিমালয় ভ্রমণের নেশা তার দেহে ও মনে। অপরজন হিমাংশু। জীববিজ্ঞানে ডক্টরেট, অধ্যাপনা করে। তরুণ উৎসাহী। হিমালয়ের কীট-পতঙ্গ সম্পর্কে নানা গবেষণা করার জন্য উৎসাহী, হিমালয় প্রেমিক

সে। তাই হিমালয়ের দুর্গমস্থানে গিয়ে কাজ করতে ইচ্ছুক। কোলকাতায় থাকতেই বাসব আর হিমাংশু নানা জায়গা ঘুরে হিমালয়ে কাজ করার জন্য সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম সংগ্রহ করেছিল দারুণ উৎসাহে। বাসব রক্তবরণ উপত্যকায় বিভিন্ন উচ্চতায় নানা ধরণের ফুলের প্রজাতি সংগ্রহ করবে। হিমাংশু বাসবের সঙ্গে সঙ্গেই থেকে নানা ধরণের উদ্ভিজ্জের ফুল পাতা পর্যবেক্ষণ করবে। সেইসব উদ্ভিজ্জ থেকে কীট-পতঙ্গ সংগ্রহ করবে। গঙ্গোত্রী অঞ্চলের উদ্ভিজ্জ সংস্থান সম্পর্কে সমীক্ষা করে ও নানা ধরণের উদ্ভিদের প্রজাতি সংগ্রহ করেছিলেন ১৯৬৭ সনে বোটানিকাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার বিজ্ঞানী বি ডি. নাইথানী। কিন্তু এই অঞ্চলের কীট-পতঙ্গ সম্পর্কে কোনরূপ সমীক্ষা হয়নি।

১৯৬৬ সন থেকে ১৯৬৮ সন পর্যন্ত প্রতিবারই কোন না কোন সূত্রে পায়ে হেঁটে ভাটোয়ারী থেকে গঙ্গোত্রী যাবার সুযোগ হয়েছিল। পরে বাস পথ এগিয়ে গিয়েছিল অনেক দূর পর্যন্ত। ফলে সমস্ত পথের উদ্ভিদ, ফুল, পাতা, কীট-পতঙ্গ, কোন কিছুই পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হোত না। গঙ্গোত্রী থেকে পায়ে হাঁটা পথ শুরু হয়। মোটামুটি দীর্ঘপথ। পাইন, দেওদার আর রোডোডেনড্রন আরবেরিয়াম গাছের ছায়ায় ছায়ায় পথ এগিয়ে গেছে সুন্দর স্বচ্ছন্দ গতিতে চীরবাসা পর্যন্ত। চীরবাসায় একটি ছোটখাটো ফরেষ্ট বাংলো রয়েছে। ভাগীরথীর জলধারার প্রায় কাছাকাছি বাংলো। রাত্রিবাস করার জন্য তীর্থযাত্রীরা আসে না এখানে। ভাগীরথীর ওপারে পুরনো কালের ধর্মশালা দেখতে পাওয়া যায়। সেকালের তীর্থ যাত্রীরা ভাগীরথীর ওপার দিয়ে যেতেন। পথ ছিল দীর্ঘ ও দুর্গম। ধর্মশালায় আশ্রয় নিয়ে রাত্রিবাস করতে হোত। সে পথ আজ পরিত্যক্ত। ফরেষ্ট বাংলোটি ছোট। তাই আমার দলের সবাই বাংলোর পাশে বিশাল পাইন গাছের তলায় পর পর তাবু স্থাপন করেছিল। গঙ্গোত্রী থেকে সমস্ত মালপত্র একদিনে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। তাই চীরবাসায় থাকতে হবে দিন দুয়েক। মনে মনে খুশীই হয়েছিলাম। চীরবাসার আশে পাশে ঘুরে বেড়ানো যাবে নিশ্চিন্ত মনে। এখানকার চীরবনের ভেতর দিয়ে পথ চলা যাবে। চীরবাসার প্রায় দু ফার্লং আগে একটা জলধারা পেরুতে হয়। ছোট কাঠের সেতু, নীচ দিয়ে প্রবাহিত জলধারার পাশে প্রতিবারই আমি বসে বিশ্রাম নিতাম চীরবাসায় পৌছবার আগে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ঝোড়ো হাওয়া আসে দূর থেকে দুটি গিরিশিরার মাঝখান দিয়ে জলধার সঙ্গে সঙ্গে। জলধারার উৎস স্থল কোথায়, কতদূরে জানি না। হয়তো দূরে গিরিখাদের শেষপ্রান্তে তুষারক্ষেত্রের মাঝখান থেকেই এসেছে এই জলধারা। ঝোড়ো হাওয়ার শো শো শব্দ আর জলধারার কল-কলধ্বনি সব

মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। বিশ্রাম নেবার ফাঁকে ফাঁকে দেখে নিতাম চার দিকটা। এই জলধারা অদূরে ঢালু পথ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। জলধারার চারদিকটা জুড়ে পুরনো হিমবাহের গ্রাবরেখার সুন্দর চিহ্ন সুস্পষ্ট। জলধারাটি হয়তো অতীতযুগের হিমবাহ। সেই হিমবাহ লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। গ্রাবরেখার বড় বড় পাথরগুলো কালের অত্যাচারে ভেঙ্গে চুড়ে গুড়িয়ে যেতে চলেছে। সেই গুঁতোগুঁতিতে পাথরগুলো বালুকণা হয়ে মাটিতে রূপান্তরিত হয়েছে। সেই মাটির বুকে জন্ম লাভ করেছে চীরগাছগুলো। একটা দুটো চীরগাছ নয়। চীরবন বলা চলে। তাই অঞ্চলটার নাম চীরবাসা। চীরগাছ একজাতীয় পাইন গাছ। কণিফার গোত্রের এক অপূর্ব গাছ পাইন। প্রায় পনের ষোলটি প্রজাতি নিয়ে পাইনাস্। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা চীরগাছকে বলেন পাইনাস রক্সবার্গ। বিখ্যাত উদ্ভিদ বিজ্ঞানী রক্সবার্গের নামকে স্মরণ করেই পাইন গাছের নামকরণ।

ভাগীরথীর গা ঘেঁষে এই নাতিপ্রশস্ত বনভূমি প্রসারিত। গাছগুলোর তলা ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে পরিষ্কার। যত রকম পাইন গাছ আছে তার মধ্যে চীরগাছের পাতা ও দেহত্বকে বোধহয় সবচাইতে বেশী পরিমাণ তৈলাক্তরস থাকে। এই তৈলরস থেকে তার্পিন তেল নিষ্কাশিত হয়। চীরগাছের পাতা মাটিতে ঝরে পড়ে পচে মাটির অযত্ন এমন পরিমাণ বৃদ্ধি পায় যে, অন্য কোন গাছই জন্মাতে পারে না চীরবনের মধ্যে। তবে ভাগীরথীর তটরেখার কাছাকাছি বেশ কিছু স্থানে ভূর্জগাছ দেখতে পাওয়া যায়। বিটুলা, ইউটিলিস কিন্তু অম্লযুক্ত মাটির বুকে জন্মলাভ করতে পারে। এজন্য পাইন গাছের সঙ্গে সঙ্গে সমানভাবে বসবাস করতে দেখা যায় ভূর্জগাছগুলোকে। ভূর্জগাছের বা বার্চ গাছের গোত্রের নাম বিটুলাসিয়া। এই গোত্রের মোট একশোটি প্রজাতি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে। চীরবাসার বাংলোর কাছে বেশ কয়েকটা বড় বড় ভূর্জগাছ রয়েছে। বেশ প্রাচীন গাছ, অম্লযুক্ত মাটির বুকে জন্ম ও বৃদ্ধির পক্ষে কোন অসুবিধাই হয় না। ভূর্জগাছকে সে যুগের মানুষ খুব পবিত্র বলে মনে করতেন। সম্ভবতঃ কাগজ আবিষ্কারে পূর্বে, কোন কিছু লিপিবদ্ধ করার জন্য ভূর্জগাছের পাতলা ছাল ব্যবহার করা হোত। গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখ যাবার পথে তীর্থযাত্রীরা আজকাল সোজা চলে যান ভূর্জবাসায়। সেখানে রাত্রিবাস করে পরদিন ভোরে গোমুখ দর্শন করেন। তারপর সেখানে থেকে সোজা চলে যেতেন গঙ্গোত্রী। চীরবাসার সৌন্দর্যদর্শনের সময় ও সুযোগ তারা পান না।

চীরবাসার আশে পাশে কম্পোজিটা গোত্রের এনাফেলিস দেখতে পাওয়া যায়

অজস্র। তিন চারটে প্রজাতি দেখা যাবে ভাগীরথীর ধার পর্যন্ত। এনাফেলিসের কাছাকাছিই দেখা যাবে পেডিকুলারিসের গোলাপী ফুল। কাছাকাছি পাথরের ফাঁকে ফাঁকে হলদে রঙের কোরাইডালিস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চীরবাসায় রাত্রি-বাসের জন্য আর কিচেনের ব্যবস্থা করে সব গুছিয়ে নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখি চারদিকটা। কাছাকাছি এনাফেলিসের ভীড়ের মধ্যে অজস্র পোটেন্টিলার হলদে ফুল দেখি। গাছগুলো ভালো করে লক্ষ্য করতেই থমকে যাই। গাছের সজীব পাতাগুলো কেমন কুকড়ে গেছে। অনেকগুলো পুষ্ট ফুলের পাপড়ি বিবর্ণ। বাসব অদূরেই কিচেনে বসে বসে গল্প করছিল জমিয়ে। ওকে ডেকে এনে দেখাই সব গাছগুলো। বেশ যত্ন করে দেখে পরীক্ষা করে ফুলগুলো, আমার দিকে তাকিয়ে বলে···এ তো খুবই কমন্ পোটেন্টিলা। সব কটা ফুলের প্রজাতিই রয়েছে গঙ্গোত্রীতে।

আমার উৎসাহ ও উদ্দীপনা কেমন যেমন ঝিমিয়ে পড়ে। এতগুলো ফুলের সবকটাই এক হাজার ফুট নীচে বেশ বহাল তবিয়তে রয়েছে। উচ্চ হিমালয়ে হাজার ফুটের উষ্ণতার তারতম্য···পরিবেশের ভারসাম্যের কিছু না কিছু পরিবর্তন ঘটেই। অথচ পোটেন্টিলার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি এই পরিবেশের মধ্যে। কিচেনে আড্ডা দিচ্ছিল হিমাংশু, হিমাদ্রি, বিনীত, করুণা। বাসবও আড্ডা দিচ্ছিল সেখানে। আড্ডা থেকে প্রায় জোর করেই তুলে নিয়ে এসেছি। আমার আগ্রহ লক্ষ্য করে বাসব ফুলগুলো ভাল করে লক্ষ্য করে বলে।—হ্যাঁ, গাছগুলোর পাতায়, ফুলের পাপড়িতে পোকা ধরেছে। বাসব বলে···হ্যাঁ, অজস্র পোকা গাছের পাতায় ডিম পেড়েছে। পাকাপাকি বাসা বেঁধেছে দেখি। কাছেই এনাফেলিসের পাতায় একটা পোকাও নেই। পোটেন্টিলা গাছ পোকাগুলোর প্রিয় দেখছি। বাসব হেসে বলে —এতো হিমাংশুদার বিষয়।

কিচেনে এগিয়ে যাই আমি আর বাসব। বাসব বলে, হিমাংশুদা, চল— তোমার সাবজেক্ট।

হিমাংশু আমার দিকে তাকিয়ে মিট মিট করে হেসে বলে আমার সাবজেক্ট মানে?

আমি বলি কতগুলো গাছে ফুলের মধ্যে প্রচুর পোকা রয়েছে।

হিমাংশু আমার দিকে তাকিয়ে বলে—এমন সময় বর্ষার পরে ফুলগুলোতে তো পোকা থাকা উচিত। কবিরা লেখেন কুসুমে কীট, এই মানানসই শব্দ চয়ন করার সময় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির চিন্তা ছিল না। কুসুম থাকতে হলে কীট থাকতে

হবে, না হলে কুসুমের অস্তিত্ব অসম্পূর্ণ হয়। কুসুমের রঙ, গন্ধ, সৌন্দর্য—কীটপতঙ্গ-গুলোকে নীরব আমন্ত্রণ জানায়। কিচেনের ভেতর থেকে হিমাংশু চলে তাঁবুর কাছে। চলতে চলতে বলে—এই সময়েই গাছের কচিপাতা ও ফুলের পাপড়ি-গুলোয় নানা পোকা এসে বাসা বাঁধে। গাছের রস সংগ্রহ করে জীবনধারণ করে। এর পর ডিম পেড়ে বংশ বৃদ্ধি করে এই শীতের আগেই। ফুল যেমন দ্রুত ঝরে গিয়ে ফলে পরিণত হয়, বীজ হয়, ঠিক তেমনি দ্রুত বেগে জীবনচক্রকে সমাপ্ত করে দেয় শীতের তুষারপাত হবার পূর্বেই।

কোনরূপ আলস্য নেই হিমাংশুর। কোন বিরক্তিও নেই। আড্ডা ছেড়ে তাঁবুর কাছে এগিয়ে যেতে আপত্তি করে না বিন্দুমাত্র। ট্রাঙ্ক খুলে পোকা ধরার আর সংরক্ষণের জন্য যন্ত্রপাতি বের করে নেয়। সেই সঙ্গে বেশ বড় ধরণের ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস নিয়ে চলে গাছগুলোর কাছে। তারপর প্রতিটি গাছ, ফুল, পাতা পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করে। আমি আর বাসব দেখি। ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস দিয়ে ভালভাবে ঘুরে দেখে হিমাংশু। আমি যেন বিখ্যাত গোয়েন্দা ব্যোমকেশ বা কিরীটির যন্ত্রপাতি নিয়ে মারাত্মক আসামী ধরে আনার প্রচেষ্টা দেখছি। অথবা ফেলুদার মতো যেন রহস্য উদ্ঘাটন করতে বসেছে হিমাংশু। আমি আর বাসব দর্শক। বেশ নিখুৎভাবে ফুলগাছ দেখে নেয় হিমাংশু। তারপর তুলি দিয়ে সযত্নে পাতা আর ফুলের পাপড়ির গা থেকে ছোট ছোট পোকাগুলো তুলে ছোট ছোট কাচের শিশির ভেতরে পুরে ফেলে। তারপর শিশির ভেতরে জলমিশ্রিত অ্যালকহল ঢেলে দেয়। ছোট ছোট পোকাগুলো হাবুডুবু খেতে খেতে খেয়ালী বৈজ্ঞানিকের হাতে প্রাণ হারায়। খালি চোখে পোকাগুলো দেখা গেলেও ঠিক বোঝা যায় না। ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস আমার হাতে দিয়ে হিমাংশু বলে—দেখুন, ঐ পোটেন্টিলার গাছের পাতার গায়ে গায়ে। দেখতে পাবেন খেয়ে দেয়ে মোটা সোটা হয়েছে পোকাগুলো।

ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস চোখে লাগিয়ে দেখি, পাতার গায়ে একসঙ্গে অনেকগুলো পোকা ধীরগতিতে চলে বেড়াচ্ছে। পেট বেশ মোটা, চোখ দুটো যেন কালো কুচকুচে-চকচকে; পূর্ণাঙ্গ পোকাগুলো বেশ স্বাস্থ্যবান। ছোট ছোট বাচ্চাগুলো যেন দ্রুত চলাফেরা করছে।

হিমাংশু আমার দিকে তাকিয়ে বলে - দেখলেন পোকাগুলো ?

আমি বলি—হ্যাঁ।

—ওদের দেখতে কেমন অদ্ভুত, ছোট ছোট বাচ্চাগুলোকে ঘিরে রেখেছে বড়গুলো।

—তাইতো দেখছি !

—ক্ষুদ্র কীট হলেও অনুভূতিবোধ কেমন রয়েছে দেখুন !

ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস দিয়ে ভাল করে দেখি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। ছোট ছোট পোকাগুলো দ্রুত পালাবার চেষ্টা করছিল যেন। পূর্ণাঙ্গ পোকাগুলো মোটাসোটা বলে তাদের গতি মন্থর। ওদের পালাবার ধরণ দেখে মনে হয়, যেন পালে বাঘ পড়েছে।

এই ছোট ছোট পোকাগুলো হিমাংশুর অতি পরিচিত। এগুলোর পরিচয়পত্র, জাতি বিচার, পংক্তি নির্ণয় করাই যেন তার কাছে এক অদ্ভুত আনন্দ। সব গাছ থেকে বেশ কয়েকটি প্রজাতি সংগ্রহ করে হিমাংশু যেন আশ্বস্ত হয়। হেসে বলে—যাক্, খাটুনি পুষিয়েছে। না হলে তো মনটাই খারাপ হোত। একটা সুবিধে যে, পোকাগুলো দ্রুত ছুটে পালাবে না, উড়েও চলে যাবে না নাগালের বাইরে।

আমি বলি—সে কি ! এগুলোর পাখাও হয় না কি ? উড়ে পালাবে মানে ?

হিমাংশু বলে—হ্যাঁ, পোকাগুলোর পাখা হয়। তবে সবগুলোর নয়। শুধু পুরুষ পোকাগুলোর পাখা হয়। এই প্রজাতিগুলোর মধ্যে পুরুষজাতীয় পোকার সংখ্যা খুঁজে পাওয়াই দুঃসাধ্য। প্রজাতিগুলোর অধিকাংশই স্ত্রীজাতীয়। গাছের কচিপাতা, ফুলের পাপড়ি থেকে রস শুষে নিয়ে পুষ্ট হয়।

যন্ত্রপাতি সব গুছিয়ে নিয়ে হিমাংশু বলে—এগুলো এক অদ্ভুত ধরণের পোকা। এর নাম এফিডিনা। আমরা অবশ্য সংক্ষেপে বলি এফিড্। বলতে পারেন, আদর করে এই নাম ধরে ডাকা। মানুষের গায়ে যেমন উকুন হয়, ঠিক তেমনি উদ্ভিদের দেহে, পাতায়, ফুলের—এগুলো উকুন। ইংরেজী ভাষায় বলা হয় Plant Lice। উদ্ভিদের কচিপাতা, ফুলের পাপড়িতে বাসা বাঁধে। তারপর বংশ বৃদ্ধি করে গাছের পুষ্টিবৃদ্ধি বাহত করে। ফুল হলেও ছোট ও বিকৃত হয়।

হিমাংশু বলে—সারা পৃথিবী জুড়ে ৩০০০টি এফিডের প্রজাতি ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন ধরণের গাছপালায়। এই এফিড উদ্ভিদের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। সমতল ভূমিতে নানা গাছে এই পোকাগুলো দেখা যায়। খাদ্য শস্যের পক্ষে এই পোকাগুলো খুবই ক্ষতিকর। কপি, টম্যাটো নানাজাতীয় শাক-সব্জীতে এই এফিড দেখতে পাওয়া যাবে। বিজ্ঞানীরা বলেন, এফিড অনেক ক্ষেত্রেই মারাত্মক রোগের কারণ হয়।

হিমাংশুর কথা আমি শুনি মন দিয়ে। কথা বলতে বলতে ইতিমধ্যে সে যন্ত্রপাতি ট্রাঙ্কে ভর্তি করে ফেলে। ওকে বেশ খুশী দেখায়। গঙ্গোত্রী থেকে এ পর্যন্ত নানা ঝামেলায় ব্যস্ত ছিল। কাজেই কীটপতঙ্গের দিকে নজর দিতে পারে নি। নানা

অনিশ্চয়তার মধ্যে শেষটা চীরবাসায় অবস্থান করার সুযোগ পেতেই আশ্বস্ত হয়েছিল। সামান্য সুযোগের মধ্যে তবু এফিডের তিন চারটি প্রজাতি সংগ্রহ করতে পেরেছে। সামান্য কাজ করতে পেরেছে, ; মনটা ভরে গেছে তাই। কিচেনের আড্ডা ভেঙ্গে গেছে। চা আসে, চানাচুর আসে। মগ ভর্তি চা হাতে নিয়ে হিমাংশুর কাছ থেকে এফিডের কাহিনী শুনি। এই এফিড সে কুমায়ুন হিমালয়ে গিয়ে সংগ্রহ করেছিল। এই এফিডের ওপরে সে গবেষণা করেছিল। সমতল ভূমিতে যে সব এফিডের প্রজাতি শস্য ও শাক-সব্জীর ক্ষতি করে, সেইসব প্রজাতিগুলো উচ্চ হিমালয়ে এসে হাজির হয় কেমন করে জানা যায় না। এই ক্ষুদ্র পোকাগুলোর জীবনযাত্রা বিস্ময়কর। প্রায় সব পোকাই স্ত্রীজাতীয়। বিশেষ করে যে পোকা-গুলোর পাখা থাকে না আদৌ। উদ্ভিদের দেহে অসংখ্য এই স্ত্রীজাতীয় এফিড ডিম্বাণু সৃষ্টি করে বহন করে সারা শীতকাল পর্যন্ত। বসন্তে এইসব ডিম্বাণু পুষ্ট হয়ে ফুটে এফিডের জন্ম দেয়। শীতকাল থেকে শুরু করে বসন্তে অসংখ্য এফিড সমস্ত উদ্ভিদের কচিপাতায় বসবাস করতে থাকে। হিমাংশুর কাছ থেকে গল্প শুনতে শুনতে ঠাট্টা করে বলি—পৃথিবীতে এই এক বিস্ময়কর জীব। পুরুষ পোকার সাহায্য ছাড়াই এরা বংশ বৃদ্ধি করে যায়।

হিমাংশু বলে—হ্যাঁ, ঠিক তাই বলা চলে।

আমি বলি—কণিকার গোত্রের এই যে চীরগাছ···ফুল নেই, বীজ নেই···তবু এই বিস্ময়কর উদ্ভিদ বংশবৃদ্ধি করে চলেছে। এফিডের মতোই বিস্ময়কর···জীবনচক্র একরূপ না হলেও বিস্ময়কর।

হিমাংশু হাসে। মগ ভর্তি চা শেষ হয়ে যায়। আকাশ পরিষ্কার, ভাগীরথীর কলকল শব্দ শোনা যায়। প্রখর রৌদ্রকিরণেও স্থানটি বেশ ঠাণ্ডা। চীরবন থেকে ভেসে আসা ঠাণ্ডা হাওয়া যেন রৌদ্রকিরণকে স্তিমিত করে দেয়।

হিমাংশুকে আমার বেশ ভাল লাগে। পরিষ্কার কথা বলে, স্পষ্ট বক্তা। সবার কাছে সে প্রিয় নাও হতে পারে। কিন্তু হিমালয়ের দুর্গম পথে সে ভাল সঙ্গী। বাসবও অত্যন্ত সহজ ও সরল। পথ চলার পক্ষে সুন্দর সঙ্গী। উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ছাড়াও তার নানা গুণ রয়েছে। দুর্গম পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হলে বসে পড়ে। বসে বসে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনায়। অনেকগুলো গান তার মুখস্থ। গলাও বেশ সুরেলা। ফুলের সন্ধান করতে করতে গান গেয়ে চলে। চড়াই ও উৎরাইয়ে যেন তার অফুরন্ত উৎসাহ।

চীরবাসায় একরাত্রি অতিবাহিত করার পর পরদিন ও থাকতে হয়েছিল।

গঙ্গোত্রী থেকে সব মালপত্র এসে চীরবাসায় জমা হলে গোমুখ যেতে হবে। ফলে, চীরবাসায় কিচেনের সামনে বসে গল্প-আড্ডা। সকাল সকাল চা-জলখাবার শেষ করেই বাসব আর হিমাংশু বেরিয়ে পড়ে। আমিও ওদের সঙ্গী হই। হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যাই ভাগীরথীর ধারা অনুসরণ করে। চীরবাসার চীর আর পাইন গাছের স্বল্প-পরিসর বর্নভূমি শেষ হতেই প্রায় দীর্ঘদেহী বৃক্ষ বিরল হতে থাকে। মাঝে মাঝে দু-একটা প্রাচীন পাইন গাছ আর ভুজগাছ। ভুজগাছের পাতলা কাগজের মতো বল্কল খুলে খুলে বাতাসে উড়ছিল। কণিফার গোত্রের পাইন আর বার্চ গাছের মধ্যে সখ্যতা দেখেছি হিমালয়ের নানা জায়গায়। কণিফার গোত্রের অন্যতম প্রজাতি পাইনাস্ রক্সবার্গ বা চীর অতি পরিচিত। চীর গাছের বনভূমির এক সুন্দর নিদর্শন চীরবাসা। চীরবাসার উচ্চতা ১১৪৪০ ফুট। এই উচ্চতায় দীর্ঘদেহী বৃক্ষ বিরল হওয়ার কথা। কিন্তু গঙ্গোত্রী উপত্যকায় তার হয়তো ব্যতিক্রম। ১১৭০০ ফুট উচ্চতা পর্যন্তও চীরগাছ দেখি। তারপর পাইনের অন্য প্রজাতি আর সেই সঙ্গে ভুজগাছ। এক সময় ১২০০০ ফুট অতিক্রম করতেই পাইন গাছ অদৃশ্য। তখন শুধু ভুজগাছের একচ্ছত্র আধিপত্য। ভুজবাসায় কোন এক সময় ভুজগাছের বন ছিল। এখন বন না হলেও ভুজগাছের অনেকগুলো গাছই রয়েছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে।

ভাগীরথীর তটরেখা ধরে সামান্য পথ অতিক্রম করি। কারণ পথ নেই। ছোট-বড়, অসমান পাথর। আর সেই পাথরগুলোর মাঝখানে পোটেন্টিলা ফ্রুটিকোসা, পেডিকুলারিস। নতুন প্রজাতি কিছুই নেই। মাঝে মাঝে ইমপেসেন্স-এর কিছু কিছু গাছে হাল্কা গোলাপী ফুল দেখা যায়। গাছ ছোট তবে ফুলের আকৃতি বড়। ভাগীরথীর তটরেখা পেরিয়ে এগিয়ে চলি পায়ে চলার পথের দিকে। মাতৃগঙ্গার কাছাকাছি এসে ভুজগাছের ছায়া ঘেরা চড়াই পেরিয়ে পৌঁছে যাই পায়ে চলা পথের ধারে। মাতৃগঙ্গার ওপরকার ছোট কাঠের সেতু। চারধারে শুধু ভুজ-গাছ। তবে ভুজ গাছগুলো খুব দীর্ঘ নয়। হয়তো উচ্চতার জন্য। মাতৃগঙ্গার ধারে অজস্র রোডোডেনড্রন ক্যাম্পিনুলাটামের গাছ। আমরা পাথরের ওপরে বসি মাতৃগঙ্গার ধারে। ভিজে মাটিতে দেখি কয়েকটি এপিলোবিয়ামের গাছ। বিশেষধরনের প্রজাতি। ফুল ফুটেছে মাত্র তিন-চারটে গাছে। ফুলগুলো ছোট ছোট। ১৯৬৬ সন থেকে এই পথে অনেকবার যাবার সময় দেখিনি গাছগুলোকে। মনে হয়, প্রকৃতিদেবীর অদ্ভুত খেয়াল। হয়তো বহুদূর থেকে এই বিশেষধরনের এপিলোবিয়ামের গাছ এসে লাগিয়ে দিয়েছিল। মাতৃগঙ্গার ধার ধরে অনেক জায়গাই দেখি। নাঃ, শুধু এক যায়গায় মাত্র গুটিকয়েক গাছ। গাছগুলোর কাছে কাছে ভিজে মাটিতে

অজস্র অ্যাস্টর। সাদা, হাল্কা গোলাপী, গাঢ় গোলাপী ফুল। অ্যাস্টরগুলো কম্পোজিটা গোত্রের অত্যন্ত শৌখীন প্রজাতি। এই গাছ সমতল ভূমিতে শৌখীন বাগানে ফুটে থাকে। মালীরা এর পরিচর্যা করে…। শীতের শুরুতে ফুল ফুটে বাগানকে আলো করে রাখে। এখানে মালী নেই পরিচর্যা করার মত। তবু এত সুন্দর ফুল!

পথ চলতে চলতে গোলাপী, হাল্‌কা গোলাপী, সাদা আর হলদে রঙের ইমপেসেন্স গাছ দেখি। ছোট ছোট গাছে বেশ বড় বড় ফুল ফুটে রয়েছে। অনেকগুলো ফুল ঝরে গিয়েছে। ফল হয়েছে, কতগুলো ফল আবার পুষ্ট হয়ে পেকে গেছে। সামান্য হাত লাগলেই ফলগুলো ফেটে বীজগুলো ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। এই গাছগুলোর ফল স্ফোটকজাতীয়। কতকগুলো পাকা ফলের কাছাকাছি আসতেই ফেটে গিয়ে বীজগুলো আমার চোখে-মুখে লাগছিল। ফলগুলো যেন আগন্তুক দেখলেই ইচ্ছে করে ফেটে বীজ ছিটকে যাচ্ছিল চারধারে। ইমপেসেন্স গাছগুলো বালসামিনাসিয়া গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। গোত্রের মাত্র পঁয়তাল্লিশটি প্রজাতি। হিমালয়ের বিভিন্ন উচ্চতায় দশ থেকে বারোটা প্রজাতি দেখতে পাওয়া যায়। দোপাটি ফুল বালসামিনাসিয়া গোত্রের একটি বিখ্যাত ফুল। নিম্ন-উপত্যকায়, সমতল-ভূমিতে এই ফুল শৌখীন বাগানে দেখতে পাওয়া যায়। দোপাটি ফুলের দেহঘটন, ডালপালা ও পাতার সঙ্গে ইমপেসেন্স গাছের পুরোপুরি মিল দেখতে পাওয়া যাবে।

মাতৃগঙ্গার ঢালের দিকে অজস্র রুমেক্স গাছের কচিপাতা দেখে হিমাংশু ও বাসব হুড়দার করে নেমে যায় নীচের দিকটায়। সেখানে স্বল্পপরিসর সমতল স্থানে যেন রুমেক্সের বাগান হয়েছে। ছোট ছোট গাছ, সবে কচি কচি পাতা দেখা দিয়েছে। এমন কচিপাতায় কীটপতঙ্গ বাসা বাঁধে। রুমেক্সের কচি পাতাগুলো পরীক্ষা করতে থাকে হিমাংশু। পাতাগুলো নিটোল অক্ষত। মনে হয়, কীটপতঙ্গ এখনও খবর পায় নি। তবু ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস দিয়ে ঘুরে ফিরে দেখে হিমাংশু। পাতার পেছনে কীটগুলো সবেমাত্র বাসা বেঁধেছে কিনা?

রুমেক্সের পাতাগুলো অনেকটা পালঙশাকের মতোই দেখতে। বিষাক্ত নয়, বরং এই গাছে ভেষজগুণ রয়েছে। পোলাই গোনাসি গোত্রের একটি অতি পরিচিত প্রজাতি। এই গোত্রের সর্বসাকুল্যে ৮০০টি প্রজাতি দেখতে পাওয়া যায়। মোটামুটি ৬০০০ ফুট উচ্চতা থেকে শুরু করে ১৩০০০ ফুটেরও বেশী উচ্চতায় রুমেক্স বসবাস করতে পারে। গাছের ফুলগুলো তেমন দর্শনীয় নয়। ফল হয়, তবে ফলে আকৃসির মতো থাকায় অন্য কোন জীবজন্তুর লোমশ দেহে আটকে স্থান থেকে

স্থানান্তরে যায়। রুমেক্সের কচিপাতা ভেড়া, বক্‌ড়িগুলোর খুবই প্রিয় খাদ্য। পাহাড়ী মানুষরা ভেড়া, বকড়ি নিয়ে আসে হিমালয়ের উচ্চ ভূমিতে। শীতের শুরুতে উপত্যকার বরফ গলে যায়। নরম মাটি ও গুড়ি গুড়ি পাথরের বুকে সবুজ ঘাস আর নানা জাতীয় উদ্ভিদের জন্ম লাভ হয়। তুষারপাত এসে কিছু কিছু গাছ নষ্ট হয়। বর্ষার পর আবার নতুন জাতীয় উদ্ভিজ্জের জন্ম হয়। সমস্ত ঘাস আর উদ্ভিদের মধ্যে রুমেক্স যেন ভেড়া-বকড়িদের সব চাইতে প্রিয় খাদ্য। এই গাছের কচি পাতা খায়। গাছ পুষ্ট হলে ফুল হয়, ফল বড় হয়ে পুষ্ট হয়। পরে পাকা ফল শুকিয়ে ভেড়া-বকড়ির লোমে আটকে যায়। তারপর চলে যায় বিভিন্ন উচ্চতায়, বিভিন্ন উপত্যকায়। যেখানে সেখানে রাত্রিবাস করে ভেড়া-বকড়ির দল। সেখানেই রুমেক্সের শুষ্কফল মাটি আর পাথরের বুকে ঝরে পড়ে নতুন করে কলোনীর সৃষ্টি হয়। উদ্ভিজ্জের জীবনের পূর্ণতার লাভের জন্য প্রকৃতিদেবীর এমন পাকাপাকি ব্যবস্থা··· এমন নিপুণ হস্তক্ষেপ উচ্চ হিমালয়ে দেখতে পাওয়া যাবে সর্বত্র।

হারসিলে একবার আমাদের থাকতে হয়েছিল দু-দিনের জন্য। বাস রাস্তা সবে চালু হয়েছে উত্তরকাশী থেকে হারসিন পর্যন্ত। অনিয়মিত বাস···তাই মালপত্র নিয়ে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। আপেল বাগানের কাছেই সেই পুরনো উইলসন সাহেবের বাংলায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। বিকেলবেলায় চায়ের সঙ্গে পকৌড়ি পরিবেশন করেছিল ছুঙে। শঙ্কুদা একটা পকৌড়ি খেয়ে খুব খুশী। আর একটা হাতে নিয়েই আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলো—হ্যারে, এটা কিসের পকৌড়ি? এমন সুন্দর শাকের পকৌড়ি! আমিও খেতে খেতে অবাক হয়েছিলাম। সত্যিই তো, কিসের পকৌড়ি! এখানে শাক পাবে কোত্থেকে?

ছুঙেকে ডাকলো শঙ্কুদা। ছুঙে এসে সেলামঠুকে বলে, কী সাব্?

শঙ্কুদা জিজ্ঞাসা করে—হ্যারে ছুঙে, এটা কিসের পকৌড়ি?

ছুঙে হাসে। হাত-পা কচলে বলে—এ বহুৎ বড়িয়া সব্জী সাব্!

শঙ্কুদা বিরক্তির ভাব নিয়ে বলে—দূর ব্যাটা। বলবি তো এটা কি শাক?

ছুঙে অকপটে হাসতে হাসতে বলে এ পাহাড়ী জংলীপাতা সাব!

—জংলী পাতা! অ্যা! শঙ্কুদা ততক্ষণে সবকটি পকৌড়ি খেয়ে ফেলেছে। আমার দিকে তাকিয়ে বলে—সর্বনাশ! জংলী পাতা, তার মানে অখাদ্য। হ্যারে, তরা কি সব খাওয়াইত্যাছস্? শঙ্কুদা খাস মাতৃভাষায় বলতে শুরু করলো। প্রাণেশ পাশেই বসেছিল। সে হেসে বলে—আপনার অত দেখবার দরকার কি? খেতে ভালো তো?

শঙ্কুদা প্রাণেশের কথা শুনে আমার দিকে তাকিয়ে বলে—কি? দেখুম না মানে? খাইতে ভালো বইল্যা কি সবই খামু? অনেক বিষই তো খাইতে সুস্বাদু! তাই বইল্যা? শঙ্কুদা হাঁক ছাড়লো···ওরে হারামজাদারা, তোরা আমারে পাহাড়ে নিয়া আইস্যা মারবি নাকি? ও ডাক্তার?

স্বপন পকৌড়ি খেতে খেতে এগিয়ে এসে বলে—কি হল আপনার?

শঙ্কুদা বলে—হ্যারে। তোরা এসব কি খাওয়াইতাছস?

স্বপন একটা পকৌড়ি শঙ্কুদার হাতে দিয়ে বলে—নিন. আর একটা খান?

—না। শঙ্কুদা বলে। আর খামু না। তালে পাল্লায় পইর‍্যা মরি আর কি?

স্বপন আশ্বাস দেয়—খেয়ে যান শঙ্কুদা, আমি তো আছি।

শঙ্কুদা বলে—অ্যারে বেটা। তুইও তো খাইতাচস্। তুই মইলে আমাগো দেখবি ক্যামনে?

সেইদিন রাত্রেই আবার আমাদের ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিল সামরিক অফিসারদের ক্যাম্পে।

শঙ্কুদা বলে—হারে, আমরা রাবণের গুষ্টি নিয়া যামু নাকি?

অমূল্য বলে—কেন, আপনার যেতে আপত্তি আছে নাকি?

—না, তা নয়।

—তাহলে? ওরা পুরোটিমকেই নেমন্তন্ন করেছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামতেই একজন পথ প্রদর্শক এসে হাজির। আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চড়াই ভেঙ্গে। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে চড়াই ভেঙ্গে পৌঁছে গিয়েছিলাম সবাই। চড়াই ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে সবারই প্রায় ঘাম ছুটবার অবস্থা। শঙ্কুদা এক ফাঁকে বলেই ফেলে—হারে, ডিনার খাইতে এত কষ্ট আগে জাইন্‌লে যাইতাম না।

আমরা সবাই নীরব। বেশ একটা রোমাঞ্চকর পরিবেশ, বেশ একটা রহস্যের আভাস যেন। ১৯৩৯ সনে জার্মান অভিযাত্রী হেনরিখ হেরার হয়তো এইসব পথ ধরে গভীর বনপথে পালিয়ে গিয়েছিল তিব্বতে। দেরাদুন থেকে পালিয়ে সারারাত চলতো সাধারণ পথ এড়িয়ে। দিনের আলোয় পাহাড়ের ওপরে গভীর বনে লুকিয়ে থাকতো। এমনভাবে আত্মগোপন করে থেকে পথ চলা শুরু করতো রাত্রির অন্ধকারে। অন্ধকারে বনের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে আমারও মনে হচ্ছিল সেই হেনরিখ হেরারের রোমাঞ্চকর পথ চলার কথা। ক্রমে গভীর বন হাল্কা হতেই বুঝতে পেরেছিলাম আমরা বেশ উচ্চভূমিতে পৌঁছে গিয়েছি। বেশ খোলা

জায়গা দিয়ে পথ প্রদর্শক নিয়ে গিয়েছিল ক্যাম্পে। ক্যাম্পের কার্য কর্তা বাঙ্গালী মেজর। তিনি আমাদের নেমন্তন্ন করেছিলেন বাঙ্গালী দল বলে। এ ছাড়া অমূল্যের সঙ্গে পূর্ব পরিচয়ও ছিল। বেশ ছোটখাটো ঘর মেজরের। ডাইনিং টেবিল বসানো ছিল ঘরের একপাশে। রুমহিটার বসানো ছিল পাশেই। ইলেক্‌ট্রিকের নয়। বেশ বড় টিনের চোঙের মধ্যে কাঠ জ্বালানো হচ্ছিল। চোঙ দিয়ে ধোঁয়া বাইরে ওপরে চলে যাচ্ছিল। কাঠ জ্বলতেই-টিনের চোঙটা প্রচণ্ড গরম হওয়ার জন্য সমস্ত ঘরটাই গরম হয়েছিল। কাছেই ছোট জেনারেটর বৈদ্যুতিক আলো ছিল। কিন্তু এই অদ্ভুতধরনের রুমহিটার আমি কোথায়ও দেখিনি।

ডাইনিং টেবিলে গেলাসে মদ পরিবেশন করা হয়েছিল। শঙ্কুদা আর আমি দারুণ অস্বস্তিতে পরে আপত্তি করতে শুরু করি। অন্যান্য সবাই জানায়, মদ্যপানে আমরা আদৌ অভ্যস্ত নই। অবশ্য বোটানিষ্ট নাইথানি আর তার সহকর্মী তো খুব খুশী। তারপর খাদ্য পরিবেশন হলো। প্রথম প্লেটে পকৌড়ি। বেশ অবাক হয়ে শঙ্কুদা আমাদের দিকে তাকিয়ে বলে—আরে, এতো সেই পকৌড়ি! সেই পাতা, বেসনে ডুবিয়ে ভাজা পকৌড়ি। বেশ গরম গরম পকৌড়ি।

পকৌড়ি খেতে খেতে শঙ্কুদা মেজরকে জিজ্ঞাসা করে—এগুলো কিসের পকৌড়ি?

মেজর মুচকি হেসে বলেন—উহুঁ, বলা যাবে না। ট্রেড সিক্রেট।

শঙ্কুদা হাসে। ডিনারের টেবিল সাজানো হয়েছে নানাধরনের বাঙ্গালী খানা দিয়ে। নারকেলে দিয়ে ছোলার ডাল, আলুর দম, মটর পনীর, পায়েস!

সুন্দর রান্না হয়েছে। শঙ্কুদা খেতে খেতে তারিফ করে। খুব ভালো রাঁধুনী।

মেজর হাঁক ছাড়তেই একজন তিব্বতী তরুণ এসে হাজির হয়। মেজর তিব্বতী ভাষায় কি যেন বলে। তিব্বতী তরুণ মৃদু হেসে চলে যায়। মেজর বলে এই আমার রাঁধুনী।

শঙ্কুদা অবাক। সে কি! এতো বাঙ্গালীখানা রান্না করতে শিখেছে খুব সুন্দরভাবে। মেজর বলে—হ্যাঁ, একে আমি শিখিয়ে নিয়েছি। পাহাড় পর্বতে থাকি। বাঙ্গলার বাইরে থাকতে হয়। বাঙ্গালী খাবার পাবো কোথায়? এই ছেলেটিকে শিখিয়ে নিয়েছি। এ সব শিখেছে। এমন কি বাঙ্গালী পিঠে পর্যন্ত বানাতে পারে।

শঙ্কুদা বলে- পাহাড়ে এসে এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হোল। তবে মেজর, আর একটা জিজ্ঞাসা। মেজর হেসে বলে—বলুন।

—ঐ পকৌড়ি কি শাক দিয়ে বানানো হয়েছে?

মেজর বলে—ঐ শাকগুলো হিমালয়ের বিভিন্ন উচ্চতায় দেখতে পাওয়া যায়। বোটানিষ্টরা বলেন রুমেক্স। এই গাছের পাতায় বিন্দুমাত্র বিষাক্ত নেই। পাহাড়ী মানুষ এই শাখ খায়। এছাড়া ভেড়া-বকড়ির তো দারুণ প্রিয় এই রুমেক্স।

রাত গভীর হয়। মেজর আমাদের বিদায় জানায়। পথ-প্রদর্শক আবার নিয়ে চলে গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। উৎরাইয়ের মুখে খুব সাবধানে চলতে হয়। হারশিলের কাছাকাছি এসে শঙ্কুদা বলে—তগো পাল্লায় পইড়্যা কি সব যা-তা খাইলাম। শেষটায় মরুম না তো?

আমি হাসি শঙ্কুদার কথা শুনে।

শঙ্কুদা বলে—তোর তো খুব আনন্দ।

সত্যিই খুব আনন্দ হয়েছিল। পরিবেশগুণে সব অসুবিধা, সব কষ্টই আনন্দে পরিণত হয়েছিল। ১৯৬৭ সনের কথা। শঙ্কুদা আজও সুস্থ ও সবল হয়েই বেঁচে রয়েছেন। আরও অনেকবার দুর্গম হিমালয়ে গিয়েছে বেড়াতে। আরও বই লিখেছে হিমালয় সম্পর্কে। হিমালয়ের বিভিন্ন উচ্চতায় অনেক লতাপাতা···· শাক-শব্জী হিসাবে ব্যবহার করে পাহাড়ী মানুষগুলো। তারা এই সব উদ্ভিজ্জের গুনাগুণ সম্পর্কে জানে। অসংখ্য উদ্ভিজ্জের মধ্যে চিনে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করতে জানে। হিমালয়ের এমন বিস্ময়কর পরিবেশের মধ্যে এমন সব উদ্ভিজ্জ দেখতে পাওয়া যায় পথ চলতে চলতে।

গোমুখে যাত্রা করেছিলাম পরদিন। চীরবাসা পেরিয়ে সেই অতিপরিচিত মাতৃগঙ্গার ধারে স্বল্পপরিসর সমতল স্থানটায় বসেছিলাম ভুজগাছগুলোর তলায়। জলধারার এধারে-ওধারে অজস্র অ্যাষ্টর ফুল যেন আমাদের দেখিয়ে বেশী করে ফুটে রয়েছে। মাতৃগঙ্গার উৎসস্থল মাতৃ হিমবাহ। হিমাংশু, বাসব, হিমাদ্রি বিনীত কাঁধ থেকে রুকস্যাক নামিয়ে বেশ আরাম করে বসে পাথরে হেলান দিয়ে। মাতৃগঙ্গার গভীর গিরিখাতের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। দুপাশে উচ্চ খাড়া গিরিশিরা। তার মাঝখান দিয়ে উচ্ছল জলধারা। অবাক হয়ে যাই। এই জলধারাই কি সুদূর অতীতের গিরিগাত্র বেয়ে অবতরণ করতে শুরু করেছিল! কালক্রমে জলস্রোত পাথর ক্ষয়ে ক্ষয়ে এমন গিরিখাতের সৃষ্টি করেছিল?

মাতৃগঙ্গা পেরিয়ে দেখি অজস্র রোডোডেনড্রন ক্যাম্পিণ্যুলাটামের গাছ। গাঙ্গোত্রী

থেকে চীরবাসায় যাবার পথে মাঝে মাঝে দেখেছি দীর্ঘদেহী রোডোডেনড্রন আরবে-বিয়ামের গাছ। ধীরে ধীরে এগিয়ে যাই বৃক্ষসীমা পেরিয়ে। প্রায় হাজারখানেক ফুট নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে ভাগীরথীর জলধারা। তারই দুধারে অসংখ্য ভুজগাছ—বিটুলা ইউটিলিস্। নদীর ওপারে গিরিগাত্র বেয়ে ভূজগাছ যেন এগিয়ে গেছে প্রায় তুষারবৃত গিরিগাত্রের কাছাকাছি। ভৃগুপর্বতের সঞ্চিত বরফ থেকে বেয়ে চলেছে ভৃগুগঙ্গা। ভৃগুগঙ্গার কাছেই সুন্দর বুগিয়াল দেখতে পাওয়া যায়। এপার থেকে সমস্ত অংশই যেন ছবির মতো দেখতে পাই। ধীরে ধীরে ভুজবাসার আগে দেখি সমস্ত উপত্যকা যেন প্রশস্ত হয়েছে। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে অজস্র জিরানিয়াম হালকা গোলাপী রঙের মধ্যে নীল আভাযুক্ত ফুল হলদে রঙের পোটেন্টিলা ফুল আর অজস্র রোডোডেনড্রনের ছোট ছোট গাছ দেখা যায়। রোডোডেনড্রনের মাঝে মাঝে এনাফেলিস আর কম্পোজিটার ফুল। রোডোডেনড্রন গাছগুলোর ছোট ছোট পুরু পাতাগুলো সুগন্ধিযুক্ত। গাছের পাতায় প্রচুর পরিমাণ তৈলরস থাকে। পাহাড়ী মানুষ একে বলে ধূপগাছ। এগুলোর বোটানিক্যাল নাম রোডোড্রেন অ্যাম্বোপোগন। হিমালয়ের প্রায় সর্বত্রই ১২০০০ ফুট উচ্চতা থেকে শুরু করে ১৫০০০ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত পাহাড়ের ঢালে দেখতে পাওয়া যাবে। ফুলগুলো ঈষৎ হলদে আভাযুক্ত, ফুলের কোন গন্ধ নেই। ছোট ছোট গ ছগুলোয় অজস্র ফুল ফুটে থাকে। নাই বা থাকুক ফুলের গন্ধ, গাছের পাতায় পাতায় প্রচুর সুগন্ধ অবশ্য পাকা আপেলের মতো বলে মনে হবে। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি শীতের বরফ গলতেই রোডোডেনড্রন অ্যাম্বোপোগনের ফুল চারদিক যেন আলোকিত করে থাকে। দূর থেকেই গন্ধ পাওয়া যায়। মনে হয় ঠিক যেন পাকা আপেলের মতো। পাকা আপেলের গন্ধ তো আমাদের অতি পরিচিত। সমতলের মানুষরা এ গন্ধ পান ঘরে বসে : আপেল কিনে নিয়ে ঘরে রাখলেই। রোডোডেনড্রন অ্যাম্বোপোগনের গাছ, পাতায় পাতায় সুন্দর গন্ধ। কেমন যেন সামান্য তফাৎ সেই পাকা আপেলের গন্ধের সঙ্গে। সে গন্ধ আমার পরিচিত হলেও, এই উচ্চতায় বসে বসে সর্বক্ষণ যে গন্ধ দেহমনকে ভরিয়ে রাখে, সে গন্ধ তো আপেলের মতো নয়। অন্য কোন কিছুর গন্ধ, যা মর্ত্যের মানুষের কাছে খুবই অপরিচিত অথচ মনোমুগ্ধকর।

ভূজবাসায় সামান্য সময়ের জন্য অবস্থানের পর আমরা সবাই পৌঁছে যাই গোমুখে। বেলা প্রায় দুটো বাজে। প্রখর সূর্যালোকে তাকিয়ে দেখি চারদিকটা, আকাশ গাঢ় নীল, কোথায়ও মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। গোমুখ নিঃসৃত জলধারার পাশে বড় বড় পাথর দিয়ে ঘেরা বেশ কিছুটা সমতল স্থানের ওপরে আমাদের কাঁধের

মালপত্র নামাই। ভুজবাসা ধরের দিক থেকে নেমে এসেছে একটি জলধারা। তার পাশেই ভিজে মাটি আর পাথরের বুকে দেখি অজস্র এপিলোবিয়াম ল্যাটিফোলিয়ামের গাঢ় গোলাপী ফুল। গোমুখের প্রচণ্ড শুষ্ক ঠাণ্ডা হাওয়ায় দেখতে দেখতে শুকিয়ে যেতে চায়। মালবাহকরা এখনও আসতে শুরু করেনি। ওরা এলেই তাঁবু খাটাতে হবে। পাথর সাজিয়ে যায়গাটা পরিষ্কার করে ফেলি। পাথরের পর পাথর সাজিয়ে পুরনো যায়গাটা গুছিয়ে নিই সবাই মিলে। বরেন রান্নার সাজ-সরঞ্জামবাহী মালবাহকদের নিয়ে আসবে প্রথমে। তারপর আর সবাই আসবে ধীরে ধীরে। যেমন করেই হোক আজ বিকেলের মধ্যে এসে যাবে।

ওপরে ভুজবাসা ধরের দীর্ঘ গিরিশিরা। এই গিরিশিরার সমান্তরালে আর একটি গিরিশিরা দেখা যায়। তার গায়ে ছোটখাটো ক্যাম্পিংগ্রাউণ্ড। প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া আড়াল করে রাখে বড় বড় পাথর দিয়ে ঘেরা ক্যাম্পিংগ্রাউণ্ডকে। সারা পথেই এপিলোবিয়াম আর এনোফেলিস। এই স্থানটি আমার খুবই চেনা। গোমুখে এলে সুযোগ পেলেই দু' একদিন গোমুখে অবস্থানের সময় বেড়িয়ে আসতাম ঐ ক্যাম্পিংগ্রাউণ্ডে। দেখতাম, বৎসরান্তে স্থানটিতে এনাফেলিস রয়েলির গাছগুলো আরও বেড়ে গেছে কিনা? সেখানে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে একবার দেখেছিলাম নীল পপির শুকনো গাছ। খুঁজে খুঁজে দেখেছি বেশ অনেকগুলো গাছ। প্রাকবর্ষার ফুল, সেপ্টেম্বরের আগেই ঝরে শুকিয়ে যায়। এইস্থানেই দেখেছি লতানো গাছ…অজস্র ফুল ফুটে রয়েছে। হলদে রঙের এই ফুলগুলো গঙ্গোত্রী উপত্যকায় একটি লিগুমিনাসির বিখ্যাত প্রজাতি। গাছের পাতা ও ডাল নিম পাতার মতই তিক্ত স্বাদযুক্ত। গঙ্গোত্রীতেও এ গাছ আমি দেখেছিলাম।

মালবাহকরা এসে পৌঁছয়নি বলে আমি একা একাই এগিয়ে যাই সেই পুরনো ক্যাম্পিংগ্রাউণ্ডটার দিকে। হিমাংশু, বাসব, হিমাদ্রি, বিনীত…পাথরে হেলান দিয়ে শুয়ে থাকে চড়া রোদের মধ্যে। চড়াই ভেঙ্গে এগিয়ে যাই। পুরনো পথের চিহ্ন আবার এলোমেলো হয়ে গেছে। হয়তো শীতে আর বর্ষায় ধ্বস নেমেছে ওপরের গিরিশিরার ওপর থেকে। তবু স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সামান্য ঘাস জন্মেছে, মাঝে মাঝে দু তিনটে পোটেন্টিলা আর অমর উদ্ভিদ এনাফেলিস। সমস্ত অসমান যায়গাটা দখল করে বসেছে। বেশ সন্তর্পণে আলগা পাথর এড়িয়ে, এগিয়ে যাই ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডটার কাছাকাছি। বেশ অন্যমনস্ক হয়ে যেতে যেতে পৌঁছে গেছি ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডে। বড় একটা পাথরের দিকে তাকাতেই চমকে উঠি। একজন নগ্ন সন্ন্যাসী বসে রয়েছে পাথরের আড়ালে! কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে যাই। সন্ন্যাসীর

একজন সঙ্গীও দেখতে পাই। সন্ন্যাসী দুজনে নিবিষ্ট মনে লিগুমিনাসির সেই বিখ্যাত প্রজাতি সংগ্রহ করে ঝোলায় ভর্তি করছে। দারুণ আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে যাই সন্ন্যাসীর কাছে। সন্ন্যাসীরা আমাকে দেখে যেন অবাক হয়।

আমি জিজ্ঞাসা করি—এগুলো কি গাছ?

সন্ন্যাসী হিন্দিতে বলে—এ গাছ খুবই মূল্যবান দাওয়াই।

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করি—মূল্যবান দাওয়াই?

—হাঁ, এ গাছ খুন সাফা রাখে। (অর্থাৎ রক্ত পরিষ্কার করে)।

আমি বলি—গাছটার নাম কি।

সন্ন্যাসী বলে—এই গাছকে আমরা বলি রুদ্রবন্তী।

—বাঃ! সুন্দর নাম। আমি বলি, এই গাছ কিভাবে খেতে হয়?

সন্ন্যাসী বলে—এই গাছ আমরা শুকিয়ে রেখে দিই যত্ন করে। পরে শুকনো গাছ গুঁড়ো করে দুধের সঙ্গে মিলিয়ে খেতে হয় সাতদিন থেকে একমাস। সকালে আর রাত্রে দিনে দুবার খেতে হয়। সন্ন্যাসীর কাছ থেকে একটা গাছ তুলে নিয়ে ভাল করে লক্ষ্য করি। ছোট ছোট পাতা। একটা পাতা মুখে দিয়ে দেখি··· সত্যই পাতায় তীব্র তিক্তরস। অদ্ভুত ভারতীয় নাম রুদ্রবন্তী। কেউ কেউ বলে রুদ্রবতী বা রুদ্রন্তিকা পরে বাসবের কাছ থেকে পরিচয়পত্র সংগ্রহ করেছিলাম। গাছটির বোটানিক্যাল নাম অ্যাস্ট্রগ্যালাস লিউকো সেফাকালাস (Astragalus Leucocepkalus.) অ্যাস্ট্রাগ্যালসের এই বিখ্যাত প্রজাতি··গঙ্গোত্রী ও পিণ্ডারী উপত্যকায় প্রচুর দেখতে পাওয়া যায় ১০০০০ ফুটের ওপর থেকে। গঙ্গোত্রী থেকে যাত্রা করে গোমুখ পৌঁছনো পর্যন্ত অনেকস্থানেই পথের ধারে লতানো গাছের ডালে অজস্র হলদে রঙের ফুল দেখতে পাওয়া যায়। লতানো গাছ হলেও গাছের ডাল-গুলো বেশ শক্ত। দশ হাজার ফুটের নীচে এই গাছ আমি দেখিনি। উচ্চতা-জনিত পরিবেশে গাছগুলো শিকড়ের দিকটা স্ফীত নয়। গাছের কাণ্ডে, পাতায় তৈলজাতীয় রসও নেই। আস্ট্রাগ্যালাসের ছোট ছোট সীমজাতীয় ফল দেখতে পাওয়া যায়। ফলগুলো পাকলে দেখা যায় গোল চ্যাপ্টা। অনেকটা মুসুর ডালের মতো আকৃতি বিশিষ্ট ফল। শুষ্ক বীজে অবশ্য সামান্য তৈলজাতীয় রস দেখতে পাওয়া যায়। গঙ্গোত্রীতে সারদানন্দজীকে দেখিয়েছিলাম। তাঁর ধারণা এই গাছ অত্যন্ত মূল্যবান ভেষজগুণ যুক্ত। গাছের পাতায়, কাণ্ডে ও বীজে তিক্তগুণই সম্ভবতঃ ভেষজগুণের মূল কারণ। এই তিক্তরস দেহের রক্তে মিশে কিছুটা টনিকের কাজ করে। রক্ত পুষ্ট করে। ক্ষয়রোগ, ত্বকের রোগ ও বাতের উপকারী বলে মনে

হয়। অনেক সাধু সন্ন্যাসী এই গাছের মূলে নিয়ে শুকিয়ে রেখে দেয় যত্ন করে। সারদা নন্দজী বলতেন গাছগুলো নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। হিমালয়ের সর্বত্র বিভিন্ন উচ্চতায় অনেক উদ্ভিজ্জ ছড়িয়ে রয়েছে, সেগুলো আমাদের নানা রোগের উপশম করে। অতীত যুগের ঋষিরা এই সব উদ্ভিজ্জের গুণাগুণ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। সেই অতীত যুগের জ্ঞান আজ লুপ্ত হতে চলেছে।

ভুজবাসা ধরের দিকে আরও চড়াই ভাঙতেই গিরিশিরার গায়ে ১৯৩৫ সনের অডেন সাহেবের চিহ্নিত কেয়ারন্ রয়েছে। শুনেছি, গিরিশিরা অতিক্রম করে ভুজবাসা ধর থেকে রক্তবরণ উপত্যকায় পৌঁছে যাবার মোটামুটি সহজসাধ্য গিরিপথ রয়েছে। কিন্তু গিরিশিরার ওপরে ওঠা সহজ সাধ্য নয়। কারণ সেখানে আল্‌গা পাথর, বালি, নরম মাটি থাকায় সে স্থান দিয়ে ওপরে এগুনো উৎসাহজনক নয়।

গোমুখে থাকতে হবে দু'দিন। কারণ, মালবাহকের সংখ্যা কম, সমস্ত মালপত্র চীর বাসা থেকে একদিনে এসে পৌঁছতে পারবে না। তাই অন্যান্যবারের মতো যথারীতি ট্রান্জিট ক্যাম্প বানাতে হবে। বাসব ও হিমাংশু দুজনেই খুশী। গোমুখের আশে পাশে ঘুরে দেখা যাবে। নানা ধরনের উদ্ভিজ্জ আর কীটপতঙ্গ খুঁজে দেখা যাবে। পরিচয় পাওয়া যাবে সেগুলোর। হিমাংশু আর বাসবের সঙ্গে চলতে বেশ ভালই লাগে। পথ চলার তাড়া নেই, শুধু পথ দেখা। পথ দেখতে দেখতে ঘাস, লতা, পাতা, ফুল আর কীটপতঙ্গের মিছিল দেখা যায়। এ দেখায় অদ্ভুত আনন্দ, অনেকগুলো জীবনের বিচিত্র সমাবেশ। এ আনন্দের সামান্যতম ছিটেফোটা পেয়েই আমি যেন মুগ্ধ হয়ে যাই। ভুজবাসা থেকে গোমুখে আসার পথে হিমাংশু পথের ধারে ঢালের মুখে অজস্র এনাফেলিস রয়েলির গাছ সতেজ পাতা দেখে এগিয়ে গিয়েছিল। সতেজ গাছ, পোকা থাকাই স্বাভাবিক। বাসব হিমাংশুর সঙ্গে সঙ্গে প্রায় শ' ছয়েক ফুট ঢালে অবতরণ করেছিল। আমিও অনুসরণ করেছিলাম ওদের সঙ্গে সঙ্গে। অনেকগুলো এনাফেলিসের তাজা গাছের কাছে বসে কাঁধ থেকে রুকস্যাক নামিয়ে রেখেছিল। তারপর গাছগুলোর পাতা, ডগা ও ফুল তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেছিল হিমাংশু। কয়েকটি গাছের ডগায় কতগুলো পোকা আবিষ্কার করার দারুণ আনন্দ হিমাংশুর রুক স্যাকের ভেতর থেকে ছোট বাক্স বের করেছিল। তার ভেতরে ছোট ছোট শিশি আর শিশির ভেতরে জল মিশ্রিত অ্যালকোহল। আমি তাকিয়ে দেখি। হিমাংশু পোকাগুলো ধরে শিশির ভেতরে পুরে দেয়। পোকাগুলো তরল পদার্থে হাবু ডুবু খেতে খেতে তলিয়ে যায়। হিমাংশু আমার দিকে তাকিয়ে বলে এগুলো বীট্‌ল। কলি অপটেরা গোত্রের এক বিচিত্র প্রজাতি। আমি বলি

এগুলো তো খুবই চেনা। সযত্নে এগুলো দেখেছি, ঘুণ পোকা, গুবড়ে পোকা হিমাংশু বলে—হাঁা, এই কলি অপটেরা গোত্রের বিশাল পরিবার ছড়িয়ে রয়েছে পৃথিবীর জলে-স্থলে। খুবই ক্ষুদ্র থেকে শুরু করে বড় বড় পোকা বিচিত্র গঠন প্রকৃতির, বিচিত্রবর্ণের দেখতে পাবেন পথ চলতে চলতে।

প্রায় তিরিশ চল্লিশটা পোকা খুঁজে খুঁজে পাঁচটা প্রজাতি সংগ্রহ করে হিমাংশু আশ্বস্ত হয়েছিল। গোমুখে আসতে আসতে বলছিল—পৃথিবীতে বীট্‌লের ২.৫০,০০০ টিরও বেশী প্রজাতি দেখতে পাওয়া যায় জলে-স্থলে। তারমধ্যে স্থলভূমিতেই বসবাস করে সবচাইতে বেশী সংখ্যক প্রজাতি। জলে বসবাসকারী প্রজাতির সংখ্যা ৪০০০ এর বেশী। স্থলে ও জলে বসবাসকারী বীট্‌লে প্রজাতিদের মুখ্যত দুভাগে ভাগ করা যায়। এর মধ্যে কিছু সংখ্যক প্রজাতি আমিষ খাদ্য সংগ্রহ করে জীবনধারণ করার জন্য। অবশ্য নিরামিষভোজী প্রজাতির সংখ্যা সব চাইতে বেশী। বীট্‌ল আসলে গুবড়ে পোকা বা জোনাকী পোকা, ঘুন পোকা এই ধরণের কীট। এইগুলোর পাখা আছে উড়ে যাবার মত। তবে পাখা থাকলেও পাখা সহ সমস্ত দেহ শক্ত আবরণ দিয়ে ঢাকা থাকে। এই কঠিন আবরণে নানা রঙের কারুকার্য দেখতে পাওয়া যায়। বীট্‌ল আমরা সমতল ভূমিতে দেখতে পাই প্রচুর সংখ্যক। বিভিন্ন দীর্ঘদেহী বৃক্ষের কঠিন ত্বক্‌ ভেদ করে কতগুলো কীট বাসা বাধে। আমাদের অত্যাবশ্যক চাল, ডাল, গমে ক্ষুদ্রাকৃতি বিশিষ্ট একধরণের বীট্‌ল দেখতে পাওয়া যায়। সে সব বীট্‌ল শুধুমাত্র ডাল খেয়ে জীবন-ধারণ করে। এই সব কীটগুলো শুধুমাত্র উচ্চ জাতের প্রোটিন খেয়েই জীবনধারণ করে। এই সব কীট থেকে উন্নত ধরণের প্রোটিন নিষ্কাশন করা যায় কিনা—এ নিয়ে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন। শুধুমাত্র আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে যে সব বীট্‌ল জীবনযাত্রা নির্বাহ করে থাকে, তাদের মধ্যে টাইগার বীটলের বেশ কয়েকটা প্রজাতি দেখতে পাওয়া যাবে হিমালয়ের বিভিন্ন উচ্চতায়। পাইন, দেওদার, ফার গাছ বসবাস করে পরস্পর পরস্পরের সহায়তায়। বেশ কিছু সংখ্যক নিরামিষভোজী প্রজাতি দেখতে পাওয়া যাবে হিমালয়ের বিভিন্ন উচ্চতার। প্রায় ১৪০০০ ফুট উচ্চতায় হিমবাহের মধ্যে একটি হিমসরোবরে মধ্যে কলি অপটেরার লাভা ঘুরে বেড়াতে দেখেছিলাম। এমনি উচ্চতায় ঘাসের মধ্যে বীট্‌লের দু-তিনটি প্রজাতি দেখেছিলাম। তাদের দেহের শক্ত খোলসের ওপরে মসৃণ রেশমের মত আবরণ দেখতে পাওয়া যায়।

হিমাংশু অবশ্য এফিডের জীবনযাত্রা নিয়েই বেশী চিন্তা করতো। এফিড সমতল

ভূমি থেকে শুরু করে উচ্চ হিমালয়ে দেখতে পাওয়া যায়। গাছের কচি পাতায় পাতায় এরা বসবাস করে, ডিম পাড়ে। এরা কচি পাতার রস সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে। ফলে উদ্ভিদের জীবনযাত্রা ব্যহত হয়। রোগগ্রস্ত হয় উদ্ভিদগুলো। ফুল ফুটলেও অস্পষ্ট, রোগে আক্রান্ত হবার ফলে ফুলগুলো ছোট বা বিকৃত হয়।

বিকেল হতেই চীরবাসা থেকে সব মালবাহক গোমুখে এসে হাজির হয়। শান্ত-স্তব্ধ পরিবেশের মত কতগুলো মানুষ এসে হাসি উচ্ছলতায় ভরে তোলে। সুজন, অমিয় মালবাহকদের নিয়ে আসে সর্বশেষে। তারপর—তাবু খাটানো হয়।

আগেভাগেই আমরা পাথর এনে সুন্দর করে কিচেনকে সাজিয়ে রেখেছিলাম। হাল্কা ত্রিপল দিয়ে ছাউনি বানানো হয়। স্টোভ জ্বালিয়ে চায়ের ব্যবস্থা করে ফেলে। বড় স্টোভ, চা হতেই মগ ভর্তি গরম চা নিয়ে কলরব করতে শুরু করে সবাই। ফণীদা আর সুজল শৌখীন মানুষ। খেতে বসার বা বিশ্রাম নেবার জন্য আগুনের ধারে আরাম করে বসবার ব্যবস্থা করার জন্য আরও দুচারখানা সমান পাথর সাজিয়ে নেয় ফণীদা আর সুজল। ফণীদা হয়তো সুন্দর ফরেষ্ট ডাকবাংলোর স্মৃতি মনে করে আশ্বস্ত হতে চায়। ঘর সাজানোর কাজে সুজল, ফণীদার যেন আদর্শ। আশ্চর্য! এদের কারও ঘরনী নেই। সূর্য পশ্চিম আকাশের দিকে তখনো ঢলে পড়েনি। আমি ঘুরে ফিরে দেখি চারদিকটা। এ অঞ্চল জুড়ে এবার যেন বেশী পরিমাণ এপিলোবিয়ামের ফুল ফুটেছে। গাঢ় গোলাপী রঙের ফুলগুলোয় সূর্যাস্তের লোহিত রঙ পড়েছে। সমস্ত অঞ্চল জুড়ে একটি মাত্র প্রজাপতি এপিলোবিয়াম ল্যাটিফোলিয়াম। বর্ষার ফুল—এপিলোবিয়াম। যেহেতু গোমুখে শীতের বরফ গলতে সময় লেগেছিল, আবার তারমধ্যে বর্ষার তুষারপাত এসে নানা বাধার সৃষ্টি করেছিল। এপিলোবিয়ামকে বাধ্য হয়েই অপেক্ষা করতে হয়েছিল। মাটি, বালি আর গুড়ি গুড়ি পাথরগুলোর তলায় সংগোপনে বসেছিল সময়ের অপেক্ষায়। সময় হয়েছে বলেই আত্মপ্রকাশ। এই সময়ের সঙ্গে আমার সময়ের মিল হল কেমন করে ভাবতেই পারি না। নির্জন স্থানে ফুল ফুটিয়ে চারদিক ভরিয়ে রাখার জন্য তারিফ করা আর সৌন্দর্যে মুগ্ধ করার জন্যই যেন আমাকে ঘর ছেড়ে নিয়ে এসেছে অদৃশ্য আহ্বানে।

গোমুখে এই ফুল আমি বারবারই দেখেছি। এরা আমাকে যেমন চেনে, ঠিক আমিও চিনে রেখেছি। পরিচয় পত্র…গোত্র, পরিবারের কুশল সংবাদ নিয়েছি। সুখ-দুঃখের কথাও অনুভব করেছি ফুলগুলোর পাশে বসে বসে। ওরা কথা বলতে পারে না। বাতাসে মাথা নাড়ে। কেমন যেন নীরব অনুভূতি দিয়েই অনেক

কথা বলে। অনাগ্রেসিয়া গোত্রের অন্যতম পরিবার-এপিলোবিয়াম। সাত থেকে দশটি প্রজাতি দেখতে পাওয়া যাবে হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে। প্রায় ৯০০০ ফুট উচ্চতা থেকে শুরু করে ১৪০০০ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত এই প্রজাতি বসবাস করে। এর মধ্যে নিম্ন অঞ্চলে ১০০০০ ফুট থেকে শুরু করে ১১০০০ ফুট পর্যন্ত উচ্চতায় দেখতে পাওয়া যাবে এপিলোবিয়াম অ্যাংগুষ্টিফোলিয়া নামে এক বিশেষধরনের এপিলোবিয়াম দেখতে পাওয়া যায়। আরও একটি বিশেষধরণের এপিলোবিয়াম দেখতে পাওয়া যায় ৯০০০ ফুট উচ্চতায় ঝরণার ধারে বা ভিজে মাটির বুকে। এই গাছগুলো খুবই ছোট, ফুলগুলোও খুবই ছোট ছোট। সুদৃশ্য বড় বড় ফুলযুক্ত এপিলোবিয়াম ল্যাটিফোলিয়ামের সঙ্গে দেখা করতে হলে যেতে হবে ১২০০০ ফুট উচ্চতায়। সেখান থেকে ১৪০০০ ফুট উচ্চতায় মোরেনের পাথরগুলোর ধারে ধারে দেখা হবে। গাঢ় গোলাপী ফুল, পাথরগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ফুলগুলো দেখে অবাক হতে হবে। শক্ত পাথর থেকে সমস্ত শক্তি অর্জন করে সামান্যতম রস সংগ্রহ করে এপিলোবিয়ামের শক্ত মূল অনেক দূর পর্যন্ত প্রবেশ করিয়ে দেয়। এপিলোবিয়াম ল্যাটিফোলিয়ামের ফুল ফুটে অবিকৃত অবস্থায় থাকে দু-তিন দিন। তারপর শুকিয়ে ঝরে পড়ে। ফল পুষ্ট হয় মাসখানেকের মধ্যে। সুপক্ব ফল স্ফোটকজাতীয়। ফল ফেটে বীজ ছিটকে ওঠে উঁচুতে। তখন বীজের সঙ্গে যুক্ত তুলোর মতো দীর্ঘ আশ্ বাতাসে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায় অনেক দূরে। ভিজে মাটি বা গুঁড়ি গুঁড়ি পাথরের বুকে আটকে যায়। তারপর শীতের বরফে চাপা পড়ে থাকে প্রায় মাস ছয়েক। শীতের বরফ গলতে না গলতেই বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয়। গাছগুলো পুষ্ট হতেই অজস্র কুঁড়ি দেখা দেয়। ফুল ফোটে অজস্র।

এপিলোবিয়ামের গাছ দু'ফুট থেকে শুরু করে তিন ফুট দীর্ঘ হয়। অবশ্য উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই গাছগুলো ছোট হতে থাকে। ফুলের সংখ্যা কমে গেলেও ফুলের আকৃতি ছোট হয় না। এপিলোবিয়ামের সূক্ষ্ম মূল পাথরের ফাটলের ভেতরে প্রবেশ করায় সামান্য শিশির বা চুইয়ে পড়া জলের স্পর্শ পায়। তারপর বাতাস, রোদ, তুষারপাত, এমনি তাপের তারতম্যের ফলে পাথর ফেটে যায়। এইসব ফেটে যাওয়া পাথরগুলো তখন এপিলোবিয়ামের শিকড়গুলো আকড়ে ধরে। ফলে-শিকড়গুলোর শাখা-প্রশাখা পাথরগুলোর ফাটলের গভীরে প্রবেশ করতে চেষ্টা করে। এমনি করে শক্ত পাথর ফাটিয়ে গুঁড়ি গুঁড়ি পাথর, সর্বশেষে মৃত্তিকায় পর্যবেশিত করে এপিলোবিয়াম মনোমত পরিবেশ সৃষ্টি করে। তবে কার্যে সহায়তা করে জল, শিশিরকণা আর তুষার কণা।

গোমুখে কয়েকবার যাবার ফলে পরিচিত যায়গা খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। যে সব স্থানে বড় বড় পাথরের কাটলে স্বল্পসংখ্যক এপিলোবিয়াম ল্যাটিফোলিয়াম গাছ দেখেছিলাম, এবার যেন চিনতেই পারি না। সেইসব কঠিন পাথরের স্তূপ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে বালি মিশ্রিত মৃত্তিকায় পরিণত হয়েছে। আর সেইসব মৃত্তিকার এক পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ক্ষীণ জলধারা। জলধারার পাশ দিয়েই অজস্র এপিলোবিয়াম ল্যাটিফোলিয়ামের ফুল ফুটে রয়েছে।

এতফুল দেখে হিমাংশু তেমন খুশী হয় না। কারণ, গাছগুলোয় অজস্র ফুল থাকলেও পাতার সংখ্যা খুবই কম। পাতার সংখ্যা খুবই সীমিত · তাই পোকা এসে বাসা বাঁধতে পারেনি। ফুলের পাপড়িগুলোয় কোথাও দেখা যায় না পোকা। ১৯৬৬ সনের পর ১৯৭২ সন পর্যন্ত প্রায় প্রতিবারই এসেছিলাম গোমুখে। ১৯৬৬ সনের দেখা মাত্র গুটিকয়েক ফুল দেখে আশ মেটেনি। ১৯৬৭ সনে দেখেছিলাম এই গাছ। এক বছর পরই এপিলোবিয়াম বেশ বড় ধরনের কলোনী স্থাপন করেছে। পাঁচ বছর পর দেখি অনেক পরিবর্তন। আবহাওয়ার পরিবর্তন, পরিবেশেরও পরিবর্তন হয়েছে। অনেক পাথর ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গুঁড়ি গুঁড়ি হয়েছে। সেই গুঁড়ি গুঁড়ি পাথরগুলো আরো ভেঙ্গে বালুকণায় পরিণত হয়েছে। তারপর শীতাতপ আর ঝরণার জলে স্নান করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা পরিণত হয়েছে মৃত্তিকায়। এপিলোরিয়াম ল্যাটিফোলিয়ামের মৃত্তিকা সৃষ্টির দীর্ঘ তপস্যা হয়েছে সার্থক। মুগ্ধ হয়ে দেখি সাধনার ফলশ্রুতি···অসংখ্য এপিলোবিয়ামের গাঢ় গোলাপী ফুল।

১৯৬৬ সনে কয়েক দিনের জন্য অবস্থান করেছিলাম ভূজবাসায়, লালবিহারীর ছোট আশ্রয়ে। গোমুখের তীর্থযাত্রীর সংখ্যা নগন্য। তারা কোনরকমে ভূজবাসায় রাত্রিবাস করে গোমুখ দর্শন করে চলে যেতো। আমরা তীর্থযাত্রী নই। আমি, হিমাদ্রি, সুজল আর বরেণ—লালবিহারীর ঘরের অদূরেই ছোট কুটিরে আশ্রয় নিয়েছিলাম। পাথরের পর পাথর সাজিয়ে ভূজগাছের ডালপালায় ছাওয়া কুটির। আমরা চারজন থাকতাম সেখানে। সকালে রান্না-খাওয়া শেষ করেই বেড়িয়ে পড়তাম। সারাদিন গোমুখ আর গোমুখ পেরিয়ে যেতাম ভূজবাসাধরের কাছে। শিবলিঙ পর্বত, ভাগীরথী পর্বতমালা, খরচাকুণ্ড, কেদারনাথ পর্বতমালা দেখতাম গঙ্গোত্রী হিমবাহের মোরেন অনুসরণ করে এগিয়ে গিয়ে। কোন কোন দিন সুজল, হিমাদ্রি, বরেণ এক সঙ্গে এগিয়ে যেতো। আমি অপেক্ষা করতাম গোমুখে। গোমুখের কাছে হঠাৎ একদিন অবাক হয়ে দেখি অদ্ভুত ফুল। ঠিক ছোট সূর্যমুখী

ফুল, তবে মাথা নত হয়েছে মাটির দিকে। সূর্যের প্রখর কিরণেও সে ফুল মুখ তুলতে দেখিনি। সূর্যাস্তের সময়ও ফুল ঠিক তেমনি লজ্জাবনত। পরিচয়পত্র সংগ্রহ করেছিলাম বোটানিষ্ট বন্ধুর কাছ থেকে। কম্পোজিটা গোত্রের ছোট্ট পরিবার···নাম ক্রিম্যাস্থোডিয়াম। সেদিন ঘুরে ঘুরে মাত্র দুটি প্রজাতি দেখেছিলাম। একটি তো খুবই ছোট ফুল, অপরটি বড়। ফুল সংগ্রহ করিনি সংরক্ষণের জন্য। প্রজাতির পরিচয়ও জানতে পারিনি। কিন্তু এমন এক সুন্দর ফুল দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলাম বৈকি! গোমুখে বসে বসে একা একাই সময় কাটিয়েছি। যেন এক অদ্ভুত কিছু আবিষ্কার করেছি। গাড়োয়াল হিমালয়ে ভাগীরথী উৎস মুখে এমন বিস্ময়কর ফুল হয়তো আমিই প্রথম দেখেছি। যেন সম্পূর্ণ নতুন প্রজাতি, ছোট ছোট গাছ মাত্র ইঞ্চি কয়েক দীর্ঘ। ছোট গাছের ডগায় ডগায় মাত্র গুটিকয়েক ফুল। ছোট জলধারার সামান্য দূরে ভিজে মাটির বুকে গুটিকয়েক ফুল—নাম ক্রিম্যাস্থোডিয়াম নডিং সান ফ্লাওয়ার। অপর প্রজাতিটি সামান্য দূরে—বড় বড় কতগুলো পাথর দিয়ে ঘেরা দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মাঝখানে কয়েকটি গাছ। সব গাছেই ফুল ফুটেছিল। যেন প্রাচীরে ঘেরা অন্তঃপুরের মাঝখানে ক্রিম্যাস্থো-ডিয়ামের কমলা রঙের ফুলগুলো ফুটেছিল সবার অলক্ষে। আমার শিকারী দৃষ্টি দেখে বুঝি ভয়ে জড়সড়। বসেছিলাম পাথরের ওপরে। পরদিনও কেমন যেন নেশাগ্রস্ত হয়ে আবার বসে বসে দেখেছি সারাদিন। দু' দিনেও ফুলগুলোর রক্তম্লান হয়নি। প্রচণ্ড রৌদ্রতাপেও শুকিয়ে যায়নি কোমল পাপড়িগুলো। পরে বুঝতে পেরেছি, ফুলগুলো যে কখনো সূর্যের দিকে তাকায় না। সূর্যের কিরণ আর তাপ এসে জমতে থাকে মাটির বুকে। ক্ষীণ জলধারায় সিক্ত মাটি, এমন এক সুন্দর পরিবেশের মধ্যে ক্রিম্যাস্থোডিয়াম অপরূপ হয়ে ওঠে।

যে ক'দিন ভূর্জবাসায় অবস্থান করেছিলাম প্রতিদিনই যেতাম গোমুখ। পাথর-গুলোর কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম গতকালের কুঁড়ি কটা ফুটে উঠেছে কিনা? দেখতে দেখতে কখন যেন বসে পড়তাম আর ভাবতাম। ভাবতাম ফুলগুলোর কথা, জন্ম ও মৃত্যুর কথা। ফুলগুলোও কি কিছু বলতো না। হয়তো বা বলতো—

ধন্য আমি মাটির পরে
জন্ম নিয়েছি ধূলিতে···

ফুল ফুটে উঠা—উচ্চ হিমালয়ে এক সাধনার ফলস্বরূপ। বর্ষার তুষারপাত এসে উপত্যকাকে যখন ঢেকে রাখে, তখন নতমুখী ক্রিম্যাস্থোডিয়ামের দুঃখবেদনা বরণ হয়ে নীল হয়ে যায়। তারপর শীত এসে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চায়। শীতের পর

গ্রীষ্মের সাড়া পেয়ে আবার জেগে ওঠে। ঠিক এক বছর পর এমনি সময় এসেছিলাম গোমুখ। কাঁধ থেকে রুকস্যাক নামিয়েই এগিয়ে গিয়েছিলাম সেই পুরনো যায়গায়। কিন্তু আর চিনতে পারিনি। একটি শীত এসে ধ্বস নামিয়েছিল, বর্ষার অত্যাচারে বড় বড় পাথর সব ভেঙ্গে গুড়িয়ে গিয়েছিল। গত বছরের চিহ্নিত স্থানগুলো অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। কোথায়, কোন গভীরে যেন হারিয়ে গিয়েছে গাছের মূল। বীজ হয়তো বা বাতাসে উড়ে গিয়েছে কোথায় জানি না। তারপর প্রতি বছরই দেখেছি গোমুখ। খুঁজে বেড়িয়েছি কিন্তু হারানো ফুলের সন্ধান পাইনি গোমুখে।

দিন কেটে যায়। গোমুখ থেকে রক্তবরণ যেতে হবে। সমস্ত মালপত্র পুনরায় প্যাক করতে হবে। ওজন করে সব মাল সমান সমান ভাগে ভাগ করতে হবে। এ ব্যাপারে অসিতদা, সুজল আর হিমাদ্রি বেশ ওস্তাদ। বিনীত এসেও সাহায্য করে। কিচেন দেখাশুনার দায়িত্ব বরেণের। অমিয় অবশ্য মালবাহকদের দেখাশুনা করছিল। দলের ডাক্তার অমিতাভদা। হিমাংশুর নিয়ে আসা কয়েক ডজন কবুতর দেখতে ব্যস্ত তিনি। আমাদের সবাইকে দেখে অমিতাভদা বলেন—তোমরা তো সবাই ভাল আছো। সবারই তো দেখছি ক্ষিধে বেড়েছে···রাত হতেই সবাইকে দেখি নির্বিবাদে ঘুমোতে। সকালেই জলখাবার খেয়ে হিমাংশু আমাকে বলে—চলুন, অডেন সাহেবের সেই চিহ্নিত কেয়ারণ দেখে আসি।

বাসব উৎসাহের সঙ্গে বলে—আমিও যাবো।

—আর কেউ যাবে না? হিমাংশু বলে।

আমি, হিমাংশু আর বাসব—এই তিনজনেই চলি। ভুজবাসাধরের গিরিশিরার দিকে এগুতে থাকি। গুড়িগুড়ি পাথর, বালি, মাঝে মাঝে বড় বড় পাথর। সুদূর অতীতে এই অংশ হিমবাহের মধ্যে ছিল। হিমবাহ পিছিয়ে যাবার ফলে ভূপ্রকৃতির পরিষ্কার চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। অডেন সাহেব এই অংশে বরফাবৃত হিমবাহ দেখেছিলেন ১৯৩৫ সনে, আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী কালের কথা। গঙ্গোত্রী হিমবাহের স্নাউট ছিল এইস্থানে। হিমবাহ পিছিয়ে যাবার ফলে পাথর আর বালি মিশ্রিত স্থানগুলো উদ্ভিজ্জের স্বর্গরাজ্যে রূপান্তরিত হতে চলেছে। এনাফেলিসের অনেকগুলো গাছ—এপিলোবিয়াম ল্যাটিফোলিয়ামের বিশাল কলোনীর সৃষ্টি হয়েছে। চলতে চলতে বাসব এপিলোবিয়ামের গাছগুলোর সজীবতা লক্ষ্য করে বলে—এপিলোবিয়ামের গাছগুলো সুস্থ, সবল ও সজীব হয়ে অজস্র ফুল ফোটাতে হলে প্রচুর জলের জোগান দিতে হয়। নরম মাটি, জলাভূমি, বড় বড়

পাথরের ফাঁকে ফাঁকে এরা বসবাস করতে শুরু করে। দু-তিন বছর পর দেখা যাবে সমস্ত বড় বড় পাথরগুলো ফাটিয়ে এপিলোবিয়ামের শিকড়গুলো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। তুষারকণা, কুয়াশা আর প্রখর সূর্যকিরণ—তাপমাত্রার বৈষম্য এপিলোবিয়ামের জীবনযুদ্ধের সব চাইতে শক্তিশালী হাতিয়ার।

পথ চলতে চলতে বাসব থমকে দাঁড়ায়। আমার দিকে তাকিয়ে বলে—দেখুন, বড় বড় পাথরের সামান্য ফাটলের মুখে এপিলোবিয়ামের মাত্র একটা গাছ জন্মলাভ করেছে। এই পাথরখণ্ডকে গুড়ো গুড়ো করার কাজ শুরু হয়ে গেছে। প্রকৃতিদেবী পরম সহায়। মাঝে মাঝে গাঢ় কুয়াশার চাদর বিছিয়ে দেয়, রাতের শিশির কণা··· পাথরের ফাটলের আশ্রয় নেয়। পাথর ভাঙ্গার কাজে স্বয়ং প্রকৃতিদেবীই যেন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। এগুতে এগুতে দেখি গুড়িগুড়ি পাথরের বুকে অজস্র এপিলোবিয়াম। ফুল ফুটিয়ে কি অপরিসীম আনন্দ। বাসব খুঁজে খুঁজে আবিষ্কার করে। আমাকে ডেকে এনে বলে—শুনতে পাচ্ছেন কিছু?

—কি বলতো?

—শব্দ শুনতে পাচ্ছেন না? কেমন মৃদু কল কল শব্দ?

—তাইতো। পাথরগুলোর তলদেশ থেকে অন্তশীলা জলধারার শব্দ শুনতে পাই।

বাসব বলে—এই দেখুন, পাথরগুলোর তলা দিয়ে বয়ে চলেছে জলধারা। এই জলধারাই এপিলোবিয়ামের জীবনযাত্রা অব্যাহত রেখেছে।

অজস্র এপিলোবিয়ামের গাছ, আর তার কচি পাতা দেখে হিমাংশু বসে পড়ে পাথরগুলোর ওপরে। গাছের পাতায় পাতায় অজস্র সতেজ এফিড। পকেট থেকে ম্যাগ্নিফাইটিং গ্লাস নিয়ে দেখতে শুরু করে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে দেখে আর আমাকে দেখায়। খেয়ে-দেয়ে এফিডগুলো বেশ মোটাসোটা হয়েছে। চোখ দুটো কালো টলটলে। পেট মোটা।

হিমাংশু বলে—এই ব্যাটারা নিম্ন-উপত্যকা থেকে কেমন করে উচ্চ উপত্যকায় আসে, জানি না। শীতে হিমালয়ের উচ্চ উপত্যকায় এই কীটগুলোর দেহে কি প্রতিক্রিয়া হয়, জানা যায় না। হিমাংশুর কথা শুনে বুঝতে পারি কয়েক বছর আগে উচ্চ হিমালয় ভ্রমণ করার সময় এফিডের অনেকগুলো প্রজাতি সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করেছিল। ছবি তুলছিল।

হিমাংশুকে বলি—বজবজে আমার বাসায় জবা গাছের ডগায় ডগায় ফুলের কুঁড়ির গায়ে অজস্র এফিড দেখেছি জুন-জুলাই মাসে। এই এফিডগুলোর বাসায় দেখতাম অজস্র লাল পিঁপড়ে। এইসব পিঁপড়ে কিন্তু এফিডের ডিম বা ছোট ছোট বাচ্চা

গুলোকে খেতে দেখিনি। পিঁপড়েগুলো এফিডের কাছ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে! এফিডের চারধারে দেখেছি লাল পিঁপড়ের ভিড়। ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস দিয়ে লক্ষ্য করে দেখেছি লাল পিঁপড়েগুলোকে এফিডের মুখ থেকে রস সংগ্রহ করতে।

বাসব এবং হিমাংশুর গাছ আর কীট পতঙ্গ দেখা এবং তা সংগ্রহ করতে করতে সময় কেটে যায় দ্রুতবেগে। ইতিমধ্যে নিম্ন-উপত্যকা থেকে গাঢ় মেঘ আসতে শুরু করে। তুষারপাত হতে পারে। অডেনের কেয়ারণ আর দেখার সুযোগ হয় না। বাধ্য হয়েই অবতরণ করতে হয়।

খুব সকালে সূর্য ওঠে। তাঁবুর সামনে অনেকগুলো পাখী বসে রয়েছে। পশ্চিম আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। ভাগীরথী পর্বতমালার ওপরে দেখি লাল রঙের আভা। তারপর দেখি সূর্যের মুখ। গোমুখ থেকে যাত্রা শুরু করি সকালবেলায়। মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে একদল মালবাহকও তৈরী হয়ে যায়। ওরাও যাবে আমাদের সঙ্গে। আমার ইচ্ছে ছিল হিমাংশু আর বাসবের সঙ্গে চলবো। বাসব ফুলের নমুনা সংগ্রহ করবে আর হিমাংশু সংগ্রহ করবে কীটপতঙ্গ। যে গাছ থেকে ফুল সংগৃহীত হবে সেই গাছ থেকেই সংগ্রহ করবে কীটপতঙ্গ। Ecologyo-র কিছু কিছু তথ্যও সংগৃহীত হবে পথ চলতে চলতে। আমার সব ইচ্ছে আর উৎসাহ বানচাল হয়ে যায়। করুণা, অমিয় ও সুজলের সঙ্গে আমাকে রওনা হতে হল। আমরা আগে গিয়ে রক্তবরণে শিবির স্থাপন করবো। আমাদের মালপত্র রেখে অধিকাংশ মালবাহকরাই চলে যাবে গোমুখ। পরদিন সমস্ত মালপত্র নিয়ে সবাই আসবে রক্তবরণ উপত্যকায়। অমিয় ও সুজল এক সঙ্গে চলে মালবাহকদের নিয়ে। ওরা বেশ দ্রুতই চলে। অমিয় একটু দুঃসাহসী। সহজ স্বাভাবিক পথের রেখা ছেড়ে দিয়ে ওরা কিছুটা কঠিন ও বিপজ্জনক পথ দিয়ে চলতে চায়। সুজল অবশ্য তা নয়। সে ধীর-স্থির, পথের গুরুত্ব উপলব্ধি করেই চলতে থাকে। করুণার সঙ্গে আমিও ধীরে ধীরে চলি! ওর সঙ্গে হিমাদ্রির চলার ছন্দ আর গতির বেশ মিল রয়েছে। তবে হিমাদ্রির চলার সুন্দর স্বচ্ছন্দভঙ্গী, নির্ভরশীলতা আমার খুব ভাল লাগে। কিন্তু নানা প্রয়োজনে হিমাদ্রিকে থাকতে হল গোমুখে। ভূজবাসাধরের গা ঘেঁষে ঘেঁষে আমরা এগিয়ে চলি গ্রাবরেখার বড় বড় পাথরের ঢাল এড়িয়ে। সর্বশেষে ভূজবাসাধরের বাঁকের মুখে অবতরণ করতে হয় প্রায় সাত-আটশ ফুট নীচে নড়বড়ে পাথরের ঢাল বেয়ে। সাবধানে চলতে হয়, শুধু পাথর আর পাথর; সব পাথরই আলগা। অসতর্ক হয়ে পা ফেললেই পাথর গড়াতে শুরু করে। এমনি

করে দেহের ভারসাম্য বজায় রেখে পৌঁছে যাই কালীগঙ্গার জলধারার কাছে। স্থানটি হয়তো অতীতের রক্তবরণ, চতুরঙ্গী আর গঙ্গোত্রী হিমবাহের সঙ্গমস্থল। রক্তবরণ আর চতুরঙ্গী হিমবাহ দ্রুত পিছিয়ে যাবার ফলে বেশ প্রশস্ত সমতলভূমির সৃষ্টি হয়েছে।

কালীগঙ্গার ধারা অনুসরণ করতে করতে এগুতে থাকি চড়াই ভেঙ্গে। চড়াইয়ের মুখটায় বালি আর গুড়োগুড়ো পাথর। সেখানে কোনরূপ উদ্ভিজ্জের উপস্থিত নেই। কালীগঙ্গার জলধারার কোন রঙ নেই···নামকরণের কারণও জানি না। রক্তবরণ উপত্যকায় উঠেই অবাক হয়ে যাই। সামনেই অমিয়, সুজল বসেছে পোর্টারদের সঙ্গে।

সুজল বলে—দেখেছেন, রক্তবরণ হিমবাহের স্নাউট কি অপূর্ব দেখতে, এমন সুন্দর বরফের গুহা! এটাই সত্যিকারের গোমুখ।

আমি বলি—হ্যাঁ, প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা "যমুনোত্তরী হতে গোমুখ" বইয়ে গোমুখ পেরিয়ে আরো একটা গোমুখের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন ঐটিই সত্যিকারের গোমুখ।

সুজল বলে—হ্যাঁ, পড়েছি বইয়ে।

—তবে প্রমোদবাবুর বইয়ে সেই গোমুখের ছবি যেমন এঁকেছেন, এর সঙ্গে তার মিল নেই কিন্তু! তবে ভ্রমণের সময়কাল চিন্তা করলে স্থানের সামান্য পরিবর্তন হওয়া সম্ভব। সুজল ও অমিয় রক্তবরণ হিমবাহের স্নাউট দেখে। তারপর পোর্টারদের নিয়ে এগিয়ে চলে! রক্তবরণ হিমবাহ দ্রুত সঙ্কুচিত হয়েছে। ফলে এই আশ্চর্য হিমবাহ উপত্যকার সৃষ্টি হয়েছে। এই উপত্যকার কোন নাম নেই। নন্দনবন, নন্দনকানন, তপোবন এসব নামকরণের ইতিহাস অবশ্য আমি জানি না। এ নাম হয়েছিল কতকাল পূর্বে সে তথ্যও জানা সম্ভব নয়। দুঃসাহসী স্থানীয় অধিবাসীরাই ভেড়া-বক্‌রি নিয়ে এই পথে আসতো। তারা এইসব সুন্দর উপত্যকায় রাত্রিবাস করতো। সুদূর অতীতে দুঃসাহসী তীর্থযাত্রী, সাধু-সন্ন্যাসীরা এই পথ দিয়ে চলার সময় ফুলে ফুলে সমৃদ্ধ উপত্যকার নামকরণ করেছিলেন। বায়ু-পুরাণে উচ্চ হিমালয়ে ও তিব্বতের মালভূমিতে কতগুলো উপত্যকায় সুদৃশ্য সরোবরের উল্লেখ করা হয়েছে। এইসব সরোবরের পাশেই রয়েছে মনোরম কানন। এইসব কাননগুলোর নাম নন্দনকানন, চিত্ররথ, বিশোক, বৈভ্রাজবন, সরভুবন। এই সব কাননগুলোর অবস্থান ছিল হিমালয়ের বিভিন্ন অংশে, কৈলাস পর্বতমালার নিকটবর্তী অঞ্চলে। পৌরাণিক ভূগোলের ভূগোল-তত্ত্ববিদ্‌গণ হয়তো ছিলেন সে যুগের মুনি ঋষিগণ। তাঁরা হয়তো কৈলাস পর্বতমালা বিশাল হিমালয় পর্বতমালার অন্তর্গত

বলে মনে করতেন। তাঁদের বর্ণনা, পথ চিহ্নিত করণের পদ্ধতি হারিয়ে গিয়েছে। আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না, সেই হারিয়ে যাওয়া স্বর্গোদ্যানের পথের হদিশ।

রক্তবরণ উপত্যকার এমন সুন্দর পরিবেশ না দেখলে কখনই বিশ্বাস করা যায় না। সে যুগে এই উপত্যকা হয়তো তুষারাবৃত হিমবাহ। কিন্তু হিমবাহের প্রান্তিক গ্রাব-রেখার ধারে ধারে সুউচ্চ গিরিশিরার গায়ে নিশ্চয়ই উদ্ভিজ্জের সংস্থান ছিল। পরবর্তীকালে হিমবাহ সঙ্কুচিত হতেই উপত্যকা প্রসারিত হয়েছে। রক্তবরণ উপত্যকার শুরুতেই চোখে পড়ে ছোট্ট জলধারা। সেই জলধারায় সিক্ত মাটি আর পাথরের ওপর দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে বড় বড় পাথরের ওপরে কাঁধ থেকে রুকস্যাক নামিয়ে রাখি আমি আর করুণা। বাছাই করা দুটো পাথরের ওপরে বসি দুজনে।

করুণা একটা চুরুট বের করে নেয়। তারপর চারদিকটা দেখতে দেখতে মুখ ভর্তি ধোঁয়া ছাড়তে থাকে। জলধারার কাছেই ফুলের সন্ধানে খুঁজে বেড়াই। এমন সুন্দর পরিবেশের মধ্যেই তো জেনসিয়ানা টিপিটাটা বাসা বাঁধে। তার কাছাকাছিই পোলাইগোনাম থাকা উচিত। কারণ, এই দুটি ফুলকে সহাবস্থান করতে দেখেছিলাম অন্য উপত্যকায়। ভালভাবে চোখ মেলে দেখতে দেখতে হঠাৎ যেন থমকে দাঁড়াই— এইতো সেই পোলাইগোনাম! হাল্কা গোলাপী ফুল, পাতা খুবই কম সংখ্যক। লম্বা শীষ উঠে ফুলগুলো ফুটেছে ছোট ছোট থোকা হয়ে। জেনসিয়ানা তো এমনি পরিবেশেই দেখতে পাওয়া যায়! আমি যেন পোলাইগোলামের গভীর অরণ্যের মাঝখানে দিশেহারা হয়ে খুঁজে বেড়াই শিকার। করুণার চুরুট প্রায় শেষ হতে চলে। আমি ভাবি, এই জলধারা কেমন এঁকে-বেঁকে একটু ঢালু হয়ে মিশেছে কালীগঙ্গায়। সেখানেই হয়তো জেনসিয়ানার পুরনো কলোনী দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু সে তো অনেক দূরে! সেখানে যাওয়ার মতো সময় কোথায়? আমি জানি, অকারণের পথই মানুষকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। সময় যেন দ্রুতবেগে কেটে যায়। সূর্যের তেজ যেন নিস্তেজ হতে থাকে। বেলা দেড়টা বাজে। নীল আকাশের বুকে পাল তোলা নৌকোর মতো সাদা টুকরো টুকরো মেঘ ছুটে চলেছে উত্তর সীমান্তে। এই সব অশান্ত মেঘ মাঝে মাঝে জড়ো হয়ে সূর্যদেবকে ঢেকে রাখতে চাইছে ক্ষণিকের জন্য। করুণার চোখ দুটো চঞ্চল হয়ে ওঠে। ঐ টুকরো টুকরো মেঘ বলেই ওরা দুর্বল। ওরা একসঙ্গে সঞ্চিত হলেই শক্তিমান হয়ে উঠবে! তখন ঝড়ে পড়তে শুরু করবে তুষার হয়ে, তখন ঐ মেঘকে মদত দেবে ঝোড়ো হাওয়া প্রকৃতি বিক্ষুব্ধ হয়ে। স্বল্প সময়ের জন্য হলে অবশ্য চিন্তার কোন কারণ নেই। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হলেই ভয়। অমিয় আর সুজল পোর্টারদের নিয়ে সামান্য সময় আগে চলে গিয়েছে।

জানি না, আমাদের শিবিরের স্থান আর কত দূরে। কাছে হলে হয়তো ওরা তাঁবু খাটিয়ে ফেলবে। আবহাওয়ার পরিবর্তন লক্ষ্য করে করুণা উঠে পড়ে। আমিও তাকে অনুসরণ করতে থাকি। সামান্য সহনশীল চড়াই পেরিয়ে এগিয়ে চলি আরো। সামনেই আর একটা জলধারার কাছে এসে থমকে দাঁড়াই। এই ধারাটি এসেছে সোজা উত্তরদিকের থেলু বামাক থেকে। জলধারাটি সোজা উত্তরদিক থেকে এসে পশ্চিম-দক্ষিণের মোড় ঘুরে উপত্যকার বুকের ওপরে বেশ গভীর গিরিখাতের সৃষ্টি করেছে। তারপর ঢালু পথ বেয়ে নেমে এসে মিলিত হয়েছে কালীগঙ্গার সঙ্গে। সম্ভবতঃ এই জলধারার জন্যই সমস্ত উপত্যকা সরস হয়ে সুন্দর উদ্ভিজ্জ মণ্ডলের সৃষ্টি করেছে। ধারার পাশেই দেখি পোটেন্টিলার ছোটখাটো বেড। আরো কিছু পথ এগিয়ে যেতেই থমকে দাঁড়াই, সেই বহু প্রতীক্ষিত জেনসিয়ানা স্টিপিটাটা দেখে। দুচোখ দিয়ে দেখেও যেন বিশ্বাস করতে পারি না। এ যে অদ্ভুত জেনসিয়না, বেশ বড় বড় ফুল। তবে ফুলের রঙ নীল নয়, ধব্‌ধবে সাদা রঙের জেনসিয়ানা। কাঁধ থেকে রুক্‌স্যাক নামিয়ে বসে পড়ি। করুণা আমার দিকে তাকিয়েই হক্‌চকিয়ে যায়।

—কি হলো তোমার? বসবে এখানে?

—হাঁ, একটু বসি।

করুণা বলে—আমরা হয়তো কাছাকাছি এসে গেছি। দেখছো না, উপত্যকার একটা দিকে উচ্চ গিরিশিরা। ঠিক প্রাচীরের মতো সমস্ত উপত্যকা যেন তিন দিকটাই ঘিরে রেখেছে।

আমি খুব কাছে এগিয়ে যাই। এই অদ্ভুত সাদা রঙের জেনসিয়ানা তো কোথায়ও দেখিনি। মাত্র কয়েকটি গাছ. গাছগুলোয় গুটিকয়েক ফুল ফুটে রয়েছে। তাতে অজস্র কুঁড়ি। এগুলো সবই ফুটে যাবে। এ যেন অবিশ্বাস্য! লোভ হচ্ছিল তুলে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে। কিন্তু আবার ভাবলাম, কি করবো ফুলগুলো তুলে নিয়ে! সংরক্ষণের কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে! এমন এক অদ্ভুত উত্তেজনা আর অস্বস্তি। ধীরে ধীরে কয়েকটি পাথর সংগ্রহ করে সাজিয়ে রাখি চিহ্ন হিসেবে। আগামীকাল বাসব আর হিমাংশু আসবে অন্যান্য সবাইকে নিয়ে। ওরা দেখবে এবং জেনসিয়ানার সঙ্গে নতুন করে পরিচয় ঘটবে। এর মধ্যে স্বর্গের মেঘ নেমে আসতে শুরু করেছে। হিমশীতল বাতাসে ভর করে নেমে আসবে। সত্যি সত্যি তাকিয়ে দেখি সূর্যদেব ঢাকা পড়ে গিয়েছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা নেমে পড়ায় বুঝতে পারি, এবার তুষারপাত শুরু হবে। করুণা চঞ্চল হয়ে ওঠে। আর দেরী নয়, চলো এবার।

দ্রুত পা চালিয়ে যেতে শুরু করি আমি আর করুণা। আমাদের ক্যাম্পসাইট

হয়তো কাছেই। খারাপ আবহাওয়ার জন্য তুষারপাত শুরু হলে নানারকম খারাপ উপসর্গ দেখা দিতে পারে। আমার কিন্তু তাড়া নেই, আবছা আলোয় হিমশীতল বাতাসের উৎপাত ভুলে গিয়েছি। সাদা জেনসিয়ানা দেখতে পেয়ে আমার মন ভরে গিয়েছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক পথ চলার পর তাঁবুর কাছে পৌঁছে যাই। এই সময়ের মধ্যে এক পশলা বৃষ্টির মতো তুষারপাত হয়ে যায়। প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়ার আক্রমণে বিপর্যস্ত মেঘ ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে পালাতে সোজা চলে যায় উত্তরে। যেদিকে তিব্বতের মালভূমি। মেঘ সরে যেতেই সূর্যের কিরণ ছড়িয়ে পড়তে থাকে চারদিকে। তবে সে সূর্যের তেমন তেজ নেই। অন্ধকার পালিয়ে গিয়েছে। সমস্ত উপত্যকা আলোয় ঝলমলিয়ে ওঠে। চারপাশে শুধু অজস্র জিরানিয়াম ফুল ফুটে রয়েছে। হাল্‌কা গোলাপী ফুল, মাঝে মাঝে হলদে রঙের পোটেন্টিলা। আমি যেন মুগ্ধ হয়ে যাই। তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে যাই। এই জিরানিয়াম আর পোটেন্টিলা গাছগুলোর ওপরেই আমাদের তাঁবু খাটানো হয়েছে।

সুজল আর অমিয় এগিয়ে আসে। আমার কাঁধ থেকে রুকস্যাক নামিয়ে তাঁবুর ভেতর ঢুকিয়ে রাখে। সুজল বলে—কি চমৎকার ফুলের বাগানের মাঝখানে তাঁবু ফেলা হয়েছে! কাছেই বক্‌রিওয়ালাদের পুরনো ঝুপড়ি রয়েছে। ক্যাম্পসাইটটা কেমন বলুন?

—হ্যাঁ, আমি স্বীকার করি। সুন্দর ক্যাম্পসাইট্। তাঁবুর ধারেই পুরনো বক্‌রি-ওয়ালাদের পায়ে হাঁটা পথের চিহ্ন। তার পাশেই জলধারা। জলধারায় কলকল শব্দ শোনা যায় তাঁবুর পাশে বসেই। সমস্ত যায়গাটাই প্রায় সমতল। তাঁবুর ভেতরে ঢুকে বসি আমি আর করুণা। রুকস্যাক থেকে প্রয়োজনী জিনিসপত্র বের করে গুছিয়ে ফেলি। এয়ার ম্যাট্রেস ফুলিয়ে নিই। স্লিপিং ব্যাগ গুছিয়ে দু'জনে মগ বের করে নিয়ে এসে বসি। অমিয় এবং সুজলও বসে আমাদের পাশেই। আগে ভাগে এসে কিচেন বানানো হয়েছে। স্টোভ জ্বালিয়ে ইতিমধ্যে চা বানানো হয়ে গেছে। তারপর গরম চা আর বিস্কুট। অমিয় চা খেতে চায় না।

সুজল বলে—কেমন যায়গা, পছন্দ হয় না?

—খুব ভালো যায়গা। করুণা এক ফাঁকে চুরুট ধরিয়ে নেয়। করুণা স্বভাবতঃই কম কথা বলে। সে শুধু নীরবে দেখে আর উপভোগ করে। তারপর সবকিছুই গেঁথে রাখে মনের মধ্যে।

অমিয় বলে—এই সামান্য তুষারপাতের মধ্যেও দেখুন না প্রজাপতিগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে কেমন নিশ্চিন্ত মনে।

আমি হেসে বলি—বেড়াচ্ছে কোথায়, ওরা তো তোমার আর সুজলের তাঁবুর গায়ে আশ্রয় নিয়েছে।

সুজল ও অমিয় দু'জনেই হো হো করে হাসে। সুজল বলে—করুণাদা, তোমার কাছে কিন্তু যাবে না।

করুণা চুরুট টানতে টানতে বলে—কেন বলতো ?

—বীরেনদা রয়েছেন যে !

আমিও হাসি শুনে। আকাশ পরিষ্কার হয়েছে। সূর্য ঢলে পড়েছে গঙ্গোত্রীর দিকটায়। চারদিকে তুষারাবৃত শৃঙ্গগুলো দেখা যাচ্ছিল। দক্ষিণে শিবলিঙ্গ, কেদারনাথ, খরচাকুণ্ড। সবগুলোর মাথায় সূর্যাস্তের লোহিত রঙের ছোপ্ লাগানো। চারদিক নীরব, নিস্তব্ধ। এই অদ্ভুত নিস্তব্ধতার বুক চিরে জলধারার কুলু কুলু শব্দ শোনা যাচ্ছিল। তাঁবুর পাশে গুটিকয়েক পাখী বসে রয়েছে। কয়েকটা বড় বড় কাক আর কাকের মতোই দেখতে বড় বড় কয়েকটা পাখী। কুচ্ কুচে কালো রঙ সারা গায়ে। শুধু ঠোঁট দুটোর রঙ লাল। গোমুখেও দেখেছি এই পাখী। ওরা যেন গোমুখ থেকে এসেছে আমাদের সঙ্গী হয়ে। ধীরে ধীরে সূর্যদেব গিরিশিরার আড়ালে যেতেই চারদিক থেকে হিমেল হাওয়া নেমে আসে। কিচেনে বসে বসে গল্প শুরু করে অমিয়। সুজল মাঝে মাঝে রসিকতা করে। চুপ করে শোনে আর চুরুট টানে। এর মধ্যে প্রেসার কুকারে খিচুরী রান্না হয়ে যায়। উচ্চতার জন্য সময় লাগে। খিচুরী আর ডিমের অমলেট। খাওয়া শেষ করে এক কাপ কফি। রাত্রির মতো সমস্ত কাজ শেষ। কাল গোমুখ থেকে এসে পড়বে সবাই। আমি তাঁবুর ভেতরে ঢুকে একটা ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দিই। করুণা তাঁবুর বাইরে বসে চুরুটটা শেষ করে। তারপর তাঁবুর ভেতরে গিয়ে ঢুকে পড়ে স্লিপিংব্যাগের ভেতরে। আকাশে তারা জেগেছে। ছোট্ট জলধারার কল কল শব্দ স্তিমিত হতে থাকে। দু'চোখ বন্ধ করে যেন দেখতে পাই সাদা রঙের জেনসিয়ানাগুলো। তারপর কখন যেন জলধারার কল কল শব্দ বন্ধ হয়ে যায়। পরদিন ভোর হতেই স্লিপিংব্যাগ থেকে বেরিয়ে পড়ি। আকাশ ঝক্‌ঝকে তকতকে। কোথায়ও ছিটেফোঁটা মেঘের চিহ্ন নেই। পূব-আকাশের লাল আভা ধীরে ধীরে অবতরণ করতে শুরু করেছে ভাগীরথী পর্বতমালার গা বেয়ে। শিবলিঙ্গ পর্বতশৃঙ্গের মাথায় সোনার মুকুট। এই তো সব চাইতে ভাল সময়। দ্রুত বেরিয়ে পড়ি থেলু নালার কাছে। রাতের শীতে কুকড়ে গেছে জলধারা··· তাই তার কল কল শব্দ স্তিমিত। জলধারার ধার দিয়ে দিয়ে এগিয়ে

যাই। উদ্দেশ্য, খুঁজে বের করতে হবে সেই সাদা জেনসিয়ানার সব কুঁড়িগুলো। দেখতে হবে সব কুঁড়িই ফুল হয়ে ফুটেছে কিনা। সাদা জেনসিয়ানার চিহ্নিত যায়গাটা খুঁজে বের করতে বেশ বেগ পেতে হয়। অনেকটা ঢালু পথ বেয়ে মাইল খানেকের বেশী পথ পেরুতেই সেই চিহ্নিত পাথরগুলোর কাছে এসে দাঁড়াই। হ্যাঁ, সূর্যের আলো মাটি স্পর্শ করতে পারেনি। জেনসিয়ানার কুঁড়িগুলোর চোখ যেন অর্ধনিমিলীত। সাদা জেনসিয়ানার কাছাকাছিই দেখি বেশ বড় কয়েক থোকা নীল জেনসিয়ানার গাছ। সব গাছেই অজস্র কুঁড়ি। অনেকগুলো কুঁড়ি ফুটে রয়েছে আবার অনেকগুলোর কুঁড়ি ফোটার অপেক্ষায় উন্মুক্ত।

ধীরে ধীরে সূর্যের লাল আলো এসে উপত্যকার ওপরে স্পর্শ করে। পাথরের ওপরে বসে থাকি। জেনসিয়ানার গাছগুলোর ওপর দিয়ে সূর্যের আলো যেন আলতোভাবে ছুঁয়ে যায়। জেনসিয়ানারা অর্ধনিমিলীত চোখ মেলে তাকায়। আমি ভাবি, ফুলগুলো যেন সূর্যের আলো দেখবার আগে আমার দিকে তাকিয়ে দেখে। অবাক হয়ে যাই, এমন দৃশ্য আমি কোথায়ও দেখিনি। ঝিরঝিরে বাতাসে সাদা জেনসিয়ানার সব কুঁড়িই তাকিয়ে রয়েছে। অদূরে নীল জেনসিয়ানার কুঁড়িগুলো অপরূপ নীল আলো ছড়িয়ে ফুটে উঠেছে। সূর্যের আলোয় ফুল ফোটে, একথা সবাই জানে, সবাই বিশ্বাস করে। ফুল ফোটার মূহুর্তটি সবার অলক্ষেই থাকে। কিন্তু সেই অপরূপ মূহূর্তটি আমি প্রত্যক্ষ করি···। সব কুঁড়ি ফুল হওয়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর এবার ফেরার পালা। তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসেছি সবার অলক্ষে। বেড-টির সময় হয়ে এসেছে, আমাকে খোঁজাখুঁজি করবে সুজল, অমিয় আর করুণা। জলধারার কলকল ধ্বনির শব্দ বেড়ে গেছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা জলে চোখ মুখ ধুয়ে পৌছে যাই তাঁবুর কাছে। সবাই উঠেছে। সূর্যের আলো এসে পড়েছে তাঁবুর গায়ে। সমস্ত উপত্যকার ঘুম ভেঙ্গেছে। চার পাশের জেনসিয়ানার ফুলগুলো চোখ মেলে তাকিয়ে রয়েছে। চারদিকে সবুজ ঘাসের উপত্যকায় লাল, হলদে, গোলাপী রঙের ছোঁয়া দেখা যায় বহুদূর পর্যন্ত। চা-জলখাবার খেয়ে তাঁবু মোটামুটি গুছিয়ে নিই। তারপর সবকাজ শেষ হতেই আবার থেলুধারা অনুসরণ করে এগিয়ে চলি সোজা উত্তরে। ধারার পাশ দিয়ে সুন্দর অস্পষ্ট পথের রেখা। মাঝে মাঝে দেখি বকড়িওয়ালাদের বানানো পাথর দিয়ে সাজানো ঝুপড়ি। ঝুপড়ির ধারে জলধারার গা ঘেঁষে কতকগুলো পাথরের ওপরে দু'চোখ যেন আটকে যায়। সেই বড় বড় নীলরঙের জেনসিয়ানা স্টিপিটাটা। বেশ খানিকটা যায়গা জুড়ে ফুলগুলো ফুটে রয়েছে। গাঢ় নীলরঙা ফুলের মাঝে মাঝে কিছু কিছু হাল্কা

নীল রঙের ফুল। সবগুলোই হয়তো একই ফুল, অর্থাৎ একই প্রজাতি। হিমালয়ের বিভিন্ন উচ্চতায় জেনসিয়ানার নানা প্রজাতি দেখতে পাওয়া যায়। জেনসিয়ানাসিয়া হিমালয়ের সপুষ্পক উদ্ভিদগুলোর মধ্যে একটি ছোট্ট পরিবার। সর্বসাকুল্যে মাত্র ৮০০টি প্রজাতি হিমালয়ের উচ্চ উপত্যকা ছাড়াও পামীর, ককেশাস, রকি ও আন্দিজ পর্বতমালায় দেখতে পাওয়া যাবে খুবই সীমিত সংখ্যক।

হিমালয়ের ১০০০০ ফুট উচ্চতা থেকে শুরু করে ১৬০০০ ফুট পর্যন্ত বিভিন্ন উচ্চতায় দশ-বারোটি প্রজাতি দেখতে পাওয়া যাবে। জেনসিয়ানা স্টিপিটাটা অবশ্য ১০০০০ ফুটের বেশী উচ্চতায় বসবাস করতে অভ্যস্ত। উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিজ্জ বিরল হতে থাকে। সেক্ষেত্রে নানাধরণের উদ্ভিজ্জ অদৃশ্য হতে শুরু করলেও কিন্তু জেনসিয়ানা হারিয়ে যেতে চায় না। থেলু জলধারার গা ঘেঁষে দেখি অস্পষ্ট পায়ে চলা পথ। বুঝতে পারি, এই পথ ধরেই উৎসাহী এবং দুঃসাহসী বকড়িওয়ালারা এগিয়ে এসেছিল থেলু জলধারায় পাথরের গায়ে দেখি হলদে রঙের কোরাইডালিস ফুল। বেশ বড় একটি পাথরের ওপরটা কার্ণিশের মতো হয়েছে। তার তলায় বাসা বেঁধেছে কোরাইডালিস। কোরাই ডালিসের হলদে ফুল দেখেছিলাম গোমুখ পেরুতেই ভুজবাসাধরের গিরিগাত্রের গায়ে। প্রায় প্রতি বছরই দেখি। সামান্য স্থানপরিবর্তন হোত মাত্র। তবে গাছগুলো অদৃশ্য হোত না। ১২০০০ ফুটের বেশী উচ্চতায় এই ফুলগুলো বেশ বড় বড়, পাতাগুলোও বড়। গাছগুলোর অসংখ্য শাখা-প্রশাখা পাথরের ধারটাকে যেন আষ্টে-পৃষ্ঠে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে রেখেছে। চীরবাসায় এই ফুলের মাত্র একটিই প্রজাতি দেখেছিলাম। এই প্রজাতি দেখেছি গঙ্গোত্রীতে, কেদারগঙ্গার ধারে খাড়া পাথরের খাঁজে। অনেকগুলো গাছ···গাঢ় হলদে ফুল। কিন্তু প্রজাতি একটিই। গঙ্গোত্রীর কোরাইডালিস যেন মন্থর গতিতে গিরিগাত্র বেয়ে বেয়ে এসেছে চীরবাসায়। তারপর এগিয়ে গিয়েছে ভুজবাসাধরে। পথ চলার সঙ্গে সঙ্গে যেন এসেছে গঙ্গোত্রী থেকে ভুজবাসাধরে। তারপর থেলু ধারার কাছে আসতে না পারলেও বুঝি পাঠিয়ে দিয়েছে কোন এক স্বজনকে। বাসা বাধবার উৎসাহ দিয়েছিল হয়তো। অবাক হয়ে দেখি, উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফুলগুলোর আকৃতি ছোট হয়েছে। ফুলের রঙ ঠিক হলদে নয়, সোনালী হলদে। হলদে রঙের গায়ে সামান্য রক্তিম আভা যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। পাথরের খাদে তার বাসা। বৃষ্টি কখনো আসে না এই উচ্চতায়। আকাশে গাঢ় মেঘ জমলে তুষারপাত হয়। হিমশীতল বাতাস এসে উড়িয়ে নিয়ে যায় তুষারকণা, সঞ্চিত

হতে পারে না বলে কোরাইডালিসের বাসস্থান সুন্দর ও উপদ্রবমুক্ত। এমন সুন্দর পরিবেশ, পরিমিত রৌদ্রকিরণ, হিমশীতল বাতাস কোরাইডালিস-এর মধ্যেই জন্ম-মৃত্যুর দীর্ঘ জীবনযাত্রা পরম নিশ্চিন্তে অতিক্রম করে যায়। বসে বসে দেখি ফুলগুলোকে। অসংখ্য ফুল যেন অসংখ্য চোখ। আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে এক দৃষ্টিতে—মিটমিট করছে, হাসছে।

কোরাইডালিস লতাজাতীয় উদ্ভিদ। অবলম্বন পেলে অসংখ্য শাখা-প্রশাখা মেলে নিশ্চিন্ত মনে। তবে কি এই উদ্ভিদ কোন দীর্ঘদেহী বৃক্ষ বেয়ে উঠতে পারে? বৃক্ষসীমায় থাকলেও গাছের গুঁড়ি বেয়ে এই উদ্ভিদকে উঠতে দেখা যায় না সচরাচর।

সব হিমালয়েই কোরাইডালিসের সাক্ষাৎ হয়তো নাও পাওয়া যেতে পারে। ১৯৮০ সনে বোটানিক্যাল সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়ার একজন বিজ্ঞানী জেমু উপত্যকায় এসেছিলেন শুধু কোরাইডালিসের সন্ধানে। অবশ্য মে মাসে। এই সময় এই ফুলের সন্ধান পাওয়া খুবই দুঃসাধ্য। তুষারপাত আর বরফ হিমশীতল পরিবেশে কোরাইডালিস আত্মপ্রকাশ করতে সাহস পায় না। তাই জেমু উপত্যকার উচ্চ অংশে কোরাইডালিস অনুপস্থিত ছিল। শেষে বহু কষ্ট করে লাচেন গ্রামের সামান্য নীচে পাহাড়ের ধারে পাথরের খাদের মধ্যে দর্শন পাওয়া গিয়েছিল। বিজ্ঞানী ভদ্রলোক প্রায় পনেরো দিন ঘুরে একটিমাত্র প্রজাতি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন।

পাথরের ধারে বসে বসে দেখি। সময় পেরিয়ে যায় দ্রুতবেগে। আমি বুঝি দীর্ঘ অদর্শনের পর সাক্ষাৎ পেয়েছি পরম আত্মীয়ের। আমি তো একেই দেখেছিলাম গঙ্গোত্রীতে, চীরবাসায়, গোমুখ পেরিয়ে ভূজবাসার গিরিগাত্রে। শিকারীর ক্রূড় দৃষ্টি এড়াতে এড়াতে পালিয়ে এসেছে শেষটায়। ভাবতেই পারেনি এখানে আমি দেখে ফেলতে পারি। তবে আমি শিকারী নই, হিংস্র দৃষ্টি নেই আমার চোখে। বুঝতে পেরেই তাই পরম নিশ্চিন্তে নির্ভরশীল হাসিতে অসংখ্য চোখ মেলেছে।

কোরাইডালিস ফিউমারিসিয়া গোত্রের অন্তর্গত একটি অদ্ভুত ফুল। হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন উচ্চতায় দশটি প্রজাতি দেখা যায়। এই প্রজাতি গঙ্গোত্রী থেকে শুরু করে রক্তবরণ উপত্যকায় প্রসারিত হয়ে রয়েছে।

রক্তবরন উপত্যকা ফুলে ফুলে ঢাকা। স্বল্প পরিসর উপত্যকায় জিরানিয়াম ফুলে ঢাকা। উপত্যকাটির পশ্চিম প্রান্তে সুউচ্চ ভূজবাসাধরের গিরিশিরা। তারই গায়ে অজস্র জুনিপার-আর রোডোডেনডন অ্যাম্বপোগনের গাছ। তারই

মাঝে কম্পোজিটা গোত্রের হলদে রঙের দু'তিনটি ফুল দেখি! দেখি, গাঢ় বেগুনী রঙের পোটেন্টিলার বড় বড় ফুল।

সূর্য প্রখর হতে চলেছে। আরো এগিয়ে চলি থেলুর জলধারা অনুসরণ করে। তারপর জলধারা পেরিয়ে যাই ওপারে। হঠাৎ থমকে দাঁড়াই। গুঁড়ি গুঁড়ি পাথরের ওপরে অনেকগুলো অদ্ভুত কম্পোজিটা ফুল। হাল্কা গোলাপী রঙের ফুলগুলো, ছোট গাছগুলোর পাতা যেন ক্লোরোফিলের অভাবে ফ্যাকাশে সাদা হতে চলেছে। কম্পোজিটা গোত্রের এমন অদ্ভুত ফুল আমি কোথাও দেখিনি। ফুলগুলোর নাম অ্যালার্ডিয়া গ্ল্যাব্রা (Alardia glabra)। এই ফুল সাধারণতঃ তিব্বতীয় পরিবেশের মধ্যেই বসবাস করতে অভ্যস্ত। ১২০০০ ফুট উচ্চতার ওপর থেকে শুরু করে ১৭০০০ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত স্থানে হিমবাহের ধারে গ্রাবরেখার পাশে ভাঙ্গা ভাঙ্গা পাথরগুলোর মাঝখানে কখনো কখনো দেখতে পাওয়া যায়। উচ্চতার জন্য কার্বন ডাই-অক্সাইড আর অক্সিজেনের স্বল্পতায় গাছগুলো পাথরের গায়ে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে বসবাস করতে দেখা যায়। অ্যালার্ডিয়া গ্লাব্রা লতানো জাতের গাছ। গাছের সর্বাঙ্গে রেশমের মতো মসৃণ রোম দেখতে পাওয়া যাবে। পাতাগুলো পুরু, সুন্দর সুগন্ধিযুক্ত। উচ্চ হিমালয়ের অন্যান্য উদ্ভিদের মতো আলার্ডিয়ার গাছে সুগন্ধি ভোলাটয়েল তেল রয়েছে। মাত্র গুটিকয়েক গাছ, তারই সুগন্ধে আমার মন যেন ভরপুর হয়ে যায়। বড় বড় পাথরের টুকরো নিয়ে এসে চিহ্ন করে রাখি। জানি, এই পথ দিয়ে বাসব আর হিমাংশু আসবেই। ওরা দেখবে আর গাছগুলোর পরিচয় জেনে খুশী হবে। নতুন প্রজাতির দর্শন দেখে মুগ্ধ হবে। কম্পোজিটা গোত্রের এই নামকরণ করেছিলেন জ্যাকুমেন্ট। কাশ্মীর ভ্রমণের সময় এই অদ্ভুত ফুলটি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন হিমবাহের ধারে ১৩০০০ ফুটের ওপরে। পরে এই প্রজাতি দেখতে পাওয়া গিয়েছিল লাডাকের উচ্চ মালভূমিতে। সিকিম হিমালয়ের উচ্চ উপত্যকা, সিকিম-তিব্বত সীমান্তে উচ্চ গিরিপথের কাছে দেখা যায় এই ফুলগুলো। রক্তবরণ উপত্যকায় এই ফুলের দর্শন যেন আকস্মিক। জ্যাকুমেন্ট সাহেব জেনারেল অ্যালার্ডের নামকে স্মরণ করার জন্যই এমন নামকরণ করেছিলেন।

ক্যাম্পের দিকে ফিরে যাবার সময় হয়েছে। একা একা চলে এসেছি এতটা পথ পেরিয়ে। স্থানটির উচ্চতা ১৬০০০ ফুটের মতো। তাই শুধু গ্রাবরেখার লাল আর কালো পাথর ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে ছোট ছোট সমতল অংশের

সৃষ্টি করেছে। রক্তবরণ হিমবাহের স্নাউটটি দেখাচ্ছিল বেশ সুন্দর। বরফের গুহাটি অপরূপ, সেই গুহামুখ থেকে নির্গত জলধারা যেন রূপালী ফিতের মতো। দূরত্বের জন্য জলধারার কলকল ধ্বনি শোনা যায় না। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে জলধারার গতিবেগ অনুভব করা যায়। এই জলধারা সোজা পশ্চিমদিক দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। রক্তবরণ হিমবাহ উত্তরদিক থেকে এসে মোড় ঘুরেছে পশ্চিমে। উপত্যকার পরিবেশ হিমবাহের প্রভাব অনুসারে সৃষ্টি হয়েছে। খেলুধারা সোজা উত্তরদিক থেকে এসেছে গিরিশিরার পাশ কাটিয়ে। গিরিশিরাটি পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত। এই গিরিশিরার পাদদেশে শুষ্ক গুঁড়ি গুঁড়ি পাথর। উচ্চতার জন্য গুঁড়ি গুঁড়ি পাথরের ঢালে কোন উদ্ভিজ্জ বাসা বাঁধতে পারেনি। গুঁড়ি গুঁড়ি পাথরগুলোর কাছ দিয়ে দেখি বকড়িওয়ালাদের পায়ের চিহ্ন। কাছেই দেখি ছোট জলধারা। আশান্বিত হই··শুষ্ক পাথরের বুকে জলের স্পর্শ পেলে হয়তো বা কোন দুঃসাহসী উদ্ভিজ্জ বাসা বাঁধতে সাহস পাবে। পাথরের ঢালের দিকটা ভালভাবে তাকাই। শেষটায় খাড়া পাথরের ঢালের কাছে কার্ণিশের মতো জায়গায় অবাক হয়ে তাকাই। এ যেন অদ্ভুত আবিষ্কার, আনন্দে মন ভরে যায়। গুঁড়ি গুঁড়ি পাথরগুলো হয়তো সামান্য জলের স্পর্শ পেয়েছিল। সেখানে কার্ণিশের নিশ্চিন্ত আচ্ছাদন পেয়ে সুন্দর ফুল ফুটে রয়েছে। কাচা সোনা রঙের সুন্দর কতকগুলো ফুল। ঠিক ছোট ছোট সূর্যমুখী ফুল। তবে মুখ অবনত। এই সেই বিখ্যাত ক্রিম্যান্থোডিয়াম। মাত্র গুটিকয়েক গাছ, পাতাগুলো বেশ চওড়া, পুষ্ট, সূর্যালোকে উজ্জ্বল। পাতাগুলোয় ক্লোরোফিলের অভাবে সবুজ ভাব খুবই কম। কেমন যেন হাল্কা হলদে আভা। ফুলগুলো অবনত। তাই যেন ফুলের সৌন্দর্য বেড়ে গেছে। সূর্য মোটামুটি প্রখর। সেই প্রখর সূর্যকিরণে ক্রিম্যান্থোডিয়ামের মুখ লজ্জাবনত। আমি বারবার দেখি, আর অবাক হই। সত্যি কি ফুলগুলো লজ্জায় অবনত? কিসের লজ্জা? এই নিস্তব্ধতায় উন্মুক্ত প্রকৃতির সামনে এমন নীরব নির্জন পরিবেশে লজ্জা কিসের জন্য? তবে কি আমার আকস্মিক উপস্থিতিতেই! এই ক্রিম্যান্থোডিয়াম মাত্র একবার দেখেছিলাম গোমুখ। সে ফুলগাছ হারিয়ে গেছে। বারবার গোমুখে অবস্থান করেছি, খুঁজে বেড়িয়েছি বারবার। কিন্তু কোথায় সে ফুল? কোথায় যেন সে অদৃশ্য হয়ে গেছে! কালতো দীর্ঘ নয়, তাই কালের কবলে হারিয়ে যাওয়ার কথা নয়। রক্তবরণে আমার দর্শন, তবে নতুন প্রজাতি। তবে কি গোমুখের সেই ফুল আমার দুঃখ-বেদনা নিরসন করার জন্য রক্তবরণে এসে দর্শন দিয়েছে নতুন রূপে।

বিদায় নিতে হবে ক্রিম্যাস্থোডিয়ামের কাছ থেকে। আবার আসবো বলে গুটিকয়েক পাথর সংগ্রহ করি। আমি যেন হঠাৎ শিশুর মতো হয়ে গিয়েছি। দুচোখ ভরে দেখে যেন ভয় পেয়ে গিয়েছি। আমি এত সম্পদ কোথায় কিভাবে রাখবো? গাছ তুলে ফেলে কি করে সংরক্ষণ করবো? আর সংরক্ষণ করলেও তো তেমন রূপ আর থাকবে না! স্মৃতিপটে এঁকে রাখা! ক্যামেরার অভাব, ছবি তুললেও তবু হয়তো কিছুটা কাজ হোত। তাই পাথর সাজিয়ে সাজিয়ে রাখি চিহ্ন করে। যাতে বাসব এসে দেখতে পায়। সে তার পরিচয়পত্র সংগ্রহ করবে। সে একটা কিছু করবে ক্রিম্যাস্থোডিয়ামকে স্মরণীয় করার জন্য। আরো কিছুটা পথ এগিয়ে যাই ধীরে ধীরে। কাছেই একটা কার্ণিশের নীচে গুঁড়ি গুঁড়ি পাথরগুলোর মধ্যে দেখি অদ্ভুত ধরনের নীলকমল। ছোট ছোট বনের মতো, ধূসর রঙের তুলো দিয়ে মোড়ানো ছোট ছোট ফুল। বেশ কয়েকটা গাছ, সব গাছেই ফুল রয়েছে। দশ এগারোটি ফুল দেখি। দেখি আর মুগ্ধ হই। ফুলগুলোর চারপাশে ছোট ছোট গাছ, খুবই কম সংখ্যক পাতা দেখতে পাই। পাতাগুলো আদৌ সবুজ রঙের নয়। উচ্চতাজনিত প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারেনি ছোট্ট গাছগুলো। বার বার দেখি, নতুন ধরনের যেন কমল উদ্ভিদ। বিজ্ঞানীরা বলেন, সস্যুরিয়া গওকা, কম্পোজিটা গোত্রের একটি ছোট্ট পরিবার। সস্যুরিয়া ১০০০০ ফুট উচ্চতা থেকে শুরু করে ১৬৫০০ ফুট উচ্চতায় বসবাস করে। হিমবাহের ধারে, হিমশীতল পরিবেশে সস্যুরিয়া শীতের পোশাক পড়ে বসে থাকে। হিমবাহ পিছিয়ে গেছে, গ্রাবরেখার পাথরগুলো সবেমাত্র ভেঙ্গে-চুরে গুঁড়ো গুঁড়ো হতে শুরু করেছে। কাছেই হিমবাহের কঠিন বরফ…চারপাশে ঘন কুয়াশা, রাতের তুষারকণা পাথরগুলোকে ভিজিয়ে রাখতে শুরু করেছে⋯ এমন পরিবেশের মধ্যে সস্যুরিয়ার ছোট ছোট গাছ আত্মপ্রকাশ করেছে। কয়েকটা মাত্র পাতার পরই ফুল! পৃথিবীর বুকে যতরকম সপুষ্পক উদ্ভিদ রয়েছে, উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা গোত্র বিচার করে কম্পোজিটাকেই সব চাইতে বিশাল পরিবারযুক্ত উদ্ভিদ বলে মনে করেন। এই গোত্রের অন্তর্গত প্রজাতির সংখ্যা বিশ হাজারেরও বেশী। শুধু সংখ্যাতেই বৃহৎ নয়, চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের দিক দিয়েও বিস্ময়কর বলে মনে হবে। সময় অতিবাহিত হয় দ্রুতবেগে। কাউকে না বলে তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়েছি, তাই কতগুলো পাথর জড়ো করে চিহ্ন করে রেখে বিদায় নেই সস্যুরিয়া গওকার কাছ থেকে থেকে সূর্যের প্রখর কিরণ মাঝে মাঝে ঢাকা পড়ে যেতে শুরু করেছে টুকরো টুকরো মেঘ এসে। ইতিমধ্যে গোমুখ থেকে সব মালবাহক সহ আমাদের

সঙ্গীরাও হয়তো এসে পড়েছে। দ্রুত পা চালিয়ে যাই। তখন বেলা প্রায় দুটো। সব চিহ্নিত স্থানগুলো দূর থেকে দেখে নিই। খেলুর জলধারায় কলকল শব্দ বৃদ্ধি হয়েছে। দূরে উৎসস্থলের বরফ হয়তো গলতে শুরু করেছে। খেলুর জলধারা অতিক্রম করে বকড়িওয়ালাদের ক্ষীণ পথের রেখা বেয়ে এগিয়ে যাই। পথের ধারেই পাথর সাজিয়ে বকড়িওয়ালাদের পুরনো ঝুপড়ি দেখা যায়। ঝুপড়ির পাথর, ভুজ-গাছের ডাল এলোমেলো ছড়ানো। কাছেই শুকনো জুনিপার গাছ, হয়তো কোন এক সময় বকড়িওয়ালারা ভেড়া-বকড়ি নিয়ে রাত্রিবাস করেছিল। জুনিপার সংগ্রহ করেছিল সোজা দক্ষিণে ভুজবাসা ধরে দীর্ঘ গিরিশিরার ঢালের মুখ থেকে। তাকিয়ে দেখি অজস্র জুনিপার আর তার ফাঁকে ফাঁকে রোডোডেনড্রন অ্যান্থপোগনের গাছ। সব গাছগুলোতেই অজস্র তৈলরস রয়েছে। জ্বালানী হিসাবে দু' ধরনের গাছগুলোই তুলে ফেলে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় আগুন জ্বালাতো। শুকনো জুনিপারগুলোর কাছাকাছি দেখি গাঢ় কমলা রঙের ফুল। এগুলো পোটেন্টিলার আর একটি প্রজাতি। রক্ত-বরণ উপত্যকা প্রায় সমতল। সমস্ত উপত্যকা রঙীন হয়ে রয়েছে জিরানিয়াম আর পোটেন্টিলার ফুলে। চারদিকটা দেখতে দেখতে পৌঁছে যাই তাঁবুর কাছে। অমিয়, সুজল, করুণা আগামীকালের প্রোগ্রাম অনুযায়ী মালপত্র গুছিয়ে রেখে বসেছে পাথরের ধারে। দু' একজন করে পোর্টার আসতে শুরু করেছে। এর মধ্যে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে নিই। সামান্য বিশ্রাম নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ি। সেই চিহ্নিত সাদা জেনসিয়ানা গাছগুলোর পাশে বসে থাকি। সময়টা কোথা দিয়ে যেন কেটে যায়। গোমুখ থেকে পোর্টাররা আসছিল দলে দলে। সূর্য ধীরে ধীরে মেঘের আড়ালে যাচ্ছিল লুকিয়ে। হিমশীতল বাতাস বইতে শুরু করেছিল। শীত করছিল আমার। তাকিয়ে দেখি হিমাদ্রি আর বিনীত। আমাকে বসে থাকা অবস্থায় দেখে ওরা থমকে দাঁড়ায়।

—কি হোল, এমন করে বসে যে ?

আমি বলি—তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি! বাসব কোথায় ?

হিমাদ্রি বলে—ওই তো বাসব আর হিমাংশু আসছে।

ধীরে ধীরে বাসব আর হিমাংশু এসে বসে আমার পাশে।

বাসব বলে—ক্যাম্প কতদূর ?

—বেশীদূর নয়।

—এখানে বসে আছেন যে !

—তোমাদের জন্য।

—সে কি ?

—হ্যা, বিশেষ করে তোমার জন্য ।

বাসব অবাক হয় । সে কি ! আমার জন্য ?

—হ্যা, তোমার রুকস্যাক্‌টা রাখো, এসো আমার সঙ্গে ।

বাসব নিরুত্তরে আসে আমার সঙ্গে । সামান্য এগুতেই ওকে দেখাই সাদা জেনসিয়ানা ।

বাসব বসে পড়ে । তাইতো ! জেনসিয়ানা স্টিপিটাটা বলেই মনে হচ্ছে । তফাৎ শুধু সাদা রঙটা । কাছেই বাসবকে দেখাই নীল রঙের জেনসিয়ানা । বাসব ভালভাবে পরীক্ষা করে ।

—হ্যা, এগুলো নির্ভেজাল জেনসিয়ানা স্টিপিটাটা । সাদা জেনসিয়ানাগুলোর আকৃতি-গঠনপ্রকৃতি ঠিক জেনসিয়ানা স্টিপিটাটার মতোই । যাই হোক—

বাসব দ্রুত রুকস্যাকের ভেতর থেকে পলিথিনের প্যাকেটের মধ্যে বেশ কয়েকটা গাছ তুলে নেয় । হিমাংশু নীল রঙের জেনসিয়ানার ছবি তুলে নেয় । তারপর সব কিছু গুছিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলি । তাঁবুর কাছে গিয়ে সবাই এক বাক্যে স্বীকার করে রক্তবরণ উপত্যকা না দেখলে আফশোষ থাকতো । এমন সুন্দর ছবির মতো উপত্যকা । সামনেই রক্তবরণ হিমবাহের গ্রাবরেখা, যার পাথরগুলো যথার্থই রক্তিমাভ । রক্তবরণ হিমবাহের স্নাউট অপূর্ব দেখতে । একে যথার্থই গোমুখ বলা যায় । উত্তরদিক থেকে আসা থেলুর জলধারার মৃদু মর্মরধ্বনি । সূর্য প্রখর হতেই জলধারা আরো মুখর হয়ে ওঠে । জলধারার ওপারে অজস্র পুরনো গ্রাবরেখায় বড় বড় পাথর । সাদা, ধূসর, লালাভো…নানা রঙের পাথর । অনেকগুলো পাথর ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো হতে চলেছে । হয়তো আগামীকাল উদ্ভিদ এসে স্থায়ী কলোনী গড়ে তুলবে । সবার অলক্ষ্যে ফুল ফুটবে, ফুল ঝরে পড়বে । কল্পনায় এ দৃশ্য আমার চোখের সামনেই যেন দেখতে পাই ।

ভোর হতেই ক্যাম্প গুটিয়ে এগিয়ে চলি সবাই । ঠিক যাযাবরের মতোই পথ চলা—দিনের পর দিন, দিনান্তের শেষে পথ চলার সমাপ্তি । তারপর অস্থায়ী বাসা বেঁধে ক্ষণিকের জন্য হাসি-কাঁন্নার সংসার । তবে এই যাযাবরদের মতো আমি সবার সঙ্গে গা ভাসিয়ে দিয়ে চলে যেতে পারি না । মাঝে মাঝে নিয়মভঙ্গ করার ইচ্ছে জাগে । বিদ্রোহী হয়ে সবাইকে কোন কিছু না বলে, না জানিয়ে একাকী সবার অলক্ষ্যে ঐ দূরে দূরে পরিত্যক্ত বকড়িওয়ালাদের আধভাঙ্গা ঘরে আশ্রয় নিতে ইচ্ছে করে । ওদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর স্বপ্নের কথা জানতে ইচ্ছে করে ।

আমার এই ইচ্ছে হয়তো আর সবার সমর্থনযোগ্য হবে না জানি, তাই লোভ বেড়ে যায়। ঐ সব রঙীন জিরানিয়ামের অজস্র ফুলের ভিড়ের মাঝখানে আত্মগোপন করা যায় না, তাই কেমন যেন হতাশ হই। এই সব জিরানিয়াম আমার অতি পরিচিত। সুখীর চড়াইয়ের মুখে আরো আগে গাঙ্গনানীতে এদের পরম আত্মীয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল প্রথম ১৯৬৬ সনে। তারপর থেকে প্রতি বছরই দেখি, ওদের তাই চিনে রেখেছি। ওদের কথা শুনিয়ে দেবার জন্যই হয়তো আসি গঙ্গোত্রীতে, চীরবাসায়, গোমুখে। কঠিন পাথরের ঢাল বেয়ে বেয়ে উঠবার নিষ্ফল চেষ্টা করতে দেখেছি। সর্বশেষে দেখা হয় রক্তবরণ উপত্যকায়। ঐ বকড়িওয়ালার ভাঙ্গা ঘরের সামনে বসে বসে সারাদিন কাটাতে ইচ্ছে করে। জিরানিয়ামের অজস্র ফুলের মেলায় উড়ে বেড়ায় রঙীন পাখনা মেলে, প্রজাপতির দল। এই সব ফুলগুলোর মাঝখানে এসে ওরা হয়তো বিভ্রান্ত হয়।

কত রঙ-বেরঙের প্রজাপতি—সব ফেলে, সব ছবি পেছনে রেখে এগিয়ে যেতে হয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও। সবার পেছনেই চলি বাসব আর হিমাংশুর সাথে সাথে। হিমাদ্রি যেন আমাকে আগলে নিয়ে চলে। রক্তবরণ উপত্যকার মোট আয়তন তেমন বড় নয়। অঙ্কের হিসেব করতে পারি না। সব কিছুই কাছে কাছে দেখতে পাই। কিন্তু পথ চলতে শুরু করলে পথ আর শেষ হতে চায় না। মরীচিকার মতো ভুলিয়ে নিয়ে চলে, দীর্ঘপথ সংক্ষিপ্ত দেখায়। তবু পথ শেষ হয় না, সময় পেরিয়ে যায়।

ভুজবাসাধরের গিরিশিরা যেন দক্ষিণ দিক থেকে এসে সোজা উত্তরে প্রাচীরের সৃষ্টি করে আবার মোড় ঘুরেছে উত্তর পূর্বে। রক্তবরণ উপত্যকাকে ঘিরে রেখেছে এই দীর্ঘ উচ্চ প্রাচীর। এই দীর্ঘ গিরিশিরা পূব দিকে যেতে যেতে হঠাৎ যেন থমকে দাঁড়িয়েছে। বেশ একটা ছেদ, গিরিশিরার সমাপ্তি ঘটেছে। এই ছেদটুকু একটা গলির মতো দেখা যায়। এই গলির নাম বলা হয় গালি। গালির ভেতর দিয়ে কলকল শব্দ করে বয়ে চলেছে জলধারা। উচ্ছল নয়, উচ্ছসিত নয়, মৃদুগুঞ্জন। এই গুঞ্জন শোনা যায় কাছাকাছি যাবার সময়। থমকে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে। জানতে ইচ্ছে করে কোথা থেকে এসেছে এই জলধারা! গালির ভেতর দিকটা ভাল করে দেখি। অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। তবে উৎসস্থল থেলুবামক। ছোট্ট হিমবাহ, যার বরফ সংগৃহীত হয়েছে ওপরে থেলু পর্বতশৃঙ্গ থেকে। এই জলধারা এঁকে-বেঁকে সোজা দক্ষিণে গিয়ে রক্তবরণ উপত্যকাকে বেষ্টন করে সামান্য পশ্চিম-দক্ষিণে মোড় ঘুরে সর্বশেষে পরিসমাপ্তি ঘটেছে রক্তবরণ হিমবাহ থেকে উদ্গত জলধারার সঙ্গে মিলিত হয়ে। রক্তবরণ উপত্যকার সমস্ত ভূ-ভাগ সরস করে

রাখায় সামান্য সাহায্য করেছে মাত্র। হয়তো মাটির তপস্যায় তুষ্ট হয়েছে থেলু-জলধারা। পাহাড়ী মানুষগুলো একে বলে থেলুগঙ্গা।

ভুজবাসাধর থেকে অবশ্য ছোট্ট একটি জলধারা রক্তবরণ উপত্যকার প্রায় বুকের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে। এই জলধারা অত্যন্ত অনিয়মিত, অত্যন্ত খেয়ালী। খুশীমত বয়ে চলে, হিমশীতল জলধারায় সিক্ত করে রাখার সামান্য চেষ্টা করে উপত্যকার কিছু অংশ। জলধারা কখনও উচ্ছল হবার চেষ্টা হয়তো বা করেছিল কোন এক অতীতে। তারই স্বাক্ষর দেখা যায় ভূমিক্ষয়ের চিহ্ন লক্ষ্য করলে। জলস্রোতের সুন্দর চিহ্ন অগভীর খাত। জলস্রোতের চিহ্ন আরো সুন্দর ও সুস্পষ্ট হয়। দুপুরের দাবদাহে জলধারা উচ্ছসিত হবার চেষ্টা করে। সকালে আর সন্ধ্যায় প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জলধারার কলকণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। সূর্য উঠার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই মিষ্টি ঝির ঝির শব্দ। দুপুরে সে শব্দ বৃদ্ধি পায়, আবার বিকেল হতেই সে শব্দ স্তিমিত হয়ে নীরব হয়ে যায়। এ যেন কোন কিশোরী, সারাদিন সংসারের কার্য সমাপ্ত হতেই সন্ধ্যায় বিশ্রাম নিতে শুরু করে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে। তারপর নীরব নিস্তব্ধ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। হিমশীতল বাতাস তাকে স্নিগ্ধ করে ঘুম পাড়ায়। এই খেয়ালী কিশোরী রক্তবরণ উপত্যকার সুদৃশ্য উদ্যানকে সরস ও সজীব করে রাখার চেষ্টা করে দিবারাত্র। এই অনিয়মিত জলসিঞ্চনে-জলধারার পাশে পাশে জেনসিয়ানার ছোট ছোট কলোনী গড়ে ওঠে। জেনসিয়ানার উপযোগী মৃত্তিকাকে আরো সুদৃঢ় ও সংহত করার জন্য বাসা বাঁধে পোলাইগোনাম। নীল আর হালকা গোলাপী ফুলে জল-ধারার কিনারা সুন্দর ও সুদৃশ্য হয়ে ওঠে। সীমিত সংখ্যক ফুল ফুটিয়ে গোণাগুনতি কলোনী যেন মুখর হয়ে ওঠে। রাতের শিশির আর তুষারকণা সমস্ত উপত্যকার গুড়ি গুড়ি পাথরগুলোকে সরস করায় সাহায্য করে। তারপর প্রখর সূর্যের কিরণে পাথরগুলো ফেটে, গিয়ে ক্ষুদ্র হতে থাকে। এমন অবস্থায় জিরানিয়াম, কম্পোজিটা, পোটেন্টিলা অল্প জলেই তুষ্ট হয়ে সজীব এবং পুষ্ট হয়। তাই সমস্ত অঞ্চল জুড়ে অসংখ্য জিরানিয়াম পোটেন্টিলা অ্যাষ্টর আর কম্পোজিটার অনেকগুলো প্রজাতি স্থায়ী বাসস্থান গড়ে তুলেছে। ভুজবাসার ঢালু গা বেয়ে নেমে এসেছে জুনিপারের ঘন গাছগুলো। দেখতে পাওয়া যায় দূর থেকেই। তারপর প্রায় সমতল স্থান জুড়ে অসংখ্য রোডোডেনড্রন অ্যান্থপোগনের অসংখ্য গাছ। বেশ সুন্দর মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে থাকে চারদিকটায়। পথ চলতে চলতে আনমনা করে রাখে সবাইকে। বেশ মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে থাকে সারা বাতাস জুড়ে । কেমন যেন নেশাগ্রস্তের মতো করে ফেলে।

পথ চলতে ইচ্ছে করে না। মনে হয়, ঐ দূরে দূরে বকড়িওয়ালাদের ঝুপড়ির ভেতরে বাসা বেঁধে বসবাস করি যতদিন খুশী আর প্রতিদিন দেখি ফুল ফোটা, ফুল ঝড়ে পড়ার ছবি। সন্ধ্যায় কুয়াশার আবরণের মধ্যে দেখতে ইচ্ছে হয় এমন সুন্দর উদ্যান। তারপর দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়তে চাই স্নিগ্ধ হিমশীতল পরিবেশের মধ্যে।

ইচ্ছে না থাকলেও পথ চলতে হয়। পথ চলতে চলতে ভুলে যাই পথ চলার কথা।' দীর্ঘ বন্ধুর পথ কখন যেন ফুরিয়ে যেতে শুরু করে। কখন যেন থেলু নালার কাছে এসে থমকে দাঁড়াই। একদিনের দেখা তবু যেন মুখস্থ হয়ে গেছে। আমার সেই পাথর সাজানো চিহ্নিত স্থানটিকে এগিয়ে গিয়ে দেখাই বাসবকে। ঠিক জলধারার পাশেই পাথরগুলোর ওপরে ছোট্ট কলোনী গড়ে উঠেছে কম্পোজিটা গোত্রের একটি সুন্দর প্রজাতি। গতকাল খুঁজে খুঁজে বার করেছিলাম। তারপর চিহ্নিত করেছিলাম ছোট ছোট পাথর সাজিয়ে। বড় বড় পাথর সূর্যতাপে উত্তপ্ত হতে পারে না হিমশীতল বাতাসের স্পর্শ পেয়ে। এই পাথরের বুকে প্রকৃতির আশিসপুষ্ট হয়ে বেঁচে রয়েছে। কতরকম শত্রু রয়েছে চারপাশে। হিমশীতল বাতাস, যখন তখন তুষারপাত, অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের স্বল্পতা, নিম্নচাপ, নিম্নতাপমাত্রা সূর্যালোক থেকে ক্লোরোফিল তৈরী করতে পারে না সহজে। এমন পরিবেশ, তবু বাঁচার জন্য এমন প্রচেষ্টা। জীবনযুদ্ধ থেকে যেন ক্ষণিকের জন্যও রেহাই পায় না। সর্বাঙ্গে তাই যুদ্ধক্লান্তির স্পর্শ, ফ্যাকাশে দেহ, ছোট ছোট গাছগুলোর পাতায় সবুজ রঙের অভাব। তবু সর্বসাকুল্যে ডজনখানেক ফুল উপহার দিয়ে অস্তিত্ব বজায় রাখতে চেয়েছে। ফুলের পরিচয়-অ্যালার্ডিয়া গ্ল্যাব্রা। বাসব আমার দিকে তাকায়। বলে—এই গাছ কয়েকটা তুলে নেবো? সমস্ত পরিবার যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে!

আমি বলি—তবে থাক। এটাতো সম্পূর্ণ Rare Specimen নয়।

—না, অ্যালার্ডিয়া আমরা অনেক আগেই সংগ্রহ করেছি। তবে গঙ্গোত্রী অঞ্চল থেকে নয়। আমি বলি—ঠিক আছে, তবে ছোট একটা গাছ তুলে নাও।

বাসব মত বদলে ফেলে বলে না, থাক। ফেরার সময় তো আবার এই পথ ধরেই যাবো, তখন সংগ্রহ করে নিয়ে যাওয়া যাবে।

হাফ ছেড়ে বাঁচি। শিকারীর হাত থেকে বেঁচে যায় হতভাগ্য অ্যালার্ডিয়া গ্ল্যাব্রা।

বাসব বলে—এইসব প্রজাতি উচ্চ হিমালয়ে একটা দুটো গাছ নিয়েই দেখতে পাওয়া যাবে। মায়া করলে আবার সংগ্রহ করা যায় না।

আমি বলি—তা বলে কোন প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক্ এতো কখনো ঠিক হতে পারে না।

আমি বাসবকে রূপকুণ্ডের কথা বলি। রূপকুণ্ডের ধারের কাছে ফেনকমলের দুটো প্রজাতি দেখেছিলাম ১৯৬০ সনে। সে সময়ে যাত্রী সংখ্যা নাই বললেই চলে। অজস্র ফুল ফুটে থাকতো চার ধারে। স্বামী প্রণবানন্দজী আমাকে বলেছিলেন, যাত্রী সংখ্যা কম বলে গাছগুলো নিশ্চিন্তে বেঁচে রয়েছে। তিনি নিজেও পোর্টারদের নির্দেশ দিতেন, কেউ যেন ফুল না তোলে। যাত্রীর সংখ্যা বাড়লেই ফুলগুলোর সংখ্যা কমে যেতে শুরু করবে। সত্যিই তাই দেখতে পেয়েছিলাম ১৯৭১ সনে। রূপকুণ্ডের ধারে মাত্র একটা প্রজাতিই দেখেছিলাম। মাত্র এগারো বৎসর সময়ের মধ্যে যাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে। রূপকুণ্ডে পৌছেই সুন্দর ফুলগুলো দেখে মুগ্ধ হয়েছে আর দু'হাত ভরে তুলে নিয়ে গেছে। উৎসাহীদের কেউ কেউ আবার ফুল তুলেও তৃপ্ত হতে পারে নি, গাছশুদ্ধ উপড়ে তুলে নিয়ে গেছে যাবার সময়।

রূপকুণ্ড অঞ্চলে হুনিয়াথরে ব্রহ্মকমলের দুটি প্রজাতি দেখেছিলাম ১৯৬০ সনে। ১৯৭১ সনেও দেখেছি অজস্র। এত গাছ আর এত ফুল যে তাঁবু পর্যন্ত খাটাবার স্থান ছিল না! আমাদের আগে আরো দু'তিনটি দল এসেছিল। তার চিহ্ন দেখেছিলাম পাথর নাচুনি পর্যন্ত। সারা পথ জুড়ে ব্রহ্মকমলের গাছশুদ্ধ ফুল ছড়ানো দেখেছি। উৎসাহী যাত্রীদের পথ চলতে চলতে গাছপালা উপড়ে তোলা, ফুল ছিড়ে ফেলার অভ্যাস থেকে সংযত হতে দেখিনি অনেককেই।

বাসব স্বীকার করে। অনেক প্রজাতি যাত্রীদের অত্যাচার সহ্য করেও বেঁচে থাকে। অত্যাচার বৃদ্ধি পেলে প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হওয়া অসম্ভব নয়। লোহাজঙের কাছে লিলিফুলের দু'তিনটে প্রজাতি দেখেছিলাম। ১৯৮৩ সনে মাত্র একটি প্রজাতি বেঁচে রয়েছে। শুধুমাত্র পথযাত্রীদের অত্যাচারেই যে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে তা নয়, স্থানীয় গ্রামবাসীদের অত্যাচারেও প্রাণ হারিয়েছে। পথ চলতে চলতে দেখেছি, আমাদের পোর্টারগুলোর হাত নিস্-পিস্ করে। পাহাড়ের ঢালের মুখ থেকে অজস্র ফুল তুলে ছিঁড়তে ছিঁড়তে এগিয়ে গেছে। পথের ধারে দেখেছি এইসব ছেঁড়া ফুল আর গাছ। বেদনায় মন ভরে গেছে।

বাসব আমার কথাগুলো শুনে পথ চলতে চলতে সান্ত্বনার সুরে বলে—যাই হোক এমন সব দুর্গমস্থানে সবাইতো আসতে পারে না! আর এলেও প্রাকৃতিক পরিবেশে পৌছে নানা অসুবিধা অস্বস্তি সহ্য করে তেমন করে লতাপাতাগুলোর দিকে লক্ষ্য দিতে ভুলে যায়। তাই বাঁচোয়া।

পথ চলতে চলতে আমি নানা কথার মধ্যেও ভুলতে পারি না চারপাশের সুন্দর পরিবেশ। বেশ কিছুটা পথ চলতেই থমকে দাঁড়াই। সেই চিহ্নিত স্থানটির সামনে এসে দাঁড়াই। পাহাড়ের ঢালে, পাথরের কার্ণিশের তলায় সেই আত্মগোপন করা ক্রিম্যাস্থোডিয়াম। বাসবকে দেখাই ফুলগুলোকে। মাত্র চার পাঁচটি গাছ, আর ডজনখানেক ফুল। কাঁচা সোনা রঙের পাপড়িগুলো। হিমাংশু, বাসব, আমি বসে পড়ি। আমাদের সঙ্গীরা এগিয়ে যায়। পোর্টারগুলো রসিকতা করে বলে, ক্যা সাব্, থক্ গয়া? অর্থাৎ ক্লান্ত হয়ে পড়েছ?

আমি বসতে বসতেই হাফ ছেড়ে বলি—হ্যা, থক্ গয়া।

ওরা হেসে বলে—আরাম করো সাব্।

বাসব বলে—সে কি? থক্ গয়া মানে?

আমি বলি—পাহাড়ে চলতে চলতে এই এক সুন্দর জবাব। যা শুনলে পথযাত্রীরা খুশী হয়। এই সামান্য দুপা চলেই যদি ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিতে হয় তবে পাহাড়ে বেড়াতে আসা কেনরে বাপু? করুণার দৃষ্টিমেলে এগিয়ে যায়। তারপর নিজেদের শক্তি সামর্থ্যের সঙ্গে তুলনা করতে চায়। আত্মতৃপ্তি নিয়ে এগিয়ে যায়। যেন দুর্বার বেগে ছুটতে চায়। পথ কত তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারে তারই প্রতিযোগিতা চালায়।

সবাই হাসে আমার কথা শুনে।

বাসব আর হিমাংশু দুজনেই ভালভাবে দেখে নেয় ক্রিম্যাস্থোডিয়ামের গাছ কটা দুজনের দেখার পদ্ধতিটা আলাদা। বাসব দেখছিল ফুলগুলোর গঠন-প্রকৃতি আর হিমাংশু অঙ্গ-সৌষ্ঠব। খুঁজে বের করতে চায় ঐ সুন্দর ফুলের ফাঁকে কোন কীট বাসা বেঁধেছে কিনা! হিমাংশুর ধারনা কুসুমে কীট থাকবেই। কীট না থাকলে কুসুমের পুর্ণতা আসবে কি করে! কীটগুলো জন্মলাভ করেই গাছের পাতা খাবে, পুষ্ট হবে। বাসা বাঁধবে গাছের ডালে, পাতায়। আপাতত দৃষ্টিতে গাছের ক্ষয়-ক্ষতি হলেও দুঃখ করবার কিছু নেই। এই কীটই অনেক ক্ষেত্রে কুসুমে পরাগ সম্মেলনে সাহায্য করে। শত্রুতা করতে গিয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞতাবশতঃ এই অপরূপ কুসুমের নতুন সৃষ্টির বীজ রোপণ করে যায়।

হিমাংশু বলে—অবশ্য সব কীটই সাহায্য করে না। তারা রাক্ষুসে ক্ষুধা নিয়ে সমস্ত গাছ লতা পাতা গ্রাস করে নিশ্চিহ্ন করে যায়। নিশ্চিহ্ন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে কিছু কিছু গাছ রেহাই দিয়ে তাদের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়।

ক্রিম্যান্থোডিয়ামের সবকটা গাছেই তন্নতন্ন করে খুঁজে হিমাংশু হতাশ হয়ে যায়। একটা পোকাও নেই কোথায়ও। সমস্ত গাছগুলো সম্পূর্ণ অক্ষত, ঝক্‌ঝকে আর সজীব। বাসব গোণাগুনতি গাছগুলো থেকে দুটো উপড়ে নিয়ে সংগ্রহ করে। আমার দিকে তাকিয়ে বলে রেয়ার্‌ স্পেসিমেন না হলেও এই স্পেসিমেন খুবই কম দেখাযায়। বিশেষ করে এত উচ্চতায় এই ধরণের ক্রিম্যান্থোডিয়াম আমি একমাত্র সিকিমে দেখেছিলাম। ক্রিম্যান্থোডিয়ামের ছোট উদ্যান দেখতে দেখতে পেরিয়ে যাই। এগুতে থাকি ধীরে ধীরে। তারপর আবার দাড়িয়ে পড়ি সেই চিহ্নিত স্থানটির কাছে এসে। ঠিক পাহাড়ের ধারে কার্ণিশেরতলায় অনেকগুলো ছোট ছোট গাছ। ছোট ছোট পাতা, আর পাতাগুলোর মাঝখানে হালকা ধূসরবর্ণের গোল গোল ফুল মসৃণ পশমের মতো আবরণ দিয়ে ঢাকা।

বাসব গাছগুলোর পরিচয় দেয় সস্যুরিয়া গ্নউকা।

ফুলগুলো কখনো খুব বড় হয় না। চারপাশের গুড়িগুড়ি পাথরগুলোর সঙ্গে ফুলগুলোর বর্ণ যেন মিলিয়ে থাকে। খুব কাছে না গেলে ফুলগুলো যেন দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। ছোট ফুলের আবরণের কেন্দ্রস্থলে সামান্য মুখ আছে, খুব ভালভাবে দেখলে ফুলগুলোর আকৃতি বোঝা যায়। সস্যুরিয়া গ্নউকার আবরণের ভেতরের ফাঁদে বন্দী হয়ে ছোট ছোট কীট প্রাণ হারায় কিনা জানি না। সস্যুরিয়া গ্নউকা-ইন্‌সেক্‌টিভোরাস কিনা? হিমাংশু আগ্রহভরে একটি পুষ্ট ফুল তুলে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে করতে অবশেষে খুঁজে বের করে ছোট ছোট দু-তিনটি কীট। ঠিক মাছিজাতীয়। ফুলগুলোর রস গ্রহণ করতে গিয়েছিল কিনা জানা যায় না। ১৯৭১ সনে রূপকুণ্ডের ধারে অজস্র সস্যুরিয়া সাক্রা অর্থাৎ ফেনকমল দেখেছিলাম। বেশ বড় বড় ফুল। ফুলের চারদিকটা ধব্‌ধবে সাদা তুলোর মতো আবরণ। দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল কাঠির ডগায় যেন অপরূপ একটা তুলোর বল। বলগুলোর কেন্দ্রস্থলে ঈষৎবেগুনী রঙের আভা। ভাল করে পর্যবেক্ষণ করছিলাম। এত উচ্চতায় তুষার সীমার ওপরে কীট-পতঙ্গ না এলে ফুলগুলোর পরাগ সম্মেলন হবে কি করে? ফুলগুলো আবার তুলোর আবরণে ঢাকা। বাতাসে ফুলের পরাগ উড়ে গিয়ে অন্য ফুলে গিয়ে হাজির হবে সে উপায়ও তো নেই। তাই পরাগ সম্মেলনের জন্য, ছোট ছোট গাছগুলোর বংশবৃদ্ধির জন্য, প্রকৃতির নির্দেশে কীটপতঙ্গগুলোকে আসতেই হবে ঐ বিস্ময়কর ফুলের কাছে। চারদিকে হিমশীতল পরিবেশ, পথ ভোলা কোন পতঙ্গ হয়তো বা আশ্রয় নেয় সস্যুরিয়া সাক্রার ওপরে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য খুঁজে খুঁজে সেই হতভাগ্য পতঙ্গ ফুলের কেন্দ্রস্থলে

ঈষৎবেগুনী রঙের অংশে ছোট মুখ দিয়ে ঢুকে পরে ফুলের ভেতরে। ফুলের ভেতরে পরাগ সম্মেলন ঘটে যায়। কিন্তু তারপর! এমন উষ্ণ পরিবেশে থাকতে থাকতে হতভাগ্য পতঙ্গ নির্গমনের পথ হারিয়ে ফেলে। ফুলের ভেতরে তুলোর আবরণের মধ্যে আমি দুতিনটি পতঙ্গের মৃতদেহ দেখেছিলাম। পতঙ্গগুলির মৃত্যুর কারণ জানা সম্ভব হয়নি। পিণ্ডারী উপত্যকায় এমনি সস্যুরিয়া সাক্রার অনেকগুলো গাছ দেখেছিলাম। ধব্‌ধবে সাদা তুলোর মতো আবরণ দিয়ে ঢাকা ফুলগুলো। তুষার সীমার ওপরে এমন বিস্ময়কর ফুলগুলোর কাছেই দেখেছিলাম বরফ জমানো রয়েছে। এমন হিমশীতল পরিবেশের মধ্যে ছোট ছোট পতঙ্গ কেমন করে কিসের আকর্ষণে এসেছিল, মসৃণ তুলোর মতো আবরণের ভেতরে কেন প্রবেশ করে অনন্তকালের জন্য বন্দী হয়েছিল জানা যায়নি। প্রকৃতির অমোঘ নির্দেশেই কি আত্মত্যাগ করেছিল ফুলগুলো!

হিমাংশু ভালভাবে পর্যবেক্ষন করে। ফুলগুলো কি পতঙ্গভুক্? উদ্ভিদগুলোর মধ্যে যেগুলো সাধারণত পতঙ্গভুক্, সেগুলোতে পতঙ্গ আকৃষ্ট হয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গেই বন্দী হয়ে যায়। তারপর সেই উদ্ভিদ ধীরে ধীরে আত্মসাৎ করে। পতঙ্গের দেহের প্রোটিন সংগ্রহ করে সেইসব উদ্ভিদ হয়তো পুষ্ট হয়। তাই পতঙ্গ ফুলের গন্ধে বা সৌন্দর্যমুগ্ধ হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ফাঁদে বন্দী হয়। সস্যুরিয়া সাক্রারও সস্যুরিয়া গ্নউকার আসল ফুলের চারপাশের আবরণ তুলোর মতো মসৃণ আশ। এই আশ ফুলের সমস্ত অবয়বকে হিমশীতল বাতাস বা হাল্কা তুষারপাত থেকে আত্মরক্ষা করে। কীটপতঙ্গভুক হবার জন্য এই তুলোর মতো আশগুলো কোন ফাঁদ বলেই মনে হয় না। তবু সস্যুরিয়া পরিবারের সস্যুরিয়া গ্নউকা, সস্যুরিয়া সাক্রা, সস্যুরিয়া অব্‌লিভট্টার গঠন-প্রকৃতি এবং জীবনযাত্রা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজন রয়েছে। সস্যুরিয়া গ্নউকার ভেতরে আবদ্ধ পতঙ্গের মৃতদেহ শুষ্ক, তুলোর আশের মধ্যে ভেতরে প্রবেশ করে নির্গমনের পথ না পেয়ে গোলকধাঁধার মধ্যে বন্দী হয়ে প্রাণ হারিয়েছে। বিবর্ণ শুষ্ক পতঙ্গের দেহ ফুলের ভেতরে থেকে বের করতে গিয়ে হিমাংশু ভেঙ্গে চুরে এমন করে ফেলেছিল যে, পতঙ্গের জাতি বিচার করা দুঃসাধ্য হয়েছিল। বাসব অবশ্য কয়েকটা গাছ তুলে নিয়ে বেশ তৃপ্ত হয়েছিল। সেগুলো পলিথিনের প্যাকেটে পুরে নিয়ে যাবে পরবর্তী ক্যাম্পে।

আর সামান্য পথ, কালো আর লালচে পাথরের স্তূপ, গ্রাবরেখার পুরনো পাথরগুলো অক্সিডাইজড্ হয়ে কালের প্রভাবে কিছুটা বিবর্ণ হয়েছে। উচ্চতা বৃদ্ধি,

নিম্নতাপমাত্রা ও চাপমাত্রার জন্য পাথরগুলোর ওপরে আবহাওয়ার প্রভাব পড়েছিল। পাথরগুলো ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেলেও মৃত্তিকায় পরিণত হয়নি। তবে উত্তরদিকের সমান্তরালে দীর্ঘ গিরিশিরার একপাশ থেকে জলধারা নেমে এসেছে। এই জলধারার প্রভাবে পাথরগুলোর অনেকাংশ ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে কাদায় পরিণত হয়েছে। এই কাদামাখা পাথরের ঢাল বেয়ে এগুতে থাকি। কাছেই দেখি, বড় বড় পাথরগুলোর গা বেয়ে উঠেছে কোরাইডালিসের দুটো প্রজাতি। একটি ফুলের রঙ কাচা সোনার মত, ফুলগুলো অপেক্ষাকৃত বড় বড়। অপরটির ফুলগুলো সোনালী রঙের। ফুলগুলো ছোট ছোট। অসংখ্য ফুল দূর থেকে দেখতে পাওয়া যায়। মস্ত বড় পাথরটার ওপরে আরো বড় একটা পাথর যেন সুন্দর আচ্ছাদনের সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ তুষারপাত হলে ফুলগুলো চট করে আক্রান্ত হবে না। বেলা বেড়ে গিয়েছে। ঘড়ি দেখে চমকে ওঠি!—বেলা দুটো। আমাদের ক্যাম্পসাইট আর কতদূর বুঝতে পারি না। তবে সামনের গিরিশিরার ঢালে বকড়িওয়ালাদের পায়ের চিহ্ন শেষ হতে চলেছে। সামনে কোরাইডালিসের দুটো প্রজাতি ছাড়া আর কোন উদ্ভিদের চিহ্নমাত্র নেই। বুঝতে পারি, আমাদের রাত্রিবাসের স্থান খুবই কাছাকাছি এসে গেছে। গতকাল এমনি সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হতে শুরু করেছিল। কিন্তু খুবই সামান্য সময়ের জন্য প্রচণ্ড দম্‌কা হাওয়া এসে মেঘ উড়ে চলে গিয়েছিল সোজা উত্তর-পূর্বে। তারপর আকাশ গাঢ় নীল হয়েছিল। তবে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় কুয়াশা এসে ঢেকে ফেলেছিল চারদিক। সেই ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে গাঢ় কুয়াশা এসেছিল পশ্চিমদিকে গঙ্গোত্রী উপত্যকা থেকে, ভুজবাসাধারের খাড়া পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে হু হু করে। রক্তবরণ উপত্যকাকে ঢেকে ফেলেছিল মুহূর্তের মধ্যে। উচ্চ উপত্যকায় সন্ধ্যার পরিবেশ আমি লক্ষ্য করেছি। তবে ব্যতিক্রমও রয়েছে। কুয়াশার চাঁদর সমস্ত আকাশকে ঢেকে ফেললেও ঘন্টাখানেকের মধ্যেই যেন মন্ত্রবলে সব কুয়াশা মিলিয়ে যায়।

প্রায় ঘন্টাখানেক চলার পর পৌঁছে যাই সুন্দর স্বল্পপরিসর ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডে। আসলে এটা একটা সুন্দর ঝুলন্ত উপত্যকা। সামনে উত্তরদিকটায় বেশ প্রশস্ত ঢাল বেয়ে ওপরে গিয়েছে গ্রাবরেখা। তারই মাথার ওপরে দুপাশে গিরিশিরা। এরই ওপরে রয়েছে গিরিশিখর; শিখরের মাথার ওপরে ঝক্‌ঝকে বরফ। এই গ্রাবরেখার পাথরগুলোর বুকের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে জলধারা। আর এই জলধারা দুতিন ভাগে প্রবাহিত হয়। প্রবাহিত জলধারায় সিক্ত প্রস্তরময় অংশে অপরূপ নন্দনবনের

সৃষ্টি হয়েছে। স্বল্পপরিসর স্থানটিতে অ্যাকোনাইট ভায়োলেসাম, ডেলফিনিয়াম, কম্পোজিটা বর্গের অজস্র ফুল। জলধারার পাশেই জেনসিয়ানা, পাথরের গায়ে বড় বড় পাতাযুক্ত রিউম আর তার পাশেই পোলাইগোনাম। এই পরিবেশের মধ্যেই তো ব্লু পপির গাছ থাকা উচিত। জলধারার ঢালের মুখ প্রশস্ত হয়েছে। সেখানে প্রিমুলার অজস্র গাছ। ফুল শুকিয়ে গিয়েছে। ফুলের ডাঁটিগুলো দেখা যাচ্ছিল।

সমতল স্থান জুড়ে আমাদের তাঁবুগুলো খাটানো হয়েছে। তাঁবু খাটানো হতেই সবাই কিচেন বানিয়ে ফেলেছে। পোর্টারদের রাত্রিবাসের উপযোগী আচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয়ে যায় দেখতে দেখতে। তাঁবুর কাছে আবার রুকস্যাক নামিয়ে রেখে দ্রুত এগিয়ে যাই পুষ্পোদ্যানের কাছে। এত স্বল্পপরিসরের মধ্যে নানাবর্ণের ফুল। লাল, হলদে, নীল, বেগুনী রঙের। মুগ্ধ হয়ে যাই। পাথরের ওপরে বসে পড়ি। গাঢ় নীল আকাশ, আকাশের বুক বেয়ে দ্রুত ছুটে চলেছে সাদা রঙের মেঘ। হাল্কা মেঘ, সূর্যের কিরণ ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত উপত্যকা জুড়ে। উত্তর-পূর্বে রক্তবরণ হিমবাহ। রক্তবরণ হিমবাহ অনেকটা মোড় ঘুরেছে। তারপর সোজা উত্তরে দেখা যাচ্ছিল হিমবাহটি। মূল হিমবাহের দুপাশে বিশাল গিরিশিরা। আর সেই গিরিশিরার শীর্ষে তুষারাবৃত শৃঙ্গ।

কতক্ষণ বসেছিলাম মনে নেই। হাক-ডাক শুনে চমকে যাই। বাধ্য হয়ে আসি তাঁবুর কাছে। মগভর্তি গরম চা। বাসবকে বলি— সামনে দেখেছো কেমন সুন্দর ছোট্ট পুষ্পোদ্যান !

বাসব বলে— হ্যা, অল্প পরিবেশে অনেকগুলো গাছ দেখেছি। প্রচুর জলের সংস্থান আছে বলেই ১৬০০০ ফুটের ওপরেও এত সুন্দর উদ্যান ! এমন উচ্চতায় এত সুন্দর পুষ্পোদ্যানই বটে ! আমি হিমাংশুর দিকে তাকিয়ে বলি, প্রচুর রোদ আছে, আকাশে মেঘ নেই। এই সময় ছবি তুলে নিতে পারো।

বাসব বলে—আজ থাক, আজ কেবল বিশ্রাম। কাল সকালে ব্রেকফাষ্ট করেই কাজ শুরু করা যাবে। হিমাংশু বলে—হ্যা, তাই ঠিক। আজ সব গুছিয়ে নিই।

আমি বলি, ছবিগুলো তুলে নিতে পারো। এখনো আলো রয়েছে।

হিমাংশু বলে, ভয় নেই। সময়তো রয়েছে, কাল ছবি তুলতে পারবো। অনেকগুলি ছবি তুলবো। ভাবি, কেমন যেন অমঙ্গল আশঙ্কা মনের মধ্যে উঁকি দিতে চায়। আকাশ পরিষ্কার। মাঝে মাঝে পশ্চিম-দক্ষিণ থেকে টুকরো টুকরো মেঘ যেন পথ ভোলা পথিকের মতো ধীরবেগে নীল আকাশের বুক বেয়ে চলে সোজা উত্তরে। উত্তরের তুষারবৃত শৃঙ্গগুলো টপকে চলে যায় আরো উত্তরে তিব্বত মালভূমির দিকে। সেখানেইতো আছে কৈলাস আর মানস সরোবর।

হিমালয়ের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর টপকে হয়তো পৌঁছে গিয়েছে সেখানে। কিন্তু এই টুকরো টুকরো মেঘগুলো ষড়যন্ত্র করে জমতে শুরু করে আকাশের বুকে।

সমস্ত ছোট উপত্যকাটা মুখরিত হয়ে উঠেছে! হাসি-ঠাট্টায়, রাত্রের ডিনার কি হবে তাই নিয়ে বিতর্ক চলেছে। এসবের কর্মকর্তা বরেণ। অমিয় রান্নার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ বলা চলে। যাই হোক, শেষে ঠিক হলো সুইট ডিস আর গাজরের হালুয়া দেওয়া হবে। অমিতাভদা বসেছিলেন পাশেই। গাজরের হালুয়া শুনেই অমিতাভদা চেচিয়ে উঠলেন, কি সর্বনাশ! গাজরের হালুয়া এই উচ্চতায়!

আমি বলি, কেন? গাজরতো খুব উপকারী। একশো গ্রাম গাজরের ৭০০০ ইউনিট ভিটামিন 'এ' থাকে।

অমিতাভদা ধমকে ওঠেন। ··তুমি থামো তো। গাজর খেলে আর উপায় আছে?

আমি অবাক হই।

অমিতাভদা বলেন, তুমি সবাইকে গাজরের হালুয়া খাওয়ালে পেটে গ্যাস জমে সবারই পেট ফুলে উঠবে। কি গ্যাস জানো?

সবাই অমিতাভদার দিকে তাকায়। হিমাংশু আর বাসব হাসে, উপভোগ করে। অমিতাভদা বলেন, জানো না, কি গ্যাস জমে?

আমি হাসি আর বলি, না, জানি না তো!

অমিতাভদা বলেন, মিথেন গ্যাস্! সাংঘাতিক মিথেন গ্যাস।

—মিথেন গ্যাস! হিমাংশু হো হো করে হাসে। আমরাও হাসি।

অমিতাভদা আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, হাসি নয়, মিথেন গ্যাস পেট থেকে ঢেকুরের সঙ্গে বেরুলেও দপ্‌দপ্ করে আগুন জ্বলবে।

সবাই কলরব করে হাসে। অমিতাভদা বলেন, আর খাবার কিছু পেলে না?

আমি আবার বোঝাতে চেষ্টা করি। অমিতাভদা তীব্র প্রতিবাদ জানান।

এরমধ্যে হঠাৎ হিমংশু চীৎকার করে ওঠে বলে, কি সর্বনাশ! দেখুন কালো মেঘ জমতে শুরু করেছে। সবাই অস্ফূট শব্দ করে ওঠে। সত্যিইতো পশ্চিম আকাশ জুড়ে গাঢ় কালো মেঘ জমতে শুরু করেছে। সূর্যদেব ধীরে ধীরে ঢাকা পড়ে যায় গাঢ় কালো মেঘে।

কি বিপর্যয়! ঐ কালো মেঘ কলেবর বৃদ্ধি করে এগিয়ে আসবে। ঢেকে ফেলবে সমস্ত আকাশ। তারপর শুরু হবে তুষারপাত এবং তুষারঝড়। ভাবতেই পারি না পরিণামের কথা। ভাবতেই বেদনায় মনটা ভরে ওঠে। ঈশ্বরের উদ্যানের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। এবার মনে পড়ে এই অপরূপ উদ্যান ঈশ্বরের সৃষ্টি, তুষারঝড়ও

তারই সৃষ্টি। অমোঘ শক্তি নিয়ে ঈশ্বর রুখে দিতে পারে তুষারপাত আর তুষারঝড় !

দেখতে দেখতে গাঢ় কালো মেঘ নীচের উপত্যকা থেকে এগিয়ে আসে। ভূজবাসাধরের পাঁচিল টপকে কালো মেঘ এগিয়ে আসে আরো কাছে। এই গাঢ় কালো মেঘ বৃত্রাসুর আর তার সৈন্যসামন্ত। শুনেছি, মেঘের আর এক নাম বৃত্র। রামায়ণ-মহাভারত আর বেদ-পুরানের সেই দুর্ধর্ষ অসুর বৃত্র। এই অসুরের অত্যাচারে ত্রিভুবন প্রকম্পিত হত। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র অবশেষে দধিচীর অস্থি নির্মিত বজ্রের আঘাতে নিহত করেছিল বৃত্রাসুরকে। পুরাণে এ কাহিনী বিস্তৃতভাবে লেখা রয়েছে। এই কাহিনীর চিত্রকল্প লেখা রয়েছে ঋগ্বেদে। আকাশে মেঘ জমা আর প্রচণ্ড ঝটিকা আক্রমণে মেঘ বিপর্যস্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে আশ্রয় নেয় পর্বতগাত্রে। সেখান থেকে শীতল বাতাসে ঘনীভূত হয়ে মেঘ জল ও তুষাররূপে পড়তে থাকে। পর্বতগাত্র বেয়ে নামতে থাকে বৃষ্টির জল ও তুষারের ধারা।

আর সামান্য সময় অতিবাহিত হয়। তারপর প্রচণ্ড মেঘের গর্জন শুরু হয়। শো শো করে ঝড়ো হাওয়ায় গাঢ় কালো মেঘ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। প্রচণ্ড বজ্র নির্ঘোষে তুষারপাত আর তুষারঝড় শুরু হয়। তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকি। তাকিয়ে দেখি ঈশ্বরের ছোট্ট উদ্যানটি ধীরে ধীরে দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। হিমাদ্রি ডাকে। —চলুন, তাঁবুর ভেতরে। হ্যা, তাঁবুর ভেতরে আশ্রয় নিতে হবে। হিমাংশু আর বাসব একবার আমার দিকে তাকায় আর একবার তাকায় গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা ঈশ্বরের উদ্যানটির দিকে। কিন্তু কিছুই দেখতে পায় না।

তুষারপাত আর তুষারঝড় স্থায়ী হয় একটানা ৭২ ঘন্টা। তাঁবু ঢেকে যায়, হাল্কা তাঁবু ভেঙ্গে যায়। বসে বসে দেখি, আর তুষার পরিষ্কার করি। তাঁবুগুলো যাতে চাপা না পড়ে। অনাহার আর অনিদ্রায় মন যেন ভেঙ্গে যায়। শুধু অনাহার অনিদ্রার জন্য নয়, অসংখ্য বিচিত্রবর্ণের ফুলগুলোর অকাল মৃত্যুতে সকলেই যেন বিহ্বল হয়ে পড়ে। ঈশ্বরের উদ্যানের সমস্ত সৌন্দর্য মুহূর্তের মধ্যে মুছে যাওয়ায় মন ভেঙ্গে যায় বেদনায়।

সূর্য ওঠে তিনদিন পর। সামনে সেই তুষারে ঢাকা ঈশ্বরের উদ্যানের ধ্বংসাবশেষ দেখি। বাসব আর হিমাংশু আমার দিকে তাকায়। আমরা সবাই নীরব হয়ে যাই।

তপোবন

ঈশ্বরের উদ্যানের আর এক সুন্দর নাম তপোবন।

তপস্যার উদ্দেশ্যে কোন এক সুন্দর অতীতে মুনি ঋষি লোকালয় পরিত্যাগ করে এসেছিলেন সমতল ভূমি পেরিয়ে। তাঁরা এগিয়ে গিয়েছিলেন অনেক পথ পেরিয়ে অনেকদূরের দুর্গম বনভূমি, বন্ধুর পার্বত্য অঞ্চল, পথের সব বাধা অতিক্রম করে পৌঁছে গিয়েছিলেন নির্জন প্রকৃতির মাঝখানে। পাহাড় পর্বতের গুহা অথবা সুদৃশ্য উপত্যকার বুকে কুঠিয়া বেঁধেছিলেন। তাঁরা উপাসনা করতেন মানুষের কল্যাণ কামনায়। তপস্যা করতেন এমন পরিবেশের মধ্যে। তাঁরা তাই তপস্বী। তপস্বীরা যেস্থানে কুঠিয়া বেঁধে অবস্থান করেন, সেই স্থানকেই বলা হয়েছিল তপোবন।

তপোবনের কথা ভাবতেই চোখের সামনে ভেসে উঠতো অপরূপ পুষ্পোদ্যান, তার পাশেই ছোট ঝরণাধারার মৃদুগুঞ্জন, পুষ্পোদ্যানে বিচিত্র পাখীর কলকাকলী, নানা বর্ণের প্রজাপতির মিছিল—এ সবই এক সুন্দর চিত্র। কঠোর তপস্যার মাঝখানে নির্জনতা আর একাকীত্বতাকে ভুলিয়ে দিত সুন্দর পরিবেশ। নগর, জনপদ, সংসারের সব কলকোলাহল এড়িয়ে অতীতযুগের রাজা মহারাজারাও রাজ্যপাট আর বিলাসব্যসনের সব আকর্ষণ ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়তেন বানপ্রস্থ অবলম্বন করবার জন্য। তাঁরা সমতলভূমি পেরিয়ে শ্বাপদসঙ্কুল গভীর বনভূমি অতিক্রম করে খুঁজে বার করতেন তপস্যার উপযোগী স্থান। রামায়ণ-মহাভারত আর পুরাণে সেইসব পথের নিশানা লেখা রয়েছে। সে যুগের রাজা মহারাজা যেতেন হিমালয়ে। হিমালয়ের গভীরে বিভিন্ন উপত্যকায় দর্শন পেতেন মুনি ঋষিদের। সুন্দর পরিবেশ, বিচিত্র পুষ্পোদ্যান, ঝরণাধারা, ক্ষীণ স্রোতস্বতী, তুষারাবৃত পর্বতশিখর, এমনি পরিবেশের মধ্যেই সন্ধান পেতেন তপোবনের।

এমনি এক অপরূপ তপোবনের স্বপ্ন দেখতাম আমি কিশোর বয়স থেকেই। রামায়ণ-মহাভারতের দেশ খুঁজে খুঁজে একদিন আমি হাজির হয়েছিলাম তপোবনে। হিমালয়ের গহন কন্দর অতিক্রম করে পৌঁছে গিয়েছিলাম অপরূপ স্থানে। সেখানে পবিত্র গঙ্গা জন্ম গ্রহণ করেছে বরফের গুহার মধ্যে। সেই গঙ্গার ধারার দুপাশে উচ্চ গিরিশিরা···আর তার শীর্ষদেশে তুষারাবৃত পর্বতশিখর। সেই বরফের গুহা

মুখ পেরিয়ে বরফ আর পাথরের স্তূপ অতিক্রম করে পৌঁছে গিয়েছিলাম ছোট্ট সুন্দর উপত্যকায়। মাথার ওপরে শিবলিঙ্গ পর্বত শিখর। এই গিরিশিখরের খাড়া দীর্ঘ গিরিশিরা ধাপে ধাপে নেমে এসেছে। শেষ ধাপ প্রশস্ত হয়ে অপরূপ উপত্যকার সৃষ্টি করেছিল। এমন সুন্দর উপত্যকার সৃষ্টির পেছনে কোন কাহিনী লুকানো আছে কিনা জানি না। এই উপত্যকা শিবলিঙ্গ পর্বতমালার গিরিশিরার সমান্তরালে অবস্থিত। এই ছোট্ট সুন্দর উপত্যকাকে ভূগোল বিজ্ঞানীরা বলেন ঝুলন্ত উপত্যকা। ঝুলন্ত হিমবাহের মৃত্যু ঘটলে তারই মৃতদেহের সমাধি স্থানেই জন্মলাভ করেছিল ঝুলন্ত উপত্যকা। এই উপত্যকার সমান্তরালে প্রায় হাজারখানেক ফুট নীচে প্রবাহিত গঙ্গোত্রী হিমবাহ। গঙ্গোত্রী হিমবাহের ওপারে ভাগীরথী পর্বতমালা। মহারাজা ভগীরথের নামে চিহ্নিত এই পর্বতমালা। এই উত্যকার দক্ষিণে কেদারনাথ পর্বতমালা। কেদারনাথ আর শিবলিঙ্গ-পর্বত শিখরকে নিত্য বন্দনারত ভাগীরথী পর্বতমালা। এই শিবলিঙ্গের পাদদেশে অপরূপ উপত্যকার নাম তপোবন।

তপোবন সৃষ্টির রহস্য আমার জানা নেই, তবে না থাকলেও সৃষ্টি রহস্যের অনেক তথ্যই খুঁজে বার করা যায় পর্যবেক্ষণ করলে। মনে হয়, কোন এক সুদূর অতীতে শিবলিঙ্গ পর্বতমালার শিখর দেশের বরফ নেমে এসেছিল গিরি গাত্রবেয়ে। বেশ কিছুটা নীচেই গিরিশিরার কাছে বরফ সঞ্চিত হত। তারপর সঞ্চিত বরফ ধারায় ধারায় অবতরণ করতো হিমবাহ রূপে। হিমাবাহের জন্মের শুভক্ষণে তপোবনের সৃষ্টি হয়নি। মুনিঋষিরা দীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করে আসতেন না। সে কাজেই যুগের ইতিহাস জানা যায় না।

কিন্তু শিবলিঙ্গ পর্বত শিখরের গঠন-প্রকৃতি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, শীতে ও বর্ষার তুষারপাত হত প্রভূত। কিন্তু শিবলিঙ্গ পর্বতের খাড়া গিরিগাত্রে সমস্ত তুষার আশ্রয় নিয়ে সঞ্চিত হতে পারতো না। তাই খাড়া গিরিগাত্র বেয়ে প্রচণ্ড বজ্রনির্ঘোষে অবতরণ করতো সমস্ত তুষার। তারপর গিরিশিরার কোথায়ও কোন পাথরের খাঁজের মুখে তুষার হয়তো সাময়িক আশ্রয় পেতো। এই স্বল্পকালীন বিশ্রাম লাভেই নরম তুষারকণা পুনরায় ঘনীভূত হয়ে কঠিন বরফে পরিণত হত। তারপর খাঁজের মুখ থেকে উপচে পড়া কঠিন বরফ নেমে আসতো গিরিশিরার গা বেয়ে। উপচে পড়া বরফ অবশেষে অবিচ্ছিন্ন বরফের ধারার সৃষ্টি করেছিল। এই বরফের ধারার নাম হিমবাহ। শিবলিঙ্গ পর্বত শিখর থেকে উদ্ভূত এই উপচে পড়া বরফের ধারাকে শিবলিঙ্গের ঝুলন্ত হিমবাহ বলা যায়। কিন্তু ঝুলন্ত হিমবাহের গঠন-প্রকৃতি অদ্ভুত। এই হিমবাহ আকারে তেমন বড় নয়, সঞ্চিত বরফের পরিমাণও কম

নয়। ঝুলন্ত হিমবাহের আয়ুষ্কালও খুবই কম। শিবলিঙ্গ পর্বত শিখর থেকে অনিয়মিত বরফের যোগানের ফলে হিমবাহের গঠন-প্রকৃতিও তাই বিচিত্র হয়েছিল। শিবলিঙ্গ হিমবাহের আকৃতি-প্রকৃতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবার মতো কোন বিজ্ঞানী ছিলন না সে যুগে। তবে এই ঝুলন্ত হিমবাহ শিবলিঙ্গ পর্বতের গিরিশিরার সমান্তরালে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গোত্রী হিমবাহের সঙ্গেমিলিত হয়েছিল।

কতকাল অতীতের কথা জানা যায় না। হয়তো এক যুগ অতিবাহিত হয়ে গিয়ছে। শিবলিঙ্গ পর্বতের খাড়া গিরিগাত্র থেকে নিয়মিত বরফ সংগৃহীত হতে না পারায় হয়তো বা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন প্রকৃতিদেবী। অনিয়মিত বরফের যোগান, হিমবাহের ধারা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে শুরু হয়েছিল। তারপর একদিন এক সময়ে প্রকৃতির অমোঘ নির্দেশে স্তব্ধ হয়েছিল শিবলিঙ্গ হিমবাহের বরফের ধারা। হিমবাহের স্নাউট পিছিয়ে পিছিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল গিরিশিরার গায়ে। সেখান থেকে বরফের ধারা গলে গিয়ে সুন্দর স্বচ্ছ ঝরণার সৃষ্টি হয়েছিল। সেই জলধারা মৃত হিমবাহের চিহ্ন বুকে নিয়ে গিয়েছিল ঢালু পথে। হিমবাহের জীবদ্দশায় পার্শ্ব গ্রাবরেখার গা ঘেঁষে গিরিগাত্র প্রবহমান বরফের ঘর্ষণে ঘর্ষণে ক্ষয়ে গিয়েছিল। এই নির্দয় ঘর্ষণ-জনিত ক্ষয়ের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল ক্ষতের মতো গিরিখাত। তখন হিমবাহের তারুণ্যে বরফের ঢাল এসে নেমেছিল গিরিগাত্র বেয়ে। তুষারঝঞ্ঝা হিমানী সম্প্রপাত, শীত আর বর্ষায় প্রভূত তুষারপাত হিমবাহের যৌবন ধরে রেখেছিল বেশ কিছুকাল। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং কালের পরিবর্তনের ফলে বরফের যোগানও কমতে শুরু হয়েছিল ধীরে ধীরে। অবশেষে অকালবার্ধক্য এসে আক্রমণ করেছিল। জরাগ্রস্ত হিমবাহের ক্ষীণধারা সঙ্কুচিত হতে হতে এক সময় স্নাউট পিছিয়ে পড়তে শুরু করেছিল। অনিয়মিত বরফের যোগান. স্থানীয় আবহাওয়ার পরিবর্তন, তাপমাত্রার তারতম্য, পরিবেশের প্রতিক্রিয়ার ফলে একদিন সবার অলক্ষ্যে মৃত্যু ঘটেছিল মিবাহের। বরফের যোগান হয়ে গিয়েছিল বন্ধ, তাই গিরিগাত্রের ক্ষয়ের কার্যেরও সমাপ্তি ঘটেছিল। হিমবাহের কার্য স্তব্ধ হতেই গিরিখাত অবশেষে পরিণত হয়েছিল হিমবাহ উপত্যকায়।

হিমবাহ উপত্যকার পার্শ্বদেশের স্তূপীকৃত প্রাচীন গ্রাবরেখার শিলাখণ্ডগুলো তুষারপাত শীতাতপ আবহাওয়া আর প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ফেটে গিয়ে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়েছিল। কালক্রমে মৃত হিমবাহের স্নাউট থেকে আসা বরফগলা জলে সিক্ত করে নরম করেছিল ভাঙ্গা ভাঙ্গা শিলাখণ্ডগুলোকে। পরে আবহাওয়ার অত্যাচারে ভেঙ্গে আ-রা গুড়োগুড়ো হয়েছিল শিলাখণ্ড। সেইসব শিলাখণ্ড আরো

গুড়োগুড়ো মিহিবালুকণা, সর্বশেষে মৃত্তিকায় রূপান্তরিত হয়েছিল। এমনি করেই কোন এক অতীতকালে সবার অলক্ষ্যে প্রকৃতির অমোঘ নির্দেশেই জন্মলাভ হয়েছিল তপোবনের। মৃত্তিকার সৃষ্টি হতেই হয়তো কোন এক দুঃসাহসী উদ্ভিদ সাক্ষাৎ পেয়েছিল তপোবনের। তারপর বিভিন্ন উদ্ভিদ, একদল, দ্বিদল বীজপত্রযুক্ত উদ্ভিদ, ঘাস থেকে শুরু করে উন্নতধরনের অনেক উদ্ভিদই কেমন করে এমন হিমশীতল পরিবেশের মধ্যে বাসা বেঁধেছিল তপোবনে সে তথ্য জানা যায় না। সেই সময় তাদের জীবনধারণের যুদ্ধ, পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়ে উদ্ভিদের বিশাল পরিবারের কলোনী গড়ে তুলেছিল। সেখানকার বিচিত্র বর্ণের পুষ্পসম্ভার; উপযুক্ত জলের সংস্থান থাকায়, উদ্ভিদ সজীব সতেজ হয়ে সমস্ত শিলাখণ্ড আর মৃত্তিকার বুক আঁকড়ে ধরে শুরু করেছিল সাম্রাজ্য বিস্তার করতে। নানা বর্ণের ফুলে ফুলে সাজানো উপত্যকা, অপরূপ পুষ্পোদ্যান তপোবনের সৃষ্টি হয়েছিল সবার অলক্ষ্যে। সেই বিস্ময়কর তপোবনের কথাই আমি শুনেছিলাম। তপস্বীদের তপোভূমি তপোবন। এমন এক অপূর্ব স্বর্গীয় পুষ্পোদ্যানের মাথার ওপরে ধ্যানমগ্ন শিবলিঙ্গ পর্বত। তার শিরোদেশে রজতকাঞ্চনে শোভিত মুকুট। অদূরে ধ্যানস্থ কেদারনাথ পর্বত। সর্বাঙ্গ তার রজতকাঞ্চনে আবৃত। আর এই বিশাল পর্বত শিখর দুটির প্রত্যক্ষ দর্শনে ধন্য ও মুগ্ধ মহারাজা ভগীরথ। সকাল সন্ধ্যায় হিমানী সম্প্রপাতের বজ্র নির্ঘোষ, শিবলিঙ্গ ও কেদারনাথ তবু নিমিলীত নেত্রে ধ্যানস্থ। চারদিকের বিশ্ব প্রকৃতিও এমন বজ্র নির্ঘোষে অবিচলিত এমন প্রলয়ের দুন্দুভি বাজিয়ে তপোবন অসংখ্য ফুল ফুটিয়ে পূজোর আয়োজন করে। তপস্যার জন্য সুন্দর পরিবেশ, তাই তপস্বীরা এসেছিলেন গোমুখে। সেখানে গঙ্গার জন্মগাথা শুনে শুদ্ধ পবিত্র হয়ে এসেছিলেন তপোবনে।

কতকাল পূর্বে কোন্ তপস্বী প্রথম এসেছিলেন তপোবনে, সে কাহিনী লেখা নেই কোথাও। তপোবনের ছোট বড় গুহা রয়েছে বেশ কয়েকটা। সেইসব গুহায় কোন্ তপস্বী এসেছিলেন সুদূর অতীতে, কঠোর তপস্যা করেছিলেন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার জন্য সে সব তথ্যও জানা যায় না। তবে স্বামী চিন্ময়ানন্দ মহারাজ নামে একজন গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী সমতল ভূমি থেকে এসেছিলেন তপোবনে দুর্গম পথ অতিক্রম করে। তিনি গোমুখের কাছে কুঠিয়া স্থাপন করে মাঝে মাঝেই যেতেন তপোবনে। সেখানে অবস্থান করতেন তিনি। তপোবনের অপরূপ সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হতেন তিনি। তিনি অবশ্য তপোবনে গুহায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেছিলেন কিনা জানি না। তাঁর লেখা বইয়ে (Wanderings in the Himalayas) তপোবনের

কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। সেই স্থান সম্পর্কে তাঁর ছিল উচ্চ ধারণা। তিনি ছিলেন সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত।

স্বামী চিন্ময়ানন্দ ১৮৮৯ সনে দক্ষিণ ভারতের মালবারে-পালঘাটে জন্ম লাভ করেছিলেন। তাঁর পূর্বনাম চিপ্ পুকুট্টি। শৈশবে তাঁর পিতা তাঁকে ইংরেজী স্কুলে ভর্তি করেছিলেন। কিন্তু চিপ্ পুকুট্টি ইংরেজী স্কুল থেকে চলে আসতে চেয়েছিলেন। পরে অবশ্য তিনি ইংরেজী, মালয়ালম্ ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষালাভ করেন। এই সময় তিনি পণ্ডিতদের সাহায্যে বেদ-বেদান্ত অধ্যায়ন করেন। ক্রমে তিনি স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী রামতীর্থ, রামানুজ, শঙ্করাচার্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁদের নানা আদর্শ ও জীবনধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁর বয়স যখন বাইশ বৎসর, তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছিল। চিপ্ পুকুট্টি ইতিমধ্যে গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করতে শুরু করেছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি সংসারের বাঁধন থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন। আত্মীয়স্বজন যতই তাঁকে বিবাহ করে সংসারধর্মে ব্রতী করার জন্য চেষ্টা করছিলেন, চিপ্ পুকুট্টি ততই সংসার ত্যাগ করে হিমালয়ে গিয়ে সাধনভজন নিয়ে ব্রত থাকতে মনস্থির করছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি ভাবনগরে স্বামী পান্থিয়ানন্দ সরস্বতীর কাছে ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন আরম্ভ করেছিলেন। ১৯২০ সনে তিনি কোলকাতায় স্বামী সত্যানন্দের সঙ্গে বেশ কিছুকাল বাস করেছিলেন। স্বামী সত্যানন্দ দ্বারকায় শঙ্করাচার্যের দায়িত্ব নিয়ে চলে গিয়েছিলেন, সেই সময় চিপ্ পুকুট্টি বেলুড়মঠে স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, রামকৃষ্ণ মিশনের তিনি ছিলেন অন্যতম সন্ন্যাসী। চিপ্ পুকুট্টি বেলুড়মঠে কয়েকদিন অতিবাহিত করে তিনি চলে গিয়েছিলেন হরিদ্বার। হরিদ্বারে অবস্থান করে তিনি সাক্ষাৎ করেছিলেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দের সঙ্গে। তারপর ঋষিকেশে স্বামী মঙ্গলানন্দজী, স্বামী মুনমিজী, স্বামী প্রকাশানন্দজীর সাহচর্য পেয়েছিলেন। ঋষিকেশ থেকে তিনি মথুরা, বৃন্দাবন, পুষ্কর, দ্বারকা দর্শন করেছিলেন। ১৯২৩ সনে তিনি যথার্থই সংসার ত্যাগ করেন। প্রথমে তিনি গিয়েছিলেন পঞ্চবটী। সেখানে সন্ন্যাসী-স্বামী হৃদয়ানন্দের সঙ্গে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত করেছিলেন। অবশেষে নর্মদা তীরে সন্ন্যাস গ্রহণ করে স্বামী চিন্ময়ানন্দ মহারাজ নাম ধারণ করেছিলেন। সন্ন্যাস বেশে স্বামীজী অন্যান্য মহারাজদের সঙ্গে অযোধ্যা, প্রয়াগ দর্শন করে স্থায়ী কুঠিয়া বেঁধেছিলেন ঋষিকেশে। সেখানেই সাধনভজন করতে শুরু করেছিলেন।

১৯২৫ সন থেকে স্বামীজী শুরু করেছিলেন সুদূর হিমালয়ের দুর্গম তীর্থ ভ্রমণ। ১৯৩০ সন পর্যন্ত তিনি কৈলাস-মানস সরোবর দর্শন করেন। ঐ পথের বিখ্যাত

খেচরনাথ, থুলিঙ্গমঠ দর্শন করেন। অবশ্য কৈলাস ও মানস সরোবরে যাবার পূর্বে বেশ কিছুকাল উত্তরকাশীতে অবস্থান করেছিলেন। পরে উত্তরকাশীতে কুঠিয়া বেঁধেছিলেন ভাগীরথীর তীরে। সেখান থেকে তিনি যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ দর্শন করেছিলেন। বদ্রীনাথ অবস্থানকালে তিনি দর্শন করেছিলেন বসুধারা, সতোপন্থতাল। এই সময়ের মধ্যেই তিনি অমরনাথ, ত্রিলোকনাথ দর্শন করেছিলেন। পরে গঙ্গোত্রীতে এসে কুঠিয়া বেঁধে অবস্থান করতে শুরু করেছিলেন। গঙ্গোত্রীতে অবস্থানকালে মাঝে মাঝেই তিনি যেতেন গোমুখে। সেখানে গঙ্গার উৎস দর্শন করে মুগ্ধ হতেন তিনি। গোমুখের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে স্বামীজী শেষে গোমুখের কাছেই কুঠিয়া বেঁধে সাধনভজনে মগ্ন হয়েছিলেন। সেই সময় তিনি গোমুখের বন্দনা করে সুন্দর সংস্কৃত স্তব রচনা করেছিলেন। গোমুখে অবস্থান কালেই মাঝে মাঝেই স্বামীজী গঙ্গোত্রী অতিক্রম করে চলে যেতেন তপোবন। তপোবনের পরিবেশ তাঁকে সবকিছুই ভুলিয়ে দিত। তাই তপোবনে যাওয়া আর সেখানে বেশ কিছু সময় অবস্থান করা যেন তাঁর প্রধান কাজ হয়েছিল। কালক্রমে তপোবনের মাহাত্ম্য অনুভব করে সেখানে অনেক সময় অতিবাহিত করেছিলেন। অবশ্য তপোবন পেরিয়ে আরো অনেক দূরে চলে যেতেন কীর্তি হিমবাহের দিকে। স্বামী চিন্ময়ানন্দ মহারাজ বেশ কিছু সময় তপোবনে অবস্থান করে সাধনভজন করেছিলেন বলেই হয়তো সাধু মহাত্মা আর স্থানীয় অধিবাসীরা তাঁকে তপোবন মহারাজ বলে অভিহিত করতেন।

তপোবন মহারাজের বর্তমান প্রিয় শিষ্য স্বামী সুন্দরানন্দ গঙ্গোত্রীতে কুঠিয়া বেঁধে বসবাস করেন। হিমালয়ের বহু দুর্গম স্থানগুলোয় তিনি ভ্রমণ করে সুন্দর ফটো তুলেছিলেন। সুন্দরানন্দ গঙ্গোত্রী অঞ্চলের অনেকগুলো দুর্গম পর্বত শিখরেও আরোহণ করেছিলেন। হিমালয়ের অপরূপ সৌন্দর্য তুলে রাখবার জন্য তিনি অসংখ্য ছবি তোলার নেশায় আজও মগ্ন। তপোবন মহারাজের পর বিখ্যাত সন্ন্যাসী বিষ্ণুদাস মহারাজ ভুজবাসার ওপরের কুঠিয়া পরিত্যাগ করে ১৯৭১ সনে এসেছিলেন তপোবনে অবস্থান করবার জন্য। কিন্তু প্রচণ্ড তুষারঝড় আর তুষারপাতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় দুজন শিষ্য সহ তিনি প্রাণ হারান। ১৯৭২ সন থেকে তপোবনের গুহায় বসবাস করতে শুরু করেছিলেন রামানন্দ দাস। তাঁর পরিচিত নাম সিমলা মহারাজ। ঠিক সেই সময়ই অন্য একটি গুহায় বসবাস করতে শুরু করেছিলেন স্বামী শঙ্করপুরী। যতদূর জানি তাঁরাই ছিলেন তপোবনের স্থায়ী তপস্বী।

১৯৬৬ সনে প্রথম গোমুখের সামনে বসে বসে তপোবনের কথা ভেবেছিলাম। নানা তথ্য সংগ্রহ করবার জন্য গোমুখ পেরিয়ে উঠেছিলাম পাথরের ঢাল বেয়ে। গোমুখ থেকে মাত্র তিন চার মাইল দূরত্ব পেরুলেই তপোবন। দূরত্ব সামান্য হলেও পথ কিন্তু সহজসাধ্য নয়। মাত্র এই তিন চার মাইল পথ পেরিয়ে তপোবনে পৌছুতে চার ঘণ্টারও বেশী সময় লাগে। পথও দুর্গম এবং বিপজ্জনক। গঙ্গোত্রী হিমবাহের প্রান্তিক গ্রাবরেখার কাছাকাছি বড় বড় পাথরের স্তূপ। পাথরগুলো আবার আলগা। একটি পাথরের ওপরে পা ফেললেই নীরব-নিথর পাথরগুলো সরব সচল হতে শুরু করে। অসমান বিশাল বিশাল শিলাখণ্ড যেন ভীতিপ্রদ। কোন এক অমোঘ শক্তি বলে এগুলোকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছে সমস্ত হিমবাহের বুকের ওপরে। এইসব শিলাখণ্ডের ফাঁকে ফাঁকে তলার দিকে কাঁচের মতো স্বচ্ছ নীলাভো শক্ত বরফ। এইসব অসমান পাথরের পর পাথরের ঢাল পেরিয়ে এগুতে হয় তপোবনের দিকে। পথের কোন চিহ্নমাত্র নেই। এইসব বিশাল ঢেউ খেলানো পাথরের ঢালের মধ্যে ভয় আছে, মৃত্যুর ভ্রুকুটিও রয়েছে। তবু বড় বড় পাথর ডিঙ্গিয়ে কোন এক মহিমা মায়ায় আকৃষ্ট পথযাত্রীকে এগিয়ে যাবার স্বপ্ন দেখায়। আমি শুনেছিলাম এইসব বড় বড় পাথর ডিঙ্গিয়ে কখনো নীচে, কখনো বা ওপরে পাথরের মাথার ওপরে ওঠা, কখনো একটি পাথর থেকে লাফ দিয়ে অপর পাথরের ওপরে এগিয়ে যেতে হয়। এইসব বিশাল পাথরগুলো আবার মাঝে মাঝেই সচল হয়ে ভয় দেখাতে চায়। পথ চলার সমস্ত উৎসাহ-উদ্দীপনাকে স্তিমিত করে চলার গতি চায় থামিয়ে দিতে।

সেদিন একজন ভেড়া-বক্‌রিওয়ালার কাছে পথের বিবরণ শুনছিলাম। এমনি করেই সব ভয় ভীতি তুচ্ছ করে এগিয়ে যেতে হয় লক্ষ্যস্থলের দিকে। মোটামুটি নিরাপদ স্থানে পৌছেই উঁচু পাথরের মাথায় ছোট ছোট কয়েকটি পাথর সাজিয়ে চিহ্ন রাখতে হয়। কারণ, ঐ পথ দিয়েই তো আবার ফিরে আসতে হবে। পথের চিহ্ন না রাখলে পাথরের বিশাল ভীড়ের মাঝখানে পথ হারানোর ভয় থাকে, গোলক-ধাঁধার মাঝখান থেকে উদ্ধার পাওয়ার আশ্বাস হয়তো পাওয়া নাও যেতে পারে। এমনি করেই অচেনা অজানা পাথরগুলোকে চিনে রেখে পাহাড়ী মানুষগুলো তপোবনের পথ চিহ্নিত করে রাখে। তবে গঙ্গোত্রী হিমবাহ আড়াআড়ি ভাবে অতিক্রম করে ওপারে পৌছে যেতে হয়। সেখান থেকে মেরু হিমবাহের প্রান্তিক গ্রাবরেখার কাছাকাছি এলেই দেখা যাবে পায়ে চলা পথের চিহ্ন। ক্লান্ত পথচারী সেখানে বিশ্রাম নিতে পারবে। প্রান্তিক গ্রাবরেখা থেকে আসা মেরুগঙ্গার স্নিগ্ধ

হিমশীতল জলে সংক্রান্তি দূর করে আবার পথ চলতে হয়। চলতে চলতে পথের রেখা অনুসরণ করতে করতে দেখা যায় মেরুগঙ্গাকে। সরু জলধারা একে বেঁকে ঢালু পথ বেয়ে মিলিত হয়েছে ভাগীরথীর সঙ্গে। এই মেরুগঙ্গাই অচেনা পথকে চিনবার নির্দেশ দেয়।

১৯৬৭ সনের কথা মনে পরে। এক বছর আগের স্বপ্ন কল্পনা সার্থক হয়। প্রথম দিন গিয়েছিলাম পোর্টার আর শেরপাদের সঙ্গে করে গোমুখ থেকে তপোবনে। গঙ্গোত্রী হিমবাহের পার্শ্ব গ্রাবরেখার স্তূপীকৃত পাথরগুলোর ঢাল বেয়ে সেদিন পৌঁছেছিলাম হিমবাহের ওপরে। হিমবাহের বরফ ঢাকা পড়েছিল বড় বড় পাথর গুলোয়। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে দেখেছিলাম বিশাল বরফের ফাটল। ফাটলের ভেতরে বড় বড় পাথর গড়িয়ে পড়েছিল। উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে কোণাকুনি ভাবে হিমবাহ পেরিয়ে পৌঁছেছিলাম ওপারে পার্শ্ব গ্রাবরেখার পাথরগুলোর ওপরে। আবার সেই বড়বড় স্তূপীকৃত পাথরের ঢাল বেয়ে পৌঁছেছিলাম উচ্চ গিরিশিরার গায়ে। এই আরোহণের পথ বড়ই অদ্ভুত ও বিস্ময়কর। ভূপ্রকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশাল বিশাল শিলাখণ্ড সবার অলেক্ষ্য ভেঙ্গে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে বেশ মিহি বালুকণায় রূপান্তরিত হয়েছিল। বড় বড় পাথরগুলোর ফাঁকে ফাঁকে মিহি বালুকণা দেখে আমার মনে পড়েছিল, গোমুখের সামনে বালুকাময় ভূমির কথা। সেই বালুকাময় ভূমি সাধারণতঃ হিমবাহ সরে গেলে সেখানকার প্রান্তিক গ্রাবরেখার বিশাল বিশাল শিলাখণ্ডের স্তূপ আবহাওয়া আর পরিবেশের আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে মিহি বালুকণায় রূপান্তরিত হওয়া দেখতে পাওয়া যায়। হিমবাহের সঙ্কোচন ও মৃত্যুর প্রত্যক্ষ ফল দেখতে পাওয়া যায় পথ চলতে চলতে। উপত্যকার আকৃতির পরিবর্তনসাধন কার্যে সাহায্য করেছিল হিমবাহ। সেই কিশোরে হিমবাহের তারুণ্য, প্রৌঢ়ত্ব, সর্বশেষে বার্দ্ধক্যের অত্যাচারে ক্ষয়ে ক্ষয়ে তিলে তিলে নিঃশেষিত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। তখন মৃত্যুর পর মৃতাবশেষ, স্তূপীকৃত পাথরের কঙ্কাল ভেঙ্গেচুড়ে বিস্ময়কর পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছিল। হিমবাহের পশ্চাদপসরণ, মৃত্যু, উপত্যকার মৃত্তিকা পূর্ণ ভূভাগকে এগিয়ে দিতে সাহায্য করে। সেই উপত্যকার মৃত্তিকার বুকে নতুন জীবনের শুরু হয়। নতুন উদ্ভিদ এসে আবিষ্কার করে, বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়। মৃত্তিকা আর বালুকণা মিশ্রিত মৃত্তিকাই তো তাদের জীবনধারণের উপযোগী। হিমাবাহ উপত্যকার মৃত্তিকা পরীক্ষা করলে দেখা যায় এই মৃত্তিকার উর্বরা শক্তি খুবই বেশী। ভাবলে অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে। এই মৃত্তিকা আলু চাষের পক্ষে খুবই উপযোগী। এর সত্যতা লক্ষ্য করা যাবে, গোমুখের আড়াই কিলোমিটার ঢালের দিকে ভুজবাসায়।

১২৪০০ ফুট উচ্চতায় সন্ন্যাসীদের আশ্রমের কাছে অনেকটা যায়গা জুড়ে সুন্দর আলুর চাষ হয়। সামান্য পরিশ্রমে বেশ বড় বড় নিটোল আলু উৎপন্ন হতে দেখতে পাওয়া যায়। এই ভূজবাসাই সুদূর অতীতে গঙ্গোত্রী হিমবাহের স্নাউট ছিল।

গিরিশিরার কোলে পৌঁছেই দেখতে পাই পথের রেখা। এই পথের রেখা অনুসরণ করে এগিয়ে যাই মেরু হিমবাহ নিঃসৃত মেরু গঙ্গার কাছে। বেশ ছোট জলধারা কল-কল শব্দে বেয়ে নেমে গিয়েছে খাড়া ঢাল বেয়ে। বেশ কিছু নীচে ভাগীরথীর ধারার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। মেরু গঙ্গার জলধারার সামনে বিশ্রাম নিয়েই আবার এগিয়ে চলি সোজা পূর্বদিকে। তারপর মোড় ঘুরে এগিয়ে যাই সোজা দক্ষিণে। দীর্ঘ গিরিশিরা···যেন প্রাচীরের সৃষ্টি করেছে কোথাও কোথাও। তপোবনের পথ শেষ হয়ে যায় অল্প সময় পরেই। শুনেছিলাম, তপোবনের পথ আদৌ সহজসাধ্য নয়। নাম শুনেই আম্রবেতসকুঞ্জে ছাওয়া তপস্বীদের আশ্রমের চিত্র কল্পনা করলে ভুল করা হবে। কারণ, তপোবনের অবস্থান উচ্চ হিমালয়ে। সমুদ্রতল থেকে স্থানটির উচ্চতা ১৪৪০০ ফুট থেকে শুরু করে ১৫৬৫০ ফুট পর্যন্ত। উত্তর দক্ষিণে প্রায় মাইল দুয়েক দীর্ঘ আর আধমাইল প্রশস্ত তৃণময় প্রান্তর। প্রান্তরের পশ্চিম অংশে শিবলিঙ্গ পর্বত (২১৪৬৬)। শিবলিঙ্গের দীর্ঘ গিরিশিরা উত্তর দক্ষিণে প্রসারিত। এই গিরিশিরার পাদদেশে বিস্তৃত তপোবন। এই তপোবনের পূর্বপ্রান্তে সাত আটশ ফুট নীচে গঙ্গোত্রী হিমবাহ। হিমবাহের ওপারে ভাগীরথী পর্বতমালা। স্তব্ধ মৌন ধ্যানগম্ভীর মহারাজা ভগীরথ, তাঁর সামনেই শিবলিঙ্গ পর্বত। এ এক অপূর্ব দৃশ্য। রামায়ণে বর্ণিত মহারাজা ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের যেন সার্থক চিত্র। আমাদের পোর্টাররা মালপত্র মোটামুটি সমতল স্থানে নামিয়ে রেখেছিল। শেরপারা কাছেই জলধারার পাশে পাথর সাজিয়ে তাঁবু খাটাবার যায়গা হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই ওরা কিচেনের স্থানও নির্বাচন করে রেখেছিল।

তপোবনের সমস্ত অংশই সমতল ভূমি নয়। সমতল অংশটুকু দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই। এই সমতল ভূমিটুকু মসৃণ ঘাসে ঢাকা। আর এই তৃণভূমিটুকুকে বেষ্টন করে বয়ে চলেছে জলধারা কলকল শব্দে। এই জলধারা এসেছে শিবলিঙ্গের গিরিশিরার ওপর থেকে, এই জলধারার মূল উৎসস্থল সুদূর অতীত যুগের শিবলিঙ্গের পর্বত থেকে নেমে আসা হিমবাহ। তারই প্রান্তিক গ্রাবরেখায় পাথরগুলো স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে তপোবনের কোল ঘেঁষে। পাথরগুলোর বুকের মাঝখান থেকে নেমে এসেছে জলধারা। এই জলধারা অনুসরণ করতে করতে গিরিশিরার ওপরে দেখা যাবে

শিবলিঙ্গের ঝুলন্ত হিমবাহ। সেই ঝুলন্ত হিমবাহও প্রায় মৃত এবং খর্বাকৃতি। সমস্ত শীত, বর্ষার তুষার শিবলিঙ্গের গিরিগাত্র বেয়ে সঞ্চিত হয় গিরিশিরার ওপরে। সেই সঞ্চিত তুষারই বরফে রূপান্তরিত হয়। স্বল্প সঞ্চয় নিয়ে সামান্য বরফ মৃত হিমবাহকে আর পুনর্জ্জীবন করা যায় না। কিন্তু হিমবাহ না থাকলেও স্তূপীকৃত পাথরগুলোর ওপরে শীতের তুষারঝঞ্ঝা, হিমানী সম্প্রপাত আর গ্রীষ্মের দাবদাহের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বড় বড় পাথর ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়, শিশির আর জলধারায় সিক্ত পাথরগুলো আরও ভাঙ্গতে থাকে। শুধু এই ভাঙ্গার কাজ তাকিয়ে দেখি অবাক হয়ে। এইসব গুড়িগুড়ি পাথরের ঢালের মুখে অজস্র এনাফেলিস আর এপিলোবিয়াম পাথর ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে মিহি বালুকণায় রূপান্তরিত করবার সাহায্য করে। বড় বড় পাথরগুলোর ফাঁকে ফাঁকে দু-চারটে এপিলোবিয়াম সাহস করে ঘর বাঁধতে শুরু করেছিল। তারপর শিশিরকণা আর শীত-বর্ষার তুষার গলা জলে আকণ্ঠ স্নান করে এপিলোবিয়া বংশবৃদ্ধি করতে শুরু করে। এত উচ্চতায় এমন হিমশীতল পরিবেশকে সহ্য করে এমনি নানা ধরণের উদ্ভিদ প্রথম মাটি গড়ার কাজে মদত দিয়েছিল।

জলধারার গা ঘেঁষে ঘেঁষে সবুজ ঘাসের আস্তরণ। সেই ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দেয় নীল রঙের জেনসিয়ানা। জলধারার একপাশে অজস্র প্রিমুলার গাছ দেখি। ফুল ফুটে ছিল এপ্রিল-মে মাসে শীতের বরফ গলার সঙ্গে সঙ্গে। এর মধ্যে বর্ষার তুষারপাতের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল প্রিমুলার গাছগুলো। প্রখর সূর্য কিরণে বরফ গলে গিয়েছে, বরফের বিছানা ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করে আত্মপ্রকাশ করেছে প্রিমুলার শুকনো গাছগুলো।

সমস্ত তপোবন আগস্ট-সেপ্টেম্বরে অজস্র লাল-হলদে রঙের পোটেন্টিলা আর হলদে রঙের কম্পোজিটায় ভরে থাকে। জলের ধারে পাথরের গায়ে সিডামের দু'তিনটে প্রজাতি হলদে আর লাল ফুল ফুটিয়ে সবার দেহমন ভরিয়ে রাখে।

গিরিশিরার কাছে কাছেই বেশ ধাপে ধাপে গুড়িগুড়ি পাথরের ঢাল। আর সেই অঞ্চল জুড়ে অজস্র একোনাইট। আরো শ' কয়েক ফুট ওপরে গ্রাবরেখার অবিন্যস্ত পাথরগুলোর ফাঁকে ফাঁকে দেখি ব্লু পপির শুকনো গাছগুলো। এপ্রিল-মে মাসে ফুটেছিল অজস্র। সেপ্টেম্বরে ফুল শুকিয়ে বীজ হয়েছে। তপোবন মোটামুটি ছোট উপত্যকা। উপত্যকার শেষপ্রান্তের অনেক অংশই সমতল। সেখানে মাটি আর মিহি বালুকণা। বালুকণার কাছাকাছি বড় বড় প্রস্তরখণ্ড। প্রকৃতির কারিগর যেন বসে বসে দিনরাত পাথর ভেঙ্গে গুঁড়ো করে মিহি বালুকণায়

পরিণত করেছে সবার অলক্ষ্যে। কার নির্দেশে এই বিস্ময়কর সৃষ্টি! এই মিহি বালুকণা আর মৃত্তিকার বুকে অজস্র এনাফেলিসের গাছে ফুল ফুটিয়ে রেখেছে। এনাফেলিস রয়েলি উচ্চতার জন্য সব গাছগুলোর কাণ্ডে-পাতায় মসৃণ রেশমের মতো আবরণ। অবাক হয়ে দেখি।

প্রথমদিনের তপোবন দর্শন যেন ক্ষণিকের জন্য। পোর্টারগুলো মালপত্র গুছিয়ে পলিথিন সীট দিয়ে ঢেকে রেখে বিশ্রাম করে। সিগারেট খায়, গল্প করে আর কাশে। এই স্বল্প অবসরের মধ্যে তপোবন যেন আগ্রহভরে দেখি। আরো কিছু সময় থাকার ইচ্ছে হলেও বিদায় নিতে হয়। বেলা দুটো, সূর্যদেব পশ্চিম দিকে চলে যেতে শুরু করেছে। অনেকগুলো ছোট ছোট মেঘের টুকরো গঙ্গোত্রী উপত্যকা থেকে আকাশপথ বেয়ে বেয়ে এগিয়ে চলেছে। ঐ ছোট ছোট মেঘগুলো একসঙ্গে জড়ো হলেই বিপদ। শেরপাগুলো তাড়া দেয়—সাব্, মরশুম খারাপ হোতা হ্যায়··

বিদায় নিই ধীর পদক্ষেপে। তপোবনের গুহাগুলোর সামনে এসে দাঁড়াই। ঐ গুহাগুলোর মধ্যে কালো কাঠকয়লা জমে রয়েছে। উঁকি দিয়ে দেখতে চাই। ঐ পুরানা কাঠকয়লাগুলোর সময়কাল সম্পর্কে অনুমান করতে ইচ্ছে করে। তপোবন মহারাজ কি ঐ গুহার মধ্যেই বাস করতেন! তারও পূর্বে কোন্ মহাত্মা সাধু-সন্ন্যাসী এখানে এসেছিলেন দুর্গম পথ বেয়ে আরো অতীতে···সুদূর অতীতে রামায়ণ মহাভারতের যুগে যদি পৌঁছে যেতে পারতুম তাহলে হদিশ পাওয়া যেত · বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র বা ব্যাসদেব এমন এক অপরূপ তপোভূমিতে অবস্থান করে দীর্ঘ তপস্যা করেছিলেন। অন্যমনস্ক হয়ে কখন যেন পথ চলতে থাকি। চড়াই-উৎরাই আর পাথরের ঢাল বেয়ে পোর্টার আর শেরপাদের সঙ্গে সঙ্গে কখন যেন পৌঁছে যাই গোমুখে। আজকের যাত্রা সমাপ্ত হয়। আকাশ ইতিমধ্যে মেঘাচ্ছন্ন হয়েছে। গাঢ় কুয়াশা এসে চারদিক ঢেকে গেছে।

পরদিন সাজ সাজ রব। গোমুখের সব ব্যবস্থা গুটিয়ে ফেলার কাজ শেষ হয় ভোরবেলায়। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বেরুতেই সাড়ে আটটা বেজে যায়। আকাশ পরিষ্কার, সূর্যদেব ভাগীরথী পর্বতমালার মাথার ওপরে উঠেছে। চারদিকের ঠাণ্ডা হাওয়া কমে গিয়েছে। সূর্যের আলোর তেজ এসে লাগছিল। যাত্রা শুরু হয়। প্রথম দলে চলেছিল সব পোর্টার, শেরপার দল, প্রাণেশ, সুজন, করুণা, রামনাথ, অসিতদা আর বিজ্ঞানীর দল। তার পরের দলে স্বপন, হিমাদ্রি, অমূল্য, শঙ্কুদা আর আমি।

গোমুখের সীমানা পেরিয়ে ভুজবাসাধরের ওপরে উঠতে বেশ সময় লেগে যায়। গোমুখে যেখানে আমরা রাত্রিবাস করেছিলাম ঠিক তার ওপারে ভাগীরথীর পারে আমাদের পৌঁছতে হবে গঙ্গোত্রী হিমবাহ অতিক্রম করে। ভুজবাসাধরের কাছে এসে দেখি আমাদের দলের পোর্টারগুলো এগিয়ে চলেছে। আমাদের অবশ্য তাড়া নেই। কারণ, তপোবনে পৌঁছে আবার গোমুখে ফিরে আসতে হবে না। তপোবনেই বেশ কয়েকদিন অবস্থান করবো। ভাবতেই মনটা যেন আনন্দে ভরে গিয়েছিল। আমাদের পৌঁছুবার আগেই প্রথম দল নির্বাচিত স্থানে তাঁবু খাটিয়ে ফেলবে। কিচেন বানিয়ে মোটামুটি সব কিছু গুছিয়ে ফেলবে। আমরা পৌঁছে গিয়েই ছুক্কের হাতে চা খেতে পারবো। এই আনন্দেই শঙ্কুদা পথ চলছিল আর চীৎকার চেঁচামেচি করছিল। শঙ্কুদা এই পথে প্রথম। তবু বিপজ্জনক পথটায় বেশ স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে চলছিল সবার সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। অনেক সময় একটু সহজ সোজা পথ পেলেই অনেকের চাইতে বেশ দ্রুত এগিয়ে যেতে চাইছিল এবং ঠাট্টা করে বলছিল—চল্, চল্, পিছিয়ে পড়লে ওরা আবার আমাদের চা বিস্কুট খতম করে ফেলবে। আমি বলি—চা, বিস্কুট ঠিকই থাকবে। তাই বলে চীৎকার চেঁচামেচি করবেন না। দেখছেন না ওপরে আল্‌গা পাথর রয়েছে, চেঁচামেচি করলে পাথরগুলো খসে পড়তে পারে। আর খসে পড়লে ফল বুঝতে পারছেন তো?

শঙ্কুদা আমার দিকে তাকিয়ে বললো—কি বললি? আমার চীৎকার শুইন্যা ঐ পাথরগুলা হুঃমুর কইরা আমাগো মাথার ওপরে পরবো। ব্যাটা বাঙ্গালকে হাইকোর্ট দেখাইতে চাও? আমরা সবাই হো হো করে হাসি। শঙ্কুদা হেসে বলে···আমাকে বোকা মনে কইর‍্যা যা খুশী তাই বুঝাবি?

আমি বলি—মিথ্যা কথা নয়। এ বিজ্ঞানের কথা। বড় বড় অ্যাভাল্যান্স কিন্তু সামান্য শব্দ হতেই শুরু হয়েছিল এমন নজির রয়েছে।

শঙ্কুদা ধমক্ দেয়—চুপ্ কর। আমি তগো সাথে দু' একটা রসিকতা কমু, তাতে যদি পাথর পড়ে পড়ুক। হউক অ্যাভাল্যান্স···

গঙ্গোত্রী হিমবাহের সবচাইতে কষ্টকর আর বিপজ্জনক পথ পেরুতেই শঙ্কুদা এসে বসলো মেরু গঙ্গার ধারে। ওপরে ভাগীরথীর ধারা গোমুখ; বেশ উঁচু স্থান থেকে সুন্দর দেখাচ্ছিল। সুদূর অতীতে গোমুখ দর্শনের জন্য তীর্থযাত্রীরা ভাগীরথীর এই পার দিয়েই আসতেন। মেরু গঙ্গার ধার দিয়ে বেশ কিছুটা নীচে অবতরণ করলে প্রায় গোমুখের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া যায়। নীচে মেরু গঙ্গার ধারে ভিজে পাথরের গায়ে অজস্র এপিলোবিয়ামের গাঢ় গোলাপী ফুল অজস্র ফুটে

রয়েছে। শঙ্কুদা দেখে···সবাইকে দেখিয়ে বলে—ঐ দেখ্, বোটানিষ্ট নাইথানি এই সময় থাকলে দেখতো।

বোটানিষ্ট নাইথানি আর তার সহকারী সুরিন্দর সিং প্রথম দলের সঙ্গে এগিয়ে গিয়েছে। শঙ্কুদা বলে—না, ওকে আমাদের সঙ্গে রাখলে ভালো হতো।

মেরু গঙ্গার পাশ দিয়ে পরিষ্কার পায়ে চলা পথ। বকড়িওয়ালারা প্রতি বছরই আসে এদিকে। গঙ্গোত্রী থেকে ভাগীরথীর ওপার দিয়ে আসে তপোবনের দিকে। বেশ সুন্দর স্পষ্ট পথরেখা। সেই পথ এগিয়ে গিয়েছে; সামান্য চড়াই পথ···ঠিক শিবলিঙ্গ পর্বতের গিরিশিরার গায়ে। তারপর সামান্য উৎরাই···তারপর তপোবনের শুরু। শুরুতেই আমাদের অভ্যর্থনা করে অনেকগুলো এনাফেলিস গাছ··গাছে অজস্র ফুল। এনাফেলিস ফুলগুলো সাধু-সন্ন্যাসী, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদারবদ্রীর পুরোহিতরা খুবই পবিত্র বলে মনে করেন। এই ফুল দিয়ে পুজো করা হয়। দেবতাদের তুষ্ট করে এনাফেলিস। আমরা একবার তাকিয়ে দেখি··শিবলিঙ্গ যেন সামান্য ঝুঁকে রয়েছে আমাদের দিকে। বেলা একটা নাগাদ আমরা তপোবনের ভেতর দিয়ে মন্থর গতিতে চলতে থাকি, শঙ্কুদা নীরব। নীরব সবাই···এমন সুন্দর পরিবেশ চারদিকে। সোজা উত্তরে দীর্ঘ গিরিশিরার শীর্ষে তুষারমণ্ডিত পর্বত শৃঙ্গ। উত্তরপূর্বে আর একটি গিরিশিরা দূরে—চতুরঙ্গী হিমবাহের কিছুটা দেখা যায়। নীচে গঙ্গোত্রী হিমবাহ···। দীর্ঘ গঙ্গোত্রী হিমবাহ সোজা পূর্ব-দক্ষিণ দিক থেকে এসে মোড় ঘুরেছে। এমন সুন্দর পরিবেশের মধ্যে তপোবন। বেশ সাজানো-গোছানো উপত্যকা। প্রায় সমতল ভূমি, মাঝে মাঝে গিরিশিরার গা থেকে স্থানচ্যুত বড় বড় পাথরগুলো উপত্যকার মাঝখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে এলোমেলোভাবে। এই সব বড় বড় পাথরগুলো বেশ সুন্দর বর্গাকার। অনেকগুলো পাথর বেশ পুরনো।···কারণ, পাথরগুলোয় ফাটলের চিহ্ন রয়েছে। আর সেই ফাটলের ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে রয়েছে পোটেন্টিলার হলদে ফুলগুলো। এমন কঠিন পাথরের বুকে পোটেন্টিলা হঠাৎ বাসা বাঁধলো কি করে—এ যেন ভাবা যায় না। পথ চলার সত্যিকারের আনন্দ অনুভব করি, যখন সবাই এমন সুন্দর পরিবেশের মধ্যে সাজানো-গোছানো উপত্যকার তারিফ করতে শুরু করে তখন শঙ্কুদা বলে, উপত্যকাটি যদি বিশাল হোত, তবে আরো প্রশস্ত, আরো দীর্ঘ হোত। আর সেই উপত্যকা মসৃণ সবুজ ঘাসে থাকতো ঢাকা। অদ্ভুত লাগতো তাহলে।

এই উপত্যকা আরো প্রশস্ত, আরো দীর্ঘ হলে চারপাশের উদ্ভিদ সুন্দরভাবে বসবাস করতে পারতো। অবশ্য তপোবনের উদ্ভিজ্জ সংস্থান লক্ষ্য করলে মনে হয়,

উপত্যকায় বিশেষ বিশেষ ধরনের প্রজাতিই বসবাস করতে শুরু করেছে। গল্প করতে করতে বেশ স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে চলি জলধারার পাশ দিয়ে দিয়ে। জলধারার দু'পাশের সমতল স্থান সবুজ ঘাসে ঢেকে রয়েছে। এর মধ্যেই দেখি ঘাসগুলোর মধ্যে দুটি প্রজাতি ছোট্ট কলোনী গড়ে তুলেছে। এর মধ্যে ডায়াস্থোনীয়া হিমালয়ের অনেক বুগিয়ালে দেখতে পাওয়া যাবে। বৈদিনী বুগিয়াল ও আলি বুগিয়ালে এই প্রজাতির প্রাধান্য রয়েছে। তপোবনে নূতন সংযোজন পাও বালবোশ। ভিজে মাটির বুকে ছোট থোকা থোকা ঘাস। এই ঘাস সমস্ত পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করে থাকে। তবে উচ্চ হিমালয়ে বসবাস করার জন্য নিজেদের দেহ তেমনি উপযোগী করে ফেলে। পাও ঘাসের মূল গুচ্ছযুক্ত হলেও মুখ্য মূলের দিকটা স্থুল। তপোবনে সামান্য ঘাসের মধ্যে স্টিপার সন্ধান পাওয়া যায় না।

জলধারার মৃদু গুঞ্জন শুনতে শুনতে এগিয়ে চলি সবাই। জলধারার শব্দের সঙ্গে মেশানো অদূরের পোর্টার আর শেরপাদের কলরব শুনতে পাই। পথ শেষ হয়ে যায়, তাঁবুর কাছে পৌঁছেই শঙ্কুদা হাঁক ছাড়ে—হ্যারে ছুক্কে ?

ছুক্কে ছুটে এসে বলে, জী সাব! গুড আফটার নুন সাব্।

— থাক্, থাক্। আর ইংরেজী বকতে হইব না। বলি চা হয়েছে ?

—আভি মিলে গা সাব্।

—আভি মিলে গা মানে ? এর আগে এক প্রস্থ হয়ে গেছে নাকি ?

প্রাণেশ এগিয়ে আসে বলে, মিনিট দশেকের মধ্যেই হবে। আপনার জায়গাটা ঠিক করে দিই আগে।

বেশ বড় মেস্ টেন্ট খাটানো হয়েছে সমতল যায়গাটায়। তাঁবুটার কাছেই বেশ বড় একটা পাথরের গা ঘেঁষে ত্রিপল দিয়ে কিচেন বানানো হয়েছে। ছুক্কে ষ্টোভ ধরিয়ে জল গরম করছে। উচ্চতার জন্য জল সহজে ফুটতে চাইছিল না। তাঁবুর পাশেই ঘাসের ওপরে বসে সবাই আমরা রুকস্যাক্ থেকে এয়ার ম্যাট্রেস বার করে ফুলিয়ে নিই। এয়ার ম্যাট্রেস ফুলোবার জন্য ইনফ্লাটার ছিল সবার কাছেই। কিন্তু অত ধৈর্য কারো নেই। ফুঁ দিয়েই ফুলিয়ে ফেলল সবাই। এত উচ্চতা, নিম্নচাপ মাত্রায় সামান্য চলাফেরা করতেই ক্লান্ত হতে হয়, অক্সিজেনের স্বল্পতার জন্য এ ক্লান্তিকে কেউ তেমন আমল দিল না। ফুলানো এয়ার ম্যাট্রেসগুলো তাঁবুর ভেতরে সবার পছন্দ মত পেতে শ্লিপিং ব্যাগ বিছিয়ে রাখলো। তাঁবুর বাইরের চাইতে ভিতরেই বেশী গরম। বেলা দুটো, সূর্যদেব ঢলে যেতে চলেছে।

আকাশ পরিষ্কার। রোদ পড়ে গেলেই দেখতে দেখতে প্রচণ্ড শীত শুরু হবে। হাত-পা ঠাণ্ডায় জমে যেতে চাইবে। তারপর হিমশীতল বাতাস এসে সমস্ত উপত্যকাকে কাঁপিয়ে তুলবে। সামনেই প্রবহমান জলধারার মৃদু কলকণ্ঠ স্তিমিত হতে থাকবে। এক সময় নীরব হয়ে যাবে। তখন আর ইচ্ছে করলেও বাইরে বসে থাকা চলবে না। তখন সামনে কিচেনে গরম, রান্না ঘরের উষ্ণতা প্রচণ্ড শীতের মধ্যে অদ্ভুত সুখের আমেজ নিয়ে আসবে। তখন নানা গল্প, নানা কথা স্মৃতিচারণ, সবই অদ্ভুত সুখকর। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যেতে চলেছে। তাই এক ফাঁকে সব কাজ গুছিয়ে নিতে হবে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য দেহমনের প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। উচ্চ হিমালয়ের আবহাওয়া অত্যন্ত অনিশ্চিত। আর বসে না থেকে সবাই রুকস্যাকগুলো ঠিক মতো গুছিয়ে ফেলি। মোমবাতি, দিয়াশলাই কাছাকাছি রেখে বাইরে বেরিয়ে পড়ি। কিচেনের সামনে পাথরগুলোর ওপরে সবাই বসে পড়ি মগ হাতে নিয়ে। দক্ষিণে তপোবনের শেষ প্রান্তে হঠাৎ খাদের মতো···। সেখান দিয়ে বয়ে চলেছে কীর্তি হিমবাহ। হিমবাহের ওপারে দুগ্ধ ফেননিভ বরফের শয্যায় যেন কেদারনাথ শয়ান। বাঁদিকে আর একটি পর্বতশৃঙ্গ, যার নাম খরচাকুণ্ড। গঙ্গোত্রী হিমবাহ পূর্বে মোড় ঘুরেছে। আর হিমবাহের দু'ধারে খাড়া দীর্ঘ গিরিশিখা। এই গিরিশিখার শীর্ষদেশে তুষারাবৃত পর্বত শিখর। বহুদূরে গঙ্গোত্রী হিমবাহের শেষ প্রান্তে দেখা যায় চৌখাম্বা পর্বতশৃঙ্গগুলি। এই চৌখাম্বার শিখরগুলোর আর এক নাম বদ্রীনাথ পর্বতশৃঙ্গ। তপোবনে বসে বসে দর্শন করা যায় শিবলিঙ্গ, কেদারনাথ আর বহুদূরের বদ্রীনাথ পর্বতশৃঙ্গ।

কিচেনের কাছে পাথরগুলোর ওপরে সবাই বসি। তাঁবুর চারদিকটাকে ঘিরে রেখেছে জলধারা। জলধারার গায়ে গায়ে সবুজ ঘাস। আর সেই ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে গাঢ় নীল রঙের জেনসিয়ানা ফুটে রয়েছে। দূরে দূরে এনাফেলিসের ভীড়। সমস্ত তপোবন জুড়ে মাত্র দুটি এনাফেলিসের প্রজাতি দেখতে পাওয়া যায়। এনাফেলিস রয়েলির বড় বড় ফুল গোমুখের সামান্য উঁচু থেকেই অদৃশ্য হয়ে গেছে। এমনকি মেরু গঙ্গার ধারেও এনাফেলিস থাকলেও সেগুলো রিয়েলি নয় বলেই মনে হয়েছিল। হিমালয়ের প্রায় সর্বত্রই চার হাজার ফুট উচ্চতা থেকে ষোল হাজার ফুট উচ্চতায় এনাফেলিসের দশ বারোটি প্রজাতি বসবাস করে। তাঁবুর চার ধার দিয়ে প্রায় অর্ধবৃত্তাকার হয়ে জলধারা বয়ে চলেছে মৃদু গুঞ্জন করে। তাঁবুর সমস্ত স্থানটায় গুঁড়ি গুঁড়ি নুড়ি পাথর আর বালি। মনে হয়, পূর্বে এই সমস্ত স্থানটিতে

জল জমে ছোট্ট জলাধারের সৃষ্টি করেছিল। পরে আবহাওয়ার পরিবর্তন ও পরিবেশের ফলে জলের সংস্থান ঠিকমত না থাকায় কালক্রমে ছোট্ট জলাশয় শুকিয়ে গিয়েছিল। তার সর্বশেষ স্বাক্ষর হিসেবে ক্ষীণ জলধারা বয়ে চলেছে তির তির করে। অবশ্য এই জলের উৎস-উপরের গিরিশিখার গায়ে ছোট্ট ঝুলন্ত হিমবাহ। পরদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম; সবাই ব্যস্ত, সমস্ত মালপত্র নূতন করে ওজন করে বাধা-ছাঁদা। বেশ কিছু সংখ্যক পোর্টারের মাইনে দিয়ে বিদায় দেওয়া হয়েছে। কেবল বাছাই বাছাই কিছু সংখ্যক পোর্টার রাখা হয়েছে। এরাই সমস্ত মালপত্র আরো ওপরে পৌঁছে দেবে। এইসব পোর্টারদের মধ্যে একজন প্রচুর মাল নিয়ে নগ্ন পায়ে এসেছে তপোবনে। রামনাথ তাকে ছেড়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। সর্বশেষে তার পায়ের মাপে জুতোর জোগাড় করে দিয়েছিল। কিন্তু সে সবিনয়ে প্রত্যাখান করেছিল। কারণ, জুতো পড়ার অভ্যাস নেই আদৌ। এমন পরিবেশে আমরা পশমী মোজা, জুতো পরি, তাই রাত্রে শীত কষ্ট পাই। সে আবার ব্রাহ্মণ। সমস্ত পোর্টারদের জন্য সে রান্না করে। খালি গায়েই বসে বসে রান্না করে সবার জন্য হাসি মুখে। তার চোখে মুখে বিন্দুমাত্র কষ্টের চিহ্ন দেখি না। এজন্যই বিশ্বাস করতে হয় যে, সাধু সন্ন্যাসীরা নগ্ন দেহে বরফের রাজ্যে অবস্থান করতে পারে। অবশ্য শৈত্যবোধ অনেকটা আপেক্ষিক। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পরিবেশের মধ্যে বেশ কিছুদিন থাকলে শীতবোধ অনেক কমে যায়। আমি দু'একবার গোমুখে সাবান মেখে স্নান করেছি। অথচ ঐ গোমুখের ঠাণ্ডা জলে এক ধর্মান্ধ মানুষ স্নান করে মারা গিয়েছে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়, এমন ঘটনাও ঘটেছে। এক পরিবেশ থেকে মানুষ অন্য পরিবেশে পৌঁছুলে পরিবেশের প্রতিক্রিয়া বেশীদিন থাকে না। কালক্রমে ঐ পরিবেশই সহনশীল হয়ে যায়। উদ্ভিদের বেলায়ও তার বোধ হয় কোন ব্যতিক্রম হয় না। তবু প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, তুষারপাত··· হিমশীতল বাতাস ···এমন পরিবেশের মধ্যে বসবাস করার জন্য এনাফেলিস গাছগুলোকেই দেখি ঘুরে ঘুরে। প্রতিটি গাছের কাণ্ডে মসৃণ রেশমের মতো আবরণ দিয়ে ঢাকা। এই ঘন আবরণের ভেতর দেহত্বকে শীত, তুষার, হিমপ্রবাহ কিছুই করতে পারে না। অথচ হিমালয়ের নিম্ন উপত্যকায় এনাফেলিসের পাঁচ ছটি প্রজাতি দেখতে পাওয়া যায়। শীতের পোশাক পরে সেগুলো কিন্তু বসবাস করে না। উচ্চ হিমালয়ের পরিবেশের সঙ্গে সুন্দরভাবে মানিয়ে নিতে পারলেই জীবনযুদ্ধে জয় লাভ করা যায়। এনাফেলিস কম্পোজিট গোত্রের উদ্ভিদ। কম্পোজিটার আর এক নাম ডেইজি গোত্র। পৃথিবীর স্থলভূমিতে যতরকম সপুষ্পক উদ্ভিদ রয়েছে কম্পোজিটা

গোত্র সব চাইতে বৃহৎ। এই গোত্রে অনেকগুলো পরিবার রয়েছে। কম্পোজিটা গোত্রের সর্ব সাকুল্যে প্রজাতির সংখ্যা বিশ হাজারেরও বেশী। এনাফেলিস এমনি একটি সুন্দর পরিবার। এনাফেলিসের বাসস্থানগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে লক্ষ্য করা যায়, এই পরিবারের দুটি প্রজাতি তপোবনের অনেক স্থানেই ঘন কলোনীর সৃষ্টি করেছে। জল পিপাসা এদের খুবই কম। তাই ঝরণার ধারে ছোট্ট জলধারার কাছাকাছি নরম মাটির বুকে এনাফেলিস অমর হয়ে থাকতে চায়। তুষারপাত হোক্, হিমপ্রবাহ হোক, মধ্যাহ্নের দাবদাহ এনাফেলিসকে স্থির এবং অচঞ্চল রাখে।

সৃষ্টি ধ্বংস হতে চলেছে, এভি আচ্ছা, এনাফেলিস ভয় পেয়ে দুচোখ বন্ধ করে মৃত্যুর দিন গোণে না। অমর ফুল এই এনাফেলিস। তাই সেই ফুলের মালা দেখি কেদারনাথ, বদ্রীনাথ-এর গলায়। আরো দেখি গঙ্গোত্রীতে গঙ্গা মায়ের গলায় ঝুলতে। আগের দিনের দেখা তপোবনের স্বচ্ছ জলের ধারা লক্ষ্য করে গুঁড়ি গুঁড়ি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে এগিয়ে যাই। বেশ কয়েক শ' ফুট চড়াই ভাঙবার পর দেখি স্বল্প পরিসর প্লাটফরমের মতো। সেখানে ফুটে রয়েছে অজস্র নীল রঙের একোনাইট ভায়োলেসিয়াম। একোনাইটের এই একটি প্রজাতিই সমস্ত তপোবনের সামান্য ঢালের মুখে ফুটে রয়েছে অজস্র। গাঢ় নীল রঙ গাছগুলো ইঞ্চি ছয়েক দীর্ঘ। গাছের গোড়া খুঁড়লে দেখা যায়, শিকড় বেশ স্থূল হয়ে প্রায় ছোট চীনাবাদামের মতো আকৃতিবিশিষ্ট হয়েছে। একোনাইট ভায়োলেসিয়াম-এর মূল বিষাক্ত কিনা জানি না। জলধারার কাছাকাছি গুঁড়ি গুঁড়ি পাথরের ঢালে অজস্র ফুল বেশ দূর থেকেই দেখা যায়। প্রখর রৌদ্রকিরণে ঝিরঝিরে হাওয়ার মধ্যে কাছাকাছি একটা পাথরের ওপরে বসে বসে দেখা যায় শিবলিঙ্গ পর্বতশৃঙ্গ। ওপারে ভাগীরথী পর্বতশৃঙ্গগুলির গা বেয়ে নামতে নামতে ঈষৎ হলদে রঙের মাখনের মতো থোকা থোকা বরফ যেন ঝুলতে ঝুলতে থেমে গেছে। বোধহয় অত উঁচু থেকে ঝাঁপ দিতে গিয়ে থমকে গিয়েছে। অত উঁচু থেকে ঝাঁপ দেওয়া মানেই হল, ঐ ঝাঁপ তাদের মরণ ঝাঁপ। প্রায় একুশ হাজার ফুট উচ্চতা থেকে সোজা ঝাঁপ দিয়ে ষোল হাজার ফুটে গঙ্গোত্রী হিমবাহের বুকে আছড়ে পড়া। অবাক হয়ে দেখতে হয় ওপরের দিকটা। শেষটায় আমার চোখের সামনে প্রচণ্ড মেঘ গর্জনে ওই বরফ ঝাঁপ দেয় অসীম সাহসে। ঘড় ঘড় শব্দে বরফ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে ধুলোর মতো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গঙ্গোত্রী হিমবাহের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারপর গঙ্গোত্রী হিমবাহের বুকের ওপর থেকে গাঢ় ধোঁয়ার

মতো উঠতে থাকে উর্ধে, অনেকটা উঁচুতে উঠে আবার ছত্রাকার হয়ে ছড়িয়ে পড়ে চারধারে। এগুলোই হিমানীসম্প্রপাত। সামান্য সময়ের ব্যবধানেই দুবার হিমানীসম্প্রপাত ঘটে যায়। অত দূরের ঘটনা, মুহূর্তে দুর্ঘটনায় পরিণত হয়। সমস্ত অঞ্চল জুড়ে গাঢ় কুয়াশা এসে ঢেকে ফেলে চারদিক। বেশ হিমশীতল হাওয়া, গাঢ় নীল একোনাইট হারিয়ে যায় ক্ষণিকের জন্য। হিমানীসম্প্রপাতের মেঘ গর্জনে নীল একোনাইট বুঝি থর থর করে কাঁপে, ভয় পেয়ে বরফের এমন অপমৃত্যু দেখে থমকে যায়।

একোনাইটের অনেকগুলো প্রজাতির মধ্যে একোনাইট ভায়োলেসিয়াম খুবই সুন্দর। এমন গাঢ় রঙ অন্য কোন একোনাইটে দেখতে পাওয়া যাবে না। একোনাইট র‍্যানানকুলাস গোত্রের অন্যতম পরিবার। এই গোত্রে সর্বসাকুল্যে পনের শ'টি প্রজাতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। এর মধ্যে ছটি পরিবার দেখতে পাওয়া যাবে হিমালয়ের বিভিন্ন উচ্চতায়। এইসব পরিবারের মধ্যে অনেকগুলো সমুদ্রতল থেকে বার হাজার ফুট উচ্চতায় দেখতে পাওয়া যায়। এইসব পরিবার গুলো—

র‍্যানানকুলাস	দশটি প্রজাতি
ক্লিমেটিস	সাতটি প্রজাতি
অ্যানিমন	দশটি প্রজাতি
থ্যালিকট্রাম	পাঁচটি প্রজাতি
ডেলফিনিয়াম	দশটি প্রজাতি
একোনাইট	দশটি প্রজাতি।

একোনাইটের দশটি প্রজাতির মধ্যে অন্ততঃ দুটি প্রজাতির মূল বিষাক্ত নয়। আর সবগুলো প্রজাতিই বিষাক্ত। র‍্যানানকুলাস গোত্রের অতি প্রচলিত নাম বাটার্ কাপ্। এই সমস্ত পরিবারের ফুলগুলোর আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য প্রায় একই ধরণের। ফুলের পাপড়িগুলো যেন কাপের মতো। পর্যবেক্ষকরা এই কাপ্‌কে আবার বলেন মাখন রাখবার উপযোগী কাপ। পাপড়িগুলো পুরু। উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফুলের পাপড়ি পুরু হতে দেখা যায়। র‍্যানানকুলাস নামের প্রথম অংশ ল্যাটিন শব্দ 'র‍্যানা' থেকে এসেছে। র‍্যানা শব্দের অর্থ ব্যাঙ। প্রথম উদ্ভিদ বিজ্ঞানী হয়তো নিম্ন উপত্যকায় এই গোত্রের প্রজাতি পর্যবেক্ষণ করে প্রজাতির আকৃতি, প্রকৃতি, বাসস্থান সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। এই প্রজাতির ভিজে স্যাতসেতে মাটিতে বিশেষ করে জলাভূমির ধারে বসবাস করতে দেখা যায়। উদ্ভিদের কাছেই ব্যাঙ

বসবাস করতে দেখা যায়। এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে উদ্ভিদ বিজ্ঞানী প্রজাতির জাতি নির্ণয় করে নামকরণ করেছেন র‍্যানানকুলাস। র‍্যানানকুলাস গোত্রের প্রায় সব পরিবারের গাছগুলোর পাতা ও কাণ্ডের রস ঝাঁঝালো ও বিষাক্ত। তাই তৃণভোজী জীবজন্তু এই গাছগুলোকে স্পর্শ করে না।

একোনাইট র‍্যানানকুলাস গোত্রের অত্যন্ত বনেদী পরিবার। এই পরিবারের অনেকগুলো প্রজাতিই সমতল ভূমিতে বসবাস করতে অভ্যস্ত নয়। হিমালয়ের উচ্চ ভূমিতে বসবাসকারি সবকটা প্রজাতিরই ফুল অত্যন্ত সুন্দর দেখতে। একোনাইটের যে সব প্রজাতি বিষাক্ত, সেই সব প্রজাতির মূল স্ফীতকায়। এই স্ফীত মূলে একেনিটিন জাতীয় যবক্ষার বা অ্যালকলয়েড রয়েছে। একোনাইটের যে দুটো প্রজাতি বিষাক্ত নয় সেই প্রজাতির স্ফীত মূল টনিকের কাজ করে। বিষাক্ত একোনাইটের মূলের রস নিষ্কাষিত করে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

এইসব প্রজাতির মধ্যে প্রায় সমস্তগুলোতেই সাংঘাতিক বিষাক্তগুণ বর্তমান। অবশ্য বিষাক্ত একোনাইট গাছের মূলে ভেষজগুণ দেখতে পাওয়া যায়। হিমালয়ের বিভিন্ন উপত্যকায়, বিভিন্ন উচ্চতায় একোনাইটের দশটি প্রজাতি দেখতে পাওয়া যাবে। এইসব প্রজাতির ফুলগুলোর বর্ণ নীল হতে দেখা যায়। উচ্চ উপত্যকার একোনাইট গুলোর রঙ গাঢ় নীল। ঠিক আকাশের মতো নীল রঙের একোনাইটের দু'তিনটি প্রজাতিও দেখতে পাওয়া যাবে। দু-একটি প্রজাতির ফুলের রঙ বাদামী, ফিকে নীল সাদা রঙের মিশ্রণও দেখতে পাওয়া যায়। একোনাইটের ফুল খুবই সুন্দর দেখতে। সাত হাজার ফুট উচ্চতা থেকে শুরু করে ষোল হাজার ফুটেরও বেশী উচ্চতায় হিমালয়ের বিভিন্ন উপত্যকায় একোনাইটের প্রজাতি বিচিত্র ফুল ফুটিয়ে রাখে। অধিকাংশ প্রজাতিই সাংঘাতিক বিষাক্ত বলে ভেড়া-বকরি অত্যন্ত সযত্নে এড়িয়ে যায়। তাই হিমালয়ের বিভিন্ন উপত্যকায় এই জহর ফুল দেখতে পাওয়া যাবে আগস্ট মাস থেকে শুরু করে অক্টোবর মাস পর্যন্ত। তারপর ফুল ঝরে গিয়ে ফল হয়, ফল পেকে বীজ হয়। অক্টোবরের শেষে নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত একোনাইটের শুষ্ক ফল নিয়ে গাছ অপেক্ষা করতে থাকে শীতের তুষারপাতের জন্য। শীতের তুষারপাত, তুষারঝড় এসে সমস্ত গাছ চাপা দিয়ে দেয়। শুভ্র তুষারে সমাহিত একোনাইট হয়তো নীলকণ্ঠের সাধনায় সিদ্ধ হয়ে কণ্ঠের সামান্যতম জহর আত্মস্থ করে আগস্ট মাসে আত্মপ্রকাশ করে।

একোনাইটের দশটি প্রজাতির মধ্যে সাতটি সিকিম হিমালয়ের বিভিন্ন উচ্চতায় হুকার সাহেব ও থম্‌সন্ সাহেব চিহ্নিত করেছিলেন। এইসব একোনাইটের প্রজাতি

বিষাক্ত স্থান প্রমাণিত হয়েছিল। অবশ্য একোনাইটের পাতা ও কাণ্ড অত্যন্ত বিস্বাদ বলেই ভেড়া-বকরিরা এই গাছ নষ্ট করে না।

হিমালয়ের বিভিন্ন উপত্যকায় বসবাসকারী একোনাইটের প্রজাতিগুলির পরিচয় দিয়েছেন উদ্ভিদ বিজ্ঞানীগণ।

একোনাইট লিভ্ : (বিষাক্ত)

কাশ্মীর-হিমালয় উপত্যকা থেকে শুরু করে কুমায়ুন উপত্যকায় বৃক্ষসীমার কাছাকাছি একোনাইট লিভ্ অন্যান্য পরিবারের প্রজাতির মধ্যেই বসবাস করতে অভ্যস্থ। সাধারণতঃ সাত হাজার ফুট উচ্চতা থেকে শুরু করে এগারো হাজার ফুট উচ্চতায় দেখা যাবে এই প্রজাতির সাক্ষাৎ। বৃক্ষসীমার মধ্যে বলেই জুলাই-আগস্ট মাসে এই একোনাইট জাতের ফুল ফুটতে শুরু করে। তিন থেকে ছয় ফুট দীর্ঘ গাছ। ডালে ডালে অনেকগুলো করে হাল্কা হলদে, ফিকে লাল, সাদা প্রভৃতি মিশ্রিত রঙের ফুল ফুটে থাকে পথের ধারে ধারে।

হুকার সাহেব এই গাছটির ফুল, পাতা লক্ষ্য করে প্রজাতিটিকে একোনাইট লাইকোকটাম বলে চিহ্নিত করেছিলেন ১৮৪৬ সনে। তাঁর বিখ্যাত বই 'হুকার্স ফ্লোর অফ্ বৃটিশ' ইণ্ডিয়াতে একোনাইট লাইকোকটাম বলে উল্লিখিত হয়েছে।

একোনাইট মশ্চাটাম্ : (বিষাক্ত)

একোনাইটের এই প্রজাতিটি সাধারণতঃ কাশ্মীর উপত্যকায় এগারো হাজার ফুট উচ্চতা থেকে শুরু করে তেরো হাজার ফুট উচ্চতায় দেখতে পাওয়া যাবে। জুলাই-আগস্ট মাসে এই গাছে ফুল ফুটতে শুরু করে। ফুলগুলোর রঙ গাঢ় বাদামী। ছোট ছোট ঝাকড়া গাছ, প্রচুর ডালপালা। গাছের কাণ্ড থেকে শুরু করে ডগা পর্যন্ত পাতায় ভর্তি।

একোনাইট চাশ্মান্থাম্ : (বিষাক্ত)

একোনাইটের বিষাক্ত প্রজাতির মধ্যে এটি অন্যতম। কাশ্মীর-হিমালয়ে সাত হাজার থেকে বারো হাজার ফুট উচ্চতায় এই গাছ দেখতে পাওয়া যায়। জুলাই-আগস্ট মাসে এই প্রজাতির ফুল ফুটতে শুরু করে। ফুলের রঙ সাদা-নীল মেশানো আবার গাঢ় নীল। তিন থেকে চার ফুট দীর্ঘ গাছে প্রচুর পাতা দেখতে পাওয়া যায়।

সিকিম হিমালয়ে ভ্রমণের সময় হুকার সাহেব একোনাইট নেপিলাসের সমগোত্রীয় প্রজাতি একোনাইট ফেরোক্স, একোনাইট লুরিডাম, একোনাইট পামাটাম্ মারাত্মক বিষ। এইসব প্রজাতির মূলে একোনিটিন নামে এক ধরনের অ্যালকলয়েড

রয়েছে। এই অ্যালকলয়েডই সাংঘাতিক বিষ। একোনাইট চাস্মান্থামের মূলে প্রায় শত করা পাঁচভাগ অ্যালকলয়েড নিষ্কাশিত করা যায়। একোনাইট নেপিলামে মাত্র শতকরা একভাগের অর্ধেক পরিমাণ অ্যালকলয়েড আছে। সিকিম হিমালয়ের একোনাইটগুলোতে প্রচুর ভেষজগুণ রয়েছে বলে গাছগুলো খুবই মূল্যবান।

একোনাইট ভায়োলাসিয়াম : (বিষাক্ত ?)

কাশ্মীর হিমালয়ের উচ্চ উপত্যকা থেকে কুমায়ুন হিমালয়ের উচ্চস্থানে গ্রাব-রেখার ধারে ধারে একোনাইটের এই প্রজাতি দেখতে পাওয়া যায়। প্রায় এগারো হাজার ফুট উচ্চতা থেকে শুরু করে ষোল হাজার ফুটেরও বেশী উচ্চতায় ভায়োলাসিয়ামের গাঢ় নীল রঙের ফুল ফুটে থাকে, উচ্চ উপত্যকায় আগস্ট-সেপ্টেম্বর এমন কি অক্টোবরের শেষ সময় পর্যন্ত। অপেক্ষাকৃত নিম্ন উপত্যকায় (১১০০০ ফুট থেকে ১৩০০০ ফুট) গাছগুলো ফুট দেড়েক দীর্ঘ হয়। ডালপালায় ভর্তি গাছগুলোয় পাতার সংখ্যা আনুপাতিক ভাবে কম। প্রতিটি ডালে চার পাঁচটা করে ফুল ফুটে থাকে। উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গাছগুলো খর্বাকৃতি হয়। ডালগুলোর সংখ্যাও সীমিত। ফুলের পরিমাণ কম হলে ফুলের আকৃতি বড় হতে থাকে। ফুলের গাঢ় নীল আকাশের রঙ আর সমুদ্রের রঙকে যেন হারিয়ে দেয়। এমন উজ্জ্বল গাঢ় নীল রঙ যে, ছায়ার মধ্যে বা সন্ধ্যায় মনে হবে রঙ যেন ফিকে কালো। গাছের মূলে দেখা যাবে চীনাবাদামের আকৃতিবিশিষ্ট কন্দ। এই মূলে ভেষজগুণযুক্ত অ্যালকলয়েড রয়েছে। একোনাইট পর্যায়ে এই প্রজাতির ফুল সব চাইতে সুন্দর।

একোনাইট হিটারোফাইলাম :

একোনাইটের বিষাক্ত পরিবারের মধ্যে এই প্রজাতিটি আদৌ বিষাক্ত নয়। বরং এই প্রজাতির মূল মূল্যবান ভেষজগুণ যুক্ত। কাশ্মীর হিমালয়ের উপত্যকা থেকে শুরু করে গাড়োয়াল কুমায়ুনের প্রায় সর্বত্রই সাত হাজার ফুট উচ্চতা থেকে এগারো হাজার ফুট উচ্চতায় দেখতে পাওয়া যায়। বৃক্ষসীমার মধ্যেই মোটামুটি ফাঁকা স্থানে কম্পোজিটার ভীড়ের মধ্যে একোনাইট হিটারোফাইলাম বাদামী রঙের অথবা সবুজ আভাযুক্ত হালকা লাল রঙের অজস্র ফুল ফুটে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে. গাছগুলো প্রায় বারো ফুটের মতো। মূল স্ফীত, মূলে অ্যাটিসিন নামে অ্যালকলয়েড নিষ্কাষণ করা হয়। এই অ্যালকলয়েড টনিকের কাজ করে।

একোনাইট কাশ্মীরিকাম :

এই প্রজাতিটি কাশ্মীর হিমালয়ে দশ হাজার ফুট উচ্চতা থেকে শুরু করে বারো হাজার ফুট উচ্চতায় দেখতে পাওয়া যায়। আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে হালকা নীল

রঙের অজস্র ফুল ফোটে। এই গাছ দু ফুট দীর্ঘ হয়। মূল স্ফীত। মূলে বিষাক্ত অ্যালকলয়েড একোনিটিন পাওয়া যায়। একোনাইট নেপিলাস, একোনাইট মালটিফিডাম, একোনাইট রুটুণ্ডিফোলিয়াম, একোনাইট লুরিডাম, একোনাইট পাখাটাম্, একোনাইট ফেরোক্স, একোনাইট লাইকোক্টনাম—এই সাতটি প্রজাতি সিকিম হিমালয়ে সংগ্রহ করেছিলেন হুকার সাহেব।

পিণ্ডারী হিমবাহ অঞ্চলের বিখ্যাত একোনাইট ফ্যালকনারি সেপ্টেম্বর মাসে দেখতে পাওয়া যায়। ফুলের রঙ ফিকে নীল; মূল বিষাক্ত।

তপোবনের মনোমুগ্ধকর ফুল একোনাইট ভায়োলাসিয়াম দূর থেকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বেশ দীর্ঘ সময় ধরে ঘুরে ঘুরে দেখি ফুলগুলোকে। উদ্ভিদ বিজ্ঞানী আমার এক বন্ধু একোনাইটের গল্প করেছিলেন। একোনাইট পরিবারের প্রায় সবকটি প্রজাতির ফুলই সুন্দর। ফুলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে কোন কোন সৌন্দর্য-বিলাসী পার্বত্য অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করে উদ্যানে চাষ করেছিলেন। একোনাইট—এই নামের একোন্ শব্দটির গ্রীক অর্থ পাথর অর্থাৎ প্রস্তরময় পার্বত্য অঞ্চলে একোনাইটের জন্মস্থান। ফুলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলেও গাছের মধ্যে বিষাক্তগুণ রয়েছে, এ খবর জানতো এই পুষ্পবিলাসীগণ।

ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে মানুষের দেহের ওপরে একোনাইটের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণের কার্য শুরু হয়েছিল। সর্ব প্রথম ১৫২৪ সনে পোপ ক্লিমেন্টের (সপ্তম) নির্দেশে ডায়োসকরিডস্ দু'জন মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত আসামীদের একোনাইটের মূল খাওয়ানো হয়। আসামী দুজনের দেহের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছিলেন তিনি। প্রথম বার তেমন কোন প্রতিক্রিয়া না হওয়ায় আসামীদের পুনর্বার একোনাইটের মূল খাওয়ানো হয়েছিল। দ্বিতীয়বার খাওয়ানোর পর সামান্য সময়ের মধ্যেই প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছিল। মুহূর্তের মধ্যে আসামী শুয়ে পড়ে, কপালে মুখে প্রচণ্ড ঘাম শুরু হয়। নাড়ীর গতি অসম্ভব বেড়ে যায়। অনিয়মিত শ্বাস প্রশ্বাস, অসম্ভব শ্বাসকষ্ট, হাত পায়ে সাংঘাতিক খেচুনী, বমি, অসারে মলত্যাগ, সর্বশেষে হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যায়। প্রাগে ১৫৬১ সনে রাজার নির্দেশে মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা আসামীদের একোনাইটের মূল খাওয়ানো হয়েছিল প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার জন্য। কারণ, অনেকেরই ধারণা হয়েছিল একোনাইটে ভেষজগুণ রয়েছে, যা মানব কল্যাণে ব্যবহার করা যেতে পারে। একোনাইট পরিবারের অনেকগুলো প্রজাতির মধ্যে

বিষগুণ থাকায় সর্বপ্রথম রসায়ন বিজ্ঞানী গেইগার ও হেসি এই গাছের মূল থেকে বিখ্যাত যবক্ষার বা অ্যালকলয়েড একোনিটিন আবিষ্কার করেছিলেন।

একোনাইট গাছ থেকে টিংচার বার করে সর্ব প্রথম স্নায়ুমূল, চোখ ও কানের যন্ত্রণা উপশম কল্পে ব্যবহার করেছিলেন লণ্ডনের ডাঃ টার্নবুল। একোনাইট পরিবারের কোন কোন প্রজাতি যে শুধু বিষই বহন করে তাই নয়, তার মধ্যে অমৃতের স্পর্শও রয়েছে। হোমিওপ্যাথিক বিজ্ঞানী হ্যানিমান সাহেব একোনাইটের গুণাগুণ পরীক্ষা করেছিলেন। তারপর থেকেই একোনাইট নেপিলাস-হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার সর্বরোগে ব্যবহৃত হয়। একোনাইটের পরীক্ষালব্ধ ফল অনুসারে জানা যায় এই ওষুধে ভয় ও মৃত্যু হয়। মৃত্যু কল্পনা করে কাতর হওয়া অন্যতম লক্ষণ।

শঙ্কুদা অবশ্য হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস করেন না। তপোবনের চারপাশে অসংখ্য একোনাইট ডায়োলেসিয়াম দেখলেই হেসে বলতো—বুঝলাম, তোর একোনাইটের ওষুধের মানসিক লক্ষণ মৃত্যু ও ভয়…; তোর একোনাইট ভূতের ভয় তাড়াইতে পারবো ?

—ভূতের ভয়! আমি বলি।

—হ্যাঁ, আমাদের রামনাথ রাত্রিবেলায় ভূত দেখে।

—ভূত দেখে মানে ?

—হ্যাঁরে, জ্যোৎস্না রাতে সে ভাগীরথী পর্বতশৃঙ্গের দিকে দুটো ভূতকে এগিয়ে যেতে দেখেছিল গত বছর।

আমি অবাক হয়ে তাকাই।

শঙ্কুদা আমাকে বলে : বিশ্বাস করিস না ?

—কি বিশ্বাস ? রামনাথের ভূত দেখা ?

—হ্যাঁ।

আমি হাসি।

কিচেনে সবাই বসে। শঙ্কুদা জিজ্ঞাসা করে রামনাথকে। ভূতের গল্প শুনতে চায় সে। গোমুখে থাকতে রাত্রি বেলায় ভুতের গল্প করতো রামনাথ। ১৯৬৬ সনে সুজিত বসু দলবল নিয়ে গিয়েছিল ভাগীরথীর দ্বিতীয় শৃঙ্গ আরোহণের জন্য। শৃঙ্গ থেকে ফেরবার সময় খাড়া বরফের ঢাল বেয়ে নামবার সময় পা হড়কে দড়ি শুদ্ধ অমর রায়, শেরপা কার্মা, গিয়ালবু আর গোবিন্দরাজ পড়ে যায় নীচে। অমর রায়, কার্মা ও গিয়ালবু প্রাণ হারায় সেই দুর্ঘটনায়। তারপর থেকে অনেক পর্বতারোহী ঐ পথে গেলে ভাগীরথীর দ্বিতীয় শৃঙ্গের গায়ে দু'জন, কখনো বা তিনজন

পর্বতরোহীকে জ্যোৎস্নালোকে দেখতে পায়। রামনাথ স্বচক্ষে এই দৃশ্য দেখে ভয় পেয়েছিল। রামনাথের সঙ্গে পোর্টারগুলোও দেখেছিল একাধিক বার।

শঙ্কুদা আমার দিকে তাকিয়ে চা পান করতে করতে কথাগুলো বলে—কি বিশ্বাস করিস না?

আমি হাসি।

শঙ্কুদা বলে—হাসি নয়, দেখলে হাসি শুকাইয়া যাইবো, বুঝলা?

তপোবনের অবস্থান দেখতে দেখতে সংক্ষিপ্ত হতে থাকে। আমাদের সঙ্গী বোটানিষ্ট নাইথানীর সঙ্গে ঘুড়ে বেরাই সমস্ত তপোবন। শিবলিঙ্গের গিরিশিরার দিকে এগিয়ে নিম্নে পাথরের ঢালে ঢালে দেখতে পাই ফেনকমলের ছোট বড় অনেক ফুল। সস্যুরিয়া সাক্রার অতিপরিচিত ফুল ঠিক তুষার সীমার গা ঘেষে বসবাস করে। বরফের পাশাপাশি বাস, তাই ফুলের চারদিকটাই যেন ধব্‌ধবে সাদা তুলোয় মোড়া। শীত, তুষারপাত আর চারপাশের হিম শীতল পরিবেশের মধ্যে সস্যুরিয়া সাক্রার গাছগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে কালো কালো পাথরগুলোর ফাঁকে ফাঁকে। গ্রাবরেখার পাথরগুলো শীতাতাপে ভেঙ্গে গেছে। পাথরগুলো হয়তো বরফে ঢাকা ছিল। হয়তো বেশী দিনের কথা নয়। বরফ সরে যেতেই বরফ গলা জলে ভেজা পাথরগুলোর ফাঁকে ফাঁকে সস্যুরিয়া সাক্রা যেন বাসা বাঁধবার সুযোগ খুঁজছিল। বরফ সরে যেতেই দখল করে নিয়েছে সেই স্থানটি। সস্যুরিয়া সাক্রার একটি পাহাড়ী নাম যোগীপাদশা। জানিনা, এ অদ্ভুত নামকরণের কার্যকারণ। পাহাড়ী মানুষদের ভাষায় যোগীপাদশার অর্থ যোগীরাজ। পবিত্র ফুল। উচ্চ হিমালয়ে তুষারাবৃত অঞ্চলে এই ফুল যেন গভীর যোগ-নিদ্রায় মগ্ন।

সস্যুরিয়া পরিবারের এই ফুলের নামকরণ তাই সস্যুরিয়া সাক্রা। সাক্রা ল্যাটিন শব্দ। এই শব্দের অর্থ পবিত্র। সস্যুরিয়া পরিবারের সমস্ত প্রজাতির মধ্যে এইটিই পবিত্রম। সস্যুরিয়া সাক্রার মূল স্ফীত। স্ফীতমূল সাধু-সন্ন্যাসীরা সংগ্রহ করে শুকিয়ে গুঁড়ো করে দুধের সঙ্গে পান করে থাকেন। শোনা যায়, সস্যুরিয়া সাক্রার মূলে মূল্যবান ভেষজগুণ বর্তমান। সর্পদংশন, প্লেগ এবং নানা স্ত্রীরোগের পক্ষে এই গাছের মূল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

তপোবনে অবস্থান সংক্ষিপ্ত হতেই আমার যেন আকর্ষণ বেড়ে যায়। সারাদিন ঘুরে ঘুরে বেড়াই আর মাঝে মাঝে এনাফেলিসের ছোটখাটো কলোনীর কাছে বসি। শুনেছি, এনাফেলিসের কিছু কিছু প্রজাতি বসবাস করে সুইশ্‌ আল্পসে, আমেরিকার

পার্বত্য অঞ্চলে, এসিয়া মাইনরের উচ্চ উপত্যকায়। হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলেও ডজনখানেক প্রজাতি দেখতে পাওয়া যাবে। সিকিম-হিমালয় অঞ্চলে এনাফেলিস কনট্রোটা ও এনাফেলিস নেপালেনসিস্ দেখতে পাওয়া যায়। জোংরির উচ্চ উপত্যকায় এদের দুটি প্রজাতিকে বেশ বড় বড় কলোনী করে বসবাস করতে দেখেছি। তপোবনে অবশ্য এনোফেলিস কিউনিফোলিয়ার প্রাধান্যই দেখতে পাওয়া যায়। গাছগুলো ছোট, এক ফুটের বেশী দীর্ঘ হবে না। •গাছে বেশ কয়েকটি ডাল-পালা, পাতার সংখ্যা খুবই কম, ডগায় ডগায় অনেকগুলো করে ফুল। ফুলে হাত দিলে বোঝা যাবে না ফুলগুলো জীবন্ত, না শুকিয়ে মচ্ মচে হয়ে গিয়েছে! গাড়োয়াল কুমায়ুনে ডজনখানেকের মতো প্রজাতি দেখতে পাওয়া যাবে। তবে বারো হাজার ফুট উচ্চে বিভিন্ন উপত্যকায় মাত্র চার পাঁচটি প্রজাতি বসবাস করে। তপোবনে সামান্য চড়াই ভেঙ্গে এগুতেই একোনাইট ভায়োলাসিয়াম-এর কাছাকাছি হঠাৎ যেন আত্মগোপন করে বসবাস করে মাত্র তিন কি চারটি ডেলফিনিয়ামের গাছ। প্রজাতিটির পরিচয় পেয়েছিলাম ডেলফিনিয়াম ব্রুনোনিয়ানাম্। গাছের ফুলে সামান্য গন্ধ, অনেকটা মৃগনাভির মতো। হুকার সাহেব ১৮৪৮ সনের শেষের দিকটায় সিকিম হিমালয়ের প্রায় সতেরো হাজার ফুট উচ্চতায় নীল রঙের ফুল, সম্পূর্ণ এক নতুন ধরনের ডেলফিনিয়াম দেখেছিলেন। ফুলের গন্ধ অনেকটা মৃগনাভির গন্ধের মতোই। গন্ধের তীব্রতায় হুকার সাহেব সম্ভবতঃ মৃগনাভি হরিণের কথাই ভেবেছিলেন। হিমবাহ অঞ্চলে দেখা ডেলফিনিয়ামের নাম দিয়েছিলেন ডেলফিনিয়াম গ্লেসিয়ালি। এদের কাণ্ডে তুলোর মতো আবরণ আছে। হুকার সাহেবের সঙ্গে থমসনও ছিলেন। পরে অবশ্য গাড়োয়াল কুমায়ুনে পনের হাজার ফুটের ওপরে ঠিক ডেলফিনিয়াম গ্লেসিয়ালির মতোই একটি প্রজাতির সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। এই ফুলের গন্ধও মৃগনাভির মতোই, তবে তীব্র বা উগ্র ঝাঁঝালো নয়। তপোবনের ডেলফিনিয়ামের গন্ধ বেশ দূর থেকেই পাওয়া যায়। ফুলের বর্ণ সামান্য ফিকে নীল। গাছের কাণ্ডে যথারীতি তুলোর মতো আবরণ। একটি গাছে ডাটির মধ্যে ফুঠে অন্তত গুচ্ছখানেক ঘন সন্নিবেষ্টিত ফুল। আকৃতি ও গঠন প্রকৃতির সঙ্গে একোনাইট ভায়োলাসিয়ামের সঙ্গে বিন্দুমাত্র মিল নেই।

ডেলফিনিয়াম র‍্যানানকুলাস বর্গের অন্তর্গত ছোট্ট পরিবার। হিমালয়ের প্রায় সর্বত্রই দশ হাজার ফুট উচ্চতা থেকে শুরু করে সতেরো হাজার ফুট উচ্চতায় এদের বসবাস করতে দেখা যায়। বড়ই কষ্টসহিষ্ণু এই প্রজাতি। জলের সংস্থান

নেই। তাতে কি? মৃত্তিকায় রস নেই, তার জন্য কোন অসুবিধা নেই। রুক্ষ পাথরের ফাঁকে সামান্য শিশির ভেজা আদ্র তাতেই তুষ্ট ডেলফিনিয়াম। উচ্চ উপত্যকায় রুক্ষ এবং শুষ্ক পরিবেশের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা করে বেঁচে থাকতে শিখেছে। বাতাসে অক্সিজেন আর কার্বন ডাই-অক্সাইডের স্বল্পতা, হিমশীতল ঝড়ো বাতাস এসে চারদিকের আবহাওয়াকে শুষ্কতায় ভরিয়ে দেয়। তবু সরস হয়ে বেঁচে থাকার যুদ্ধে জয়ী হয় ডেলফিনিয়াম। হিমালয়ের বিভিন্ন উচ্চতায় ডেলফিনিয়ামের সাত আটটি প্রজাতি দেখতে পাওয়া যায়। কয়েকটি প্রজাতির আকৃতি-প্রকৃতির সঙ্গে একোনাইটের আকৃতির বেশ মিল দেখা যায়। প্রথম দৃষ্টিতে অনেক সময় ভুলও হয়ে যায়। জলধারার কাছে দেখি জেনসিয়ানা স্টিপিটাটা। পনোরো হাজার ফুট উচ্চতায় জেনসিয়ানার এই একটি প্রজাতিই হাসি মুখে অভ্যর্থনা জানায় অভ্যাগতদের। জেনসিয়ানার এই প্রজাতিটি বেশ কুলীন। আকারে বড়, ফুল-গুলোর পাপড়িতে নীল রঙের ছোপ লাগানো। গাছগুলো অনেকটা লতানো, খুবই ছোট ছোট প্াতা, একসঙ্গে ঠাসাঠাসি হয়ে কয়েকডজন ফুল ফুটিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। জেনসিয়ানা অবশ্য জেনসিয়ানাসিয়া বর্গের মুখ্য পরিবার। ছোট্ট পরিবার হলেও আটশটি প্রজাতি রয়েছে। তার মধ্যে হিমালয়ে জেনসিয়ানার প্রজাতির সংখ্যা ডজনখানেকের মতো। জেনসিয়ানা খুবই সৌখীন প্রজাতি। উপযুক্ত পরিবেশ এবং আবহাওয়া অনুকূল হলে জেনসিয়ানা চোখ মেলে তাকায়। ভিজে মাটি, নীল আকাশ, হিমশীতল বাতাস এই প্রজাতির অত্যন্ত সুখপুর্ণ পরিবেশ।

জেনসিয়ানার গা ঘেষে বসবাস করতে দেখা যায় পোলাইগোনাম। খুবই ছোট ছোট গাছ, একরকম ঘাসের মতোই পাতা। তবে পাতায় শিরাবিন্যাস দেখলে বোঝা যায়, পোলাইগোনাম একদল বীজপত্রী গাছ নয়। গাছের কাণ্ডের চাইতে মূলই যেন দীর্ঘ। প্রধান মূল আর তার শাখা-প্রশাখা আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রাখতে চায় মাটিকে। এমন সুন্দর মাটির বুকে অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হয়ে পোলাইগোনাম বাসা বাঁধে। বসে বসে দেখি আর অবাক হই। গাছগুলো ক্ষুদ্র হলেও সব কিছুই যেন বোঝে। মানুষের মতো কথা বলতে পারে না। সাড়া দেয় না দুঃখ-বেদনার স্পর্শে। ভয় পেলে আত্মরক্ষার জন্য পালাতে পারে না। মানুষের জটিল ও বিচিত্র চরিত্রের পরিচয় এরা জানতে পারে না। কারণ, পরিবেশ আর উচ্চতাজনিত অসুবিধার জন্য বহু সংখ্যক মানুষ এখানে আসতেই পারে না। এই পরম সান্ত্বনা, নিশ্চিন্ত আশ্বাস, তাই হয়তো নিশ্চিন্তে বাসা বেঁধে বসবাস করতে পারে।

তপোবনের অপেক্ষাকৃত ঢালু দিকটা জুড়ে অসংখ্য পোটেন্টিলার হলদে ও লাল

ফুল দেখি। দুটি প্রজাতির-পরিচয় সংগ্রহ করেছিলাম পোটেন্টিলা গেলিডা আর পোটেন্টিলা এরগাইরো ফাইলা। প্রথমটির ফুলের রঙ গাঢ় হলদে, দ্বিতীয়টির ফুলের রঙ গাঢ় গোলাপী। শিবলিঙ্গের গিরিশিরার দিকটায় পুরনো গ্রাবরেখার ভাঙ্গা ভাঙ্গা পাথরের ঢালের কাছে খুঁজে বার করি নীল পপির গাছ। এই গাছের নাম মেকানপসিস্ ম্যাকুলিয়েটা। তপোবনে এই একটি প্রজাতিই দেখতে পাওয়া যায়। প্রাক্-বর্ষার ফুল, তাই বর্ষার শেষে ফুল ঝরে শুকিয়ে গেছে। গাছের বীজ শুকিয়ে ঝরে পাথরগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ছড়িয়ে পড়েছে হয়তো। আবার আগামী বছর গাছ হবে, ফুল ফুটবে। জলধারার কাছেই দেখি প্রিমুলা নিভিয়ালিস। গাছ শুকিয়ে গেছে। বেশ বড় একটা পাথরের আড়ালে একটি গাছ বেঁচে রয়েছে।

এমনি ঘুরে ঘুরে দেখি শ্যাক্সিফ্রাগা, সস্যুরিয়া সাক্রা। তপোবনের স্বল্প পরিচিত উপত্যকায় বুগিয়াল সৃষ্টি হবার সুযোগ না ঘটলেও বুগিয়ালের উপযোগী ডায়াম্থোনিয়া, পাও···এইসব ঘাসের সাক্ষাৎ পাই। হয়তো এই সব ঘাস ধীরে ধীরে তপোবনের সমস্ত অঞ্চল গ্রাস করবে। সমস্ত পাথর ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে বালুকণায় পরিণত হবে। তখন ডায়াম্থোনিয়া আর পাও ঢেকে ফেলবে সব কিছু।

তপোবন দেখা যেন শেষ হয় না। কিন্তু বিদায় নেবার সময় এসে যায়। সারাদিন ঘুরে ঘুরে দেখি, তবু যেন ক্লান্তি নেই দেহে-মনে। ভুলে যাই সব কিছু। হঠাৎ মনে হয়, আমার ফেরার সময় হয়েছে। দ্রুত পা চালিয়ে তাবুর কাছে এসে অবাক হয়ে ভাবি। এই কি সেই তপোবন! তপোবনে মুনি-ঋষির কুটির কোথায়? শুনেছি কণ্বমুনির আশ্রম ছিল নন্দপ্রয়াগের কাছাকাছি কোথাও। হিমালয়ের এমন উচ্চতায় শিবলিঙ্গ পর্বতশৃঙ্গের পাদদেশে এই অপরূপ পরিবেশের মধ্যে তপোবন। এ তপোবনে মহামতি ব্যাসদেবও তো আসতে পারতেন! ব্যাসদেব বদ্রীনাথ পেরিয়ে গিয়েছিলেন কৈলাস-মানস সরোবর। তপোবন তো তাঁর কাছে এমন কিছুই ছিল না! আমার অনেক প্রত্যাশা, অনেক প্রশ্ন আর আগ্রহের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারি না কিছুতেই। তাই তপোবন আমাকে বার বার হাতছানি দিয়ে ডাকে!

—▬—

নন্দনকানন

I will lift up mine eyes
Unto the Hills.
From whence cometh
My help.

আমি দুচোখ মেলে তাকিয়ে দেখবো ঐ পাহাড়গুলো। সেখান থেকে হিমেল হাওয়া কিছু আশা-ভরসার আশ্বাস নিয়ে আসবে আমার কাছে। সেই হিমেল হাওয়ার সাথে সাথে পেজা তুলোর মতো তুষার কণা উড়ে এসে আড়াল করতে চাইবে নীল আকাশটাকে। চারপাশের সবুজ আঙ্গিনায় শ্বেত-শুভ্র আস্তরণ বিছিয়ে দিতে চাইবে। তবু আমি ব্যাকুল প্রতীক্ষা ভরা চোখ মেলে তাকিয়ে দেখবো ঐ পাহাড়গুলো। কারণ, আমি নিশ্চিতরূপে জানি, ঐখান থেকেই আসবে অভয় আশ্বাস। ঐ নির্জনতা, নিঃসঙ্গতা আমার প্রতীক্ষার মাঝখানে হতাশা আনতে পারবে না। আমার মুগ্ধ দৃষ্টিতে আনতে পারবে না একঘেয়েমীর ক্লান্তি। বিষণ্ণতায় ভারাক্রান্ত করতে পারবে না আমাকে। আমার চারপাশের সুউচ্চ পাহাড়ের দুর্ভেদ্য প্রাচীর টপকে মাঝে মাঝেই গাঢ় কুয়াশা এসে ঢেকে ফেলতে চাইবে। সূর্যের প্রখর কিরণ আসবার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা সরে যেতে চাইবে, পালিয়ে যেতে শুরু করবে পরাজিত হয়ে। গ্রীষ্মের প্রখর ঔজ্জ্বল্য আমার দৃষ্টি বিভ্রম ঘটাতে পারবে না। শীতের তুষারঝঞ্ঝার নির্মম হিমশীতল কষাঘাত পারবে না আমাকে জর্জরিত করতে। আমি শুধু দুচোখ ভরে দেখবো। পৃথিবীর এই বিশাল প্রাঙ্গণে আলো-আঁধারের লুকোচুরি খেলা আর রঙ বদলের পালা দেখতে দেখতে নানা রঙের মিছিলে আমি হারিয়ে যাবো। প্রকৃতি তার বিচিত্রবৈভব নিয়ে যে দেবতার পূজোয় মগ্ন, সেই দেবতার তীর্থে আমি যেন অনন্তকালের আশ্রয় লাভ করেছি। তাই আমি নির্ভীক, অচঞ্চল, আমি ধন্য।

গ্রীষ্মের দাবদাহ তার জ্বালা নিয়ে যখন শুভ্র তুষারের আস্তরণে চোখ বুলিয়ে নেবে, তখন সোনার কাঠি রূপোর কাঠি ছুঁইয়ে দেবে। প্রাণহীন পাথরের বুকে জাগবে ঘুমন্ত প্রাণের স্পন্দন। নীল আকাশের বুক থেকে মাঝে মাঝে কুয়াশার গাঢ়

আচ্ছাদন নেমে আসবে অতি সন্তর্পণে তীর্থের প্রাঙ্গণে। নানা বর্ণের ফুলের কোমল পেলব পাপড়ির ওপরে ছত্রছায়ার আয়োজন করবে। ধীরে ধীরে মাটি আর পাথর উত্তপ্ত হবে, ফেটে চৌচির হতে শুরু করবে। এর মধ্যেই বর্ষার শীতল ধারায় অবগাহন করবে শুষ্ক মাটি আর পাথর। বসন্ত আসবে নতুন সাজে। নীরস পাথর হয়ে উঠবে সরস সজীব। তার বুকে জেগে উঠবে বিচিত্র বর্ণের ফুলের মিছিল। প্রকৃতি তখন উৎসব সাজে মোহময়ী। উৎসবের আনন্দে মুখর প্রকৃতি একদিন ক্লান্ত হয়ে পড়বে। শীত আসবে, প্রচণ্ড তুষারঝঞ্ঝা নিয়ে উদ্বেল প্রকৃতিকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। চারপাশে তাই সে পরিপাটি করে বিছিয়ে দেবে তুষারের ঘন বিছানা। আমি কিন্তু ঘুমাতে পারি না শান্ত স্তিমিত প্রকৃতির উষ্ণ বুকের মাঝখানে থেকেও। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি দুচোখ ভরে। প্রকৃতির বুকের মাঝখানে প্রাণের স্পন্দন শুনে যাই দিনরাত।

মার্গারেট লেগীর সমাধির সামনে নীরবে-নিঃশব্দে বসেছিলাম আমি আর হিমাদ্রি। আমি সেই প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাওয়া অহল্যা কন্যার মতো মার্গারেট লেগীর কথা শুনছিলাম। অনেক দিনের কথা। ১৯৫৯ সনে আমরা প্রথম এসেছিলাম নন্দনকাননে।

শ্বেত শুভ্র মর্মর পাথরের ফলক। সুদূর লণ্ডন কিউ বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে বয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল কথা কটি। গাড়োয়াল হিমালয়ের বুকে স্থাপন করেছিলেন তার শুভানুধ্যায়ীরা! সমাধির সামনে বেশ কয়েকটি ডেলফিনিয়াম আর একোনাইট গাছ। অনেকগুলো গাছ, সবকটিতেই ফুল ফুটেছে। অদূরেই দু-তিনটে রোডোডেনড্রন গাছ আর তার গায়ে ছোট ছোট ভূজ গাছ। সমাধির কাছেই আর একটা বড় পাথরের গা বেয়ে লতিয়ে উঠেছে জিরানিয়াম নেপালেনসিস। অজস্র ফুল ফুটে রয়েছে। অদূরেই হ্বাইওার গঙ্গার কলকলধ্বনি, বামনীধর থেকে আসা উছল ঝরণা। অদূরের পোলাইগোনাম অ্যালপিনিয়ামের অজস্র ফুলের মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে চারধারে। এমন এক অপূর্ব পরিবেশের মাঝখানে রয়েছে মার্গারেট লেগী। পাথরের ফলকে লেখা রয়েছে :

In loving Memory of
Joan Margarate Legge
February 21st, 1885
July 4th, 1939.

মাত্র পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে মৃত্যু। মার্গারেট লেগী নন্দনকাননে এসেছিলেন

গোয়ালদাম থেকে। গোয়ালদামের ডাকবাংলোয় পুরনো রেজিষ্টারে তারিখ ছিল ২৫-৫-১৯৩৯। তাঁর মৃত্যুর তারিখ ৪-৭-১৯৩৯। ভেবেছিলেন, হিমালয়ের বুকে এই বিস্ময়কর উদ্যানে এসে ফুল সংগ্রহ করবেন। বয়সের কথা ভাবেন নি হয়তো।

নন্দনকাননের নামকরণ কি ভাবে হয়েছিল জানি না। এই কাননের হিন্দী নাম ফুলোকা ঘাটি। ১৯৩১ সনে কামেট শৃঙ্গ জয়ের পর অভিযাত্রীরা বদ্রীনাথ যাবার সংক্ষিপ্ত পথের সন্ধান করেছিলেন। তাই গামসালী থেকে পদযাত্রা শুরু করে পৌঁছে গিয়েছিলেন বানকুণ্ড হিমবাহে। এই হিমবাহ অনুসরণ করে তারা বিখ্যাত গুপ্তপাল (১৮৯০০ ফুট) অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন। গুপ্তখাল পেরুতে পারলেই বদ্রীনাথের পথ সংক্ষিপ্ত হবে। হিমবাহে পৌঁছতেই আবহাওয়া খারাপ হয়েছিল। এই আবহাওয়ার মধ্যে অভিযাত্রীরা পথ হারিয়ে ভুল করেই ভ্যুইণ্ডার উপত্যকায় প্রবেশ করেছিলেন ভ্যুইণ্ডার কান্তা গিরিপথ (১৭৭০০ ফুট) অতিক্রম করে। অভিযাত্রীদের মধ্যে হোল্ডসওয়ার্থ ছিলেন উদ্ভিদ বিজ্ঞানী। স্মাইথ ছিলেন প্রকৃতির পূজারী। ভ্যুইণ্ডার উপত্যকা সমৃদ্ধ হয়েছিল নানা রঙের ফুলে। স্মাইথ সাহেব মুগ্ধ হয়েছিলেন অপরূপ ফুলের সম্ভার দেখে। এই বিস্ময়কর ভ্যুইণ্ডার উপত্যকার নামকরণ করেছিলেন ভ্যালি অফ্ ফ্লাওয়ার। স্মাইথ সাহেব ১৯৩৭ সনে আবার এসেছিলেন ভ্যালী অফ্ ফ্লাওয়ারে, এডিনবার্গ বোটানিকাল গার্ডেনের জন্য ফুলের প্রজাতি সংগ্রহ করতে। অবশ্য ফুলের প্রজাতি সংগ্রহ করা ছাড়াও পর্বত শৃঙ্গ আরোহণের নেশাও ছিল তাঁর। তাঁর সংগৃহীত প্রজাতি কিউ বোটানিক্যাল গার্ডেনের বিজ্ঞানীদের মনে হয়তো সাড়া জাগিয়েছিল। তারই ফলশ্রুতি, মার্গারেট-লেগীর নন্দনকাননে আগমন।

অবশ্য ভ্যুইণ্ডার উপত্যকার প্রথম পরিচয় পেয়েছিলেন ১৮৪৮ সনে রিচার্ড স্ট্র্যাচী। তিনি ভ্যুইণ্ডার কান্তা গিরিপথ অতিক্রম করে পৌঁছেছিলেন ভ্যুইণ্ডার উপত্যকায়। ভ্যুইণ্ডার উপত্যকা অঞ্চল থেকে তিনি নানা ধরনের ফুলের প্রজাতি সংগ্রহ করেছিলেন। তারপর ১৮৬২ সনে ভ্যুইণ্ডার কান্তাগিরিপথ অতিক্রম করে কর্ণেল এডমণ্ড স্মাইথ ভ্যুইণ্ডার উপত্যকায় প্রবেশ করেছিলেন। ১৯০৭ সনে ডাঃ লঙস্টাফ ত্রিশূল পর্বত শিখর জয়ের পর কামেট শৃঙ্গ জয়ের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় প্রত্যাবর্তনের সময় ভ্যুইণ্ডার কান্তাগিরিপথ অতিক্রম করে পৌঁছে-ছিলেন ভ্যুইণ্ডার উপত্যকায়। হিমালয়ের ফুল পর্যবেক্ষণ তিনি করেছিলেন কিনা জানা নেই। ফুলে ফুলে সমৃদ্ধ ভ্যুইণ্ডার উপত্যকার মূল্যায়ন রিচার্ড ষ্ট্র্যাচী করেছিলেন। কিন্তু হিমালয় ভ্রমণ ও হিমালয়ে পর্বত অভিযান তখনও প্রসারিত হয়নি। সেদিক

দিয়ে এই উপত্যকার নব-মুল্যায়ন করে ফ্র্যাঙ্ক স্মাইথ নামকরণ করেছিলেন ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স। নন্দনকানন নামকরণ কি ভাবে হয়েছিল সে তথ্য অজ্ঞাত।

নন্দনকানন আমার প্রথম দর্শন ১৯৫৯ সনে। ঘাংঘরিয়ায় ফরেষ্ট ডাক বাংলো একমাত্র রাত্রিবাসের আশ্রয়। গভীর বন, বিশালাকায় ফার গাছ, মেপল গাছ। নীল আকাশ ঢেকে রেখেছিল। তাই সমস্ত অঞ্চল ছায়ায় ঢাকা। দিবারাত্র সর্বক্ষণ কুয়াশা এসে ফার গাছের ডগায় ডগায় আশ্রয় নেয়। সূর্য উঠতেই কুয়াশা কিছুটা উড়ে গেলেও কিছুটা ঝরে ঝরে পড়ে। দীর্ঘদেহী বৃক্ষগুলি যেন হঠাৎ থেমে গেছে ঘাংঘরিয়ায়। তাই দুপুরবেলা থেকেই নিম্ন-উপত্যকার আকাশের মেঘ আশ্রয় নেয় ঘাংঘরিয়ায় আকাশের বুকে। তারপর বিকেল হতেই ঝির ঝির করে বৃষ্টি শুরু হয়। তাই সমস্ত অংশটুকু স্যাৎসেতে, সন্ধ্যা হতেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা নেমে আসে। সারা রাতের বৃষ্টি, শিশিরপাত, বনভূমির তলদেশ তাই জলকাদায় ঢাকা। এমনি এক অদ্ভুত অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে আমাকে ঘাংঘরিয়ায় দু রাত্রি বাস করতে হয়েছিল। রাত্রিতে গভীর অন্ধকার, গাইড আমাদের সাবধান করে দেয় এই বলে যে, ঘাংঘরিয়ায় ভাল্লুকের উৎপাত রয়েছে। হয়তো এই অঞ্চলে ভ্রমণকারীর সংখ্যা খুবই সীমিত। তাই ভাল্লুকের সঙ্গে ভ্রমণকারীর সাক্ষাৎ হয় কদাচিৎ।

নন্দনকাননে যাবার আগেই আর একটি পথ চলে গিয়েছে লোকপালের দিকে। সেই লোকপাল থেকে নেমে আসা জলধারার নাম লক্ষ্মণ গঙ্গা। লোকপালে সুদৃশ্য হ্রদের ধারে ছোট্ট লক্ষ্মণের মন্দির রয়েছে। গাড়োয়ালের মানুষ লোকপালে আসে তীর্থ করতে। এই লক্ষ্মণ গঙ্গার জলধারা বহু কষ্টে পেরুতে পেরেছিলাম আমি আর হিমাদ্রি। অনেক পুরনো একটা কাঠের সেতু ছিল, সেই সেতুও ভেঙ্গে গিয়েছিল। তাই বড় বড় পাথর টপকে সন্তর্পণে এগুতেই জুতো-প্যান্ট ভিজে গিয়েছিল। খুব ভোরে বেরিয়েছিলাম। সূর্যের আলো তখনো মর্তে প্রবেশ করেনি। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় চলতে চলতে পৌঁছে গিয়েছিলাম ভ্যুইণ্ডার গঙ্গার ধারে। নদী পেরুবার জন্য পুরনো কাঠের সেতু রয়েছে। পুরনো সেতুর কাঠগুলো নড়বড় করছিল। ভয়ে ভয়ে নদী পেরিয়ে বেশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম। পরিষ্কার পথ, পাইন, দেওদার আর ফারগাছের ছায়ায় ছায়ায় অপরূপ পথ। ভ্যুইণ্ডার গঙ্গার ধার দিয়ে পথ এগিয়ে গিয়েছিল প্রায় মাইলখানেক। তারপর সোজা পূর্ব দিকটায় প্রশস্ত উপত্যকা। সঙ্গে সেদিনের গাইড ছিল কিষেন সিং। আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিল—সাব, এই দেখো নন্দনকানন।

বিশাল প্রান্তর, বড় বড় গাছগুলো যেন আকস্মিক যন্ত্রবলে ছোট হতে চলেছে। ভ্যুইণ্ডার গঙ্গার ওপার দিয়ে গিরিগাত্র বেয়ে কোন এক সুরসিক পুষ্পবিলাসী সারিবদ্ধ ভাবে রোডোডেনড্রন ক্যাম্পিন্যুলাটামের গাছ লাগিয়ে গেছেন। তার পাশাপাশিই বসবাস করছে ভুজ গাছগুলো। সেই অদৃশ্য পুষ্পবিলাসী···প্রচণ্ড তুষারপাত থেকে বাঁচার জন্যই বুঝি ভুজগাছগুলোকে বসিয়ে দিয়েছিলেন রোডোডেনড্রনগুলোর মুখ চেয়ে। গাইড আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। সামনেই বামনীধর গিরিশিরা। এই গিরিশিরা পশ্চিম থেকে পূর্বদিক পর্যন্ত প্রসারিত। সেখান থেকে আসা জলধারা ডিঙ্গোতে হয়েছিল লাফ দিয়ে···বড় বড় পাথরের ওপর দিয়ে। আরো একবার পা ভিজোতে হয়েছিল। তারপর চার পাঁচ ফুট দীর্ঘ পোলাই গোনাম অ্যালপিনিয়ামের ছোট্ট বন। সমস্ত গাছে অজস্র ফুল···সুগন্ধিযুক্ত ফুল। এই বন পেরিয়ে আরো দুটো জলধারা অতিক্রম করে পৌঁছে যাই নন্দনকাননে। গাইড প্রশস্ত প্রাঙ্গণের সামনে দিয়ে এসেছিল মার্গারেট লেগীর সমাধিস্থল।

সহজ সরল পথ, তাই ক্লান্ত হইনি আমরা কেউই। তবু সমাধির ধারে একটা বড় পাথরের ওপরে আমি আর হিমাদ্রি বসেছিলাম। পোলাইগোনাম অ্যাল-পিনিয়াম-এর একগুচ্ছ ফুল আস্তে নামিয়ে রেখেছিলাম সমাধিস্থলে।

পোলাইগোনাম অ্যালপিনিয়াম সাধারণতঃ আট হাজার ফুট উচ্চতা পর্যন্ত স্থান গুলোতে দেখতে পাওয়া যায় হিমালয়ের সর্বত্র। প্রায় পাঁচ ফুট উচ্চতা যুক্ত দীর্ঘ গাছ, অনেকগুলো ডালপালা। ডালগুলো বেশ মোটা গ্রন্থির মতো। পোলাই গোনাম শব্দের অর্থ পোলাস—গ্রন্থি। পোলাইগোনামের প্রজাতি দেখতে পাওয়া যাবে হিমালয়ের বিচ্ছিন্ন উচ্চতায়। সব চাইতে বড় ও দীর্ঘদেহী গাছ পোলাই গোনাম অ্যালপিনিয়ামের। এই গাছটির ফুল সুমিষ্ট গন্ধ। অসংখ্য ফুল ফুটে, সমস্ত উপত্যকা যেন ঢেকে রাখে।

মার্গারেট লেগী ছিলেন প্রকৃতি প্রেমিকা। তাই প্রকৃতির মাঝখানেই তিনি মিলিয়ে গিয়েছেন। ভেবেছিলাম, সমাধি স্থানে আরো কিছু ফুল সংগ্রহ করে ছড়িয়ে দেব। ভেবেছিলাম, ফুল সংগ্রহ করবো অনেক দূর থেকে। কিন্তু ফুল সংগ্রহ করার প্রয়োজন ছিল না। অজস্র ফুল, নানা বর্ণের ফুল সমাধির চারপাশে ফুটে রয়েছে। কাছেই একটা বড় পাথরের গা বেয়ে উঠেছে হলদে রঙের কোরাইডালিস্। গাঢ় গোলাপী রঙের ডেলফিনিয়াম আর একোনাইট। আর কয়েকটি পাথর বেয়ে উঠেছে জিরানিয়াম নেপালেনসিস্। গাঢ় গোলাপী রঙের অজস্র ফুল ফুটে যেন আলো

করে রয়েছ। অদূরে এনাফেলিস্ আর আস্টার। তখন আমি হয়তো ভুলেই গিয়েছিলাম, এটা ঈশ্বরের উদ্যান।

কল্পনায় তাই দেখতে পাই—ভ্যুইণ্ডার গঙ্গার ওপার দিয়ে সারিবদ্ধ রোডোডেনড্রন ক্যাম্পিন্যুলাটাম গাছগুলোর ডালে ডালে পাতায় পাতায় হাল্কা গোলাপী রঙের ফুল। গাছের ডগায় ডগায় শীতের বরফের টুকরো রয়েছে জড়িয়ে। ঐ ফুলগুলোর গায়ে গা ঠেকিয়ে বুঝি ঠেস দিয়ে রয়েছে ভূর্জপত্র গাছ। গাছের ডালে ডালে হাল্কা আস্তরণ খুলে বাতাসে ভাসছে বিজয়কেতন উড়িয়ে। ওরা যে তুষারপাতকেও ভয় পায় না, তুষারঝঞ্ঝায় বিপর্যস্ত হয়ে মৃত্যু ভয়ে ম্রিয়মান হয় না।

অনেক সময় বসেছিলাম আমি আর হিমাদ্রি। গাইড তাড়া দেয়—সাব, আভি চলো। প্রখর সূর্যদেব ধীরে ধীরে ম্লান হতে চলেছিল। কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করবে আর একটু পরেই। কুয়াশার ঘন আস্তরণ এসে ঢেকে দেবে চারদিক। অন্ধকার নেমে আসবে সমস্ত উপত্যকার বুকে।

দূরের রতবন, গৌরী পর্বত শৃঙ্গে রক্তিম আভা। আর দেরী নয়। অজস্র ফুল ফুটে রয়েছে চারদিকে। সংক্ষিপ্ত সময়, তাই অতৃপ্ত দেহমন নিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফিরে আসতে হয়েছিল নন্দনকানন থেকে ঘাংঘরিয়ায়।

ঘাংঘরিয়া থেকে লোকপাল মাত্র আড়াই মাইল পথ। সামান্য পথ (পাঁচ হাজার ফুট উচ্চতা)। এই স্বল্পপরিসরের মধ্যে উচ্চ হিমালয়ের সব বৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণ করবার মতো এমন আদর্শ স্থান আর নাই বললেই চলে। ঘাংঘরিয়া পেরুবার পর মাত্র কয়েক ফার্লং, তারপর ভুজগাছ আর রোডোডেনড্রন ক্যাম্পিন্যুলাটামের গাছের ভেতর দিয়ে চড়াই শুরু। পথের বুনো লতানো গোলাপের গাছ। গাছে অজস্র ছোট ছোট ফুল ফুটে রয়েছে। চড়াই যত বাড়তে থাকে, ততই দীর্ঘদেহী গাছের ভীড় দেখতে পাই পায়ের নীচে। বুঝতে পারি উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পদযাত্রা মন্থর হতে চলে। ক্লান্তি, দুর্বলতা নানা অসুবিধা শুরু হয়। তেমনি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে অজস্র নীল রঙের জেনসিয়ানা পাথরের গায়ে গায়ে হাল্কা গোলাপী রঙের পোলাইগোনাম, পোটেন্টিলার হলদে আর গাঢ় কমলা রঙের ফুল দেখতে দেখতে সব আচ্ছন্ন যেন দূর হতে থাকে।

এর মধ্যে এনাফেলিসের সাদা ফুলগুলো যেন মন ভরিয়ে রাখে। ওপর থেকে নেমে আসা লক্ষ্মণ গঙ্গার ধারা পেরুতে হয়। জলধারার ওপরটা জমে কঠিন বরফে পরিণত হয়েছে। সেই বরফের ওপর দিয়ে পথ। চড়াই বাড়তে থাকে। এত সময় প্রখর সূর্যকিরণে গরম লাগছিল। এবার সূর্যকিরণ যেন স্নিগ্ধ, মাঝে মাঝে

কুয়াশা এসে ঢেকে ফেলতে চাইছে সমস্ত উপত্যকা ; মাত্র কয়েক মিনিট পর আবার চারদিক পরিস্কার···চার পাশে দেখি হাল্কা নীলরঙের ডেলফিনিয়াম, আর দূরে দূরে একোনাইট গাছ। ওপরের দিকটায় পৌঁছতেই দুচোখ জুড়িয়ে যায়···সমস্ত ঢাল বেয়ে শুধু ব্রহ্মকমল। এদেরকে বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন—সস্যুরিয়া অব্‌লিভাট্টা। এই বুঝি সত্যিকারের নন্দনকানন। লোকপালে পৌঁছে যাবার সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় কুয়াশার আস্তরণ সরে যায়। চোখের সামনে যেন পর্দা সরে যায়। চারপাশে অজস্র ব্রহ্মকমল, ডেলফিনিয়াম আর নীল পপি।

১৯৫৯ সনে এই উচ্চ উপত্যকায় আমি আর হিমাদ্রি লোকপালে হ্রদের তীরে উন্মুক্ত আকাশের নীচে রাত্রিবাস করেছিলাম। নগ্ন পা, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, তবু চন্দ্রালোকে সারারাত কেমন করে যে কাটিয়েছিলাম, তা আজ স্মৃতি হয়ে রয়েছে। ঈশ্বরের বিস্ময়কর উদ্যান, উদ্যানের মাঝখানে অপরূপ সরোবর, তীরে ছোট লক্ষ্মণজীর মন্দির। মন্দিরের গা ঘেসে হ্রদের জলধারা বয়ে চলেছে ঢালু পথ বেয়ে নীচের দিকে।

১৯৬২ সনে আবার এই পথে আসবার সুযোগ হয়েছিল। পিপোলকোঠি থেকে পায়ে হেঁটে যোশী মঠ ; যোশী মঠ থেকে গোবিন্দ ঘাট। পরদিন গোবিন্দ ঘাট থেকে সোজা ঘাংঘরিয়ায় গিয়েছিলাম। অবশ্য ১৯৫৯ সনে ভ্যুইণ্ডার গ্রামে রাত্রি বাস করতে হয়েছিল। কর্ণকুল গঙ্গা আর ভ্যুইণ্ডার গঙ্গার সঙ্গম স্থলে ভ্যুইণ্ডার গ্রাম অবস্থিত। কর্ণকুল গঙ্গার ধারে ধারে পায়ে চলা পথের চিহ্ন এগিয়ে গিয়েছে কাকভুষণ্ডী পর্যন্ত। কাকভুষণ্ডীতে সুন্দর উপত্যকার মাঝখানে সুদৃশ্য হ্রদ রয়েছে। এই উপত্যকায় মাথার ওপরে বিখ্যাত হাতী পর্বত। ১৯৫৯ সনে গোবিন্দ ঘাটে পরিচয় হয়েছিল মদন সিং আর যশবীর সিং-এর সঙ্গে। যশবীর সিং ছিল একজন তরুণ শিখ। সমতল ভূমি ছেড়ে উচ্চ হিমালয়ে এসেছিল গোবিন্দঘাটের গুরুদ্বারের তত্ত্বাবধায়ক হয়ে। এই সমস্ত অঞ্চল তার অত্যন্ত পরিচিত। তাঁর কাছেই শুনেছিলাম — কাকভুষণ্ডীর কথা। ভ্যুইণ্ডার গ্রাম থেকে আনুমানিক বারো মাইল পথ। পথ নেই বললেই চলে। ভ্যুইণ্ডার গ্রামের কিষেণ সিং পথ জানতো। কর্ণকুল গঙ্গার ধার ধরে এগুতে হয় এবড়ো-খেবড়ো পাথরের ঢাল বেয়ে চড়াই পথ পেরিয়ে। কর্ণকুল গঙ্গার দুপারে গভীর বন। ভাল্লুক আছে কিন্তু বাঘ আছে কিনা জানা নেই। প্রায় নয় মাইল চড়াই পথ পেরুতে স্বল্পপরিসর রাস্তা পাওয়া যায়। যেখানে বকড়িওয়ালাদের রাত্রিবাসের স্থান রয়েছে, সেখানে বকড়িওয়ালাদের ঝুপড়িতে রাত্রিবাস করে আড়াই

মাইল খাড়া পাহাড়ের ঢাল বেয়ে পৌঁছে যাওয়া যায় উপত্যকায়। আধ মাইল পথ উতরাই। বুগিয়ালের মাঝখানে প্রায় ত্রিকোণাকার হ্রদের ধারে অজস্র ফুল। রমেশদা এই পথে গিয়েছিলেন সম্ভবতঃ ১৯৬১ সনে যশবীর সিং-এর সাহায্যে।

গোবিন্দঘাট থেকে অলকানন্দার ওপরকার সেতু পেরিয়ে এগুতেই চড়াই পথের শুরু। এই পথে প্রথম গ্রামের নাম পুন্‌গাও। ছোট্ট গ্রাম, গা ঘেষে বয়ে চলেছে ভ্যুইণ্ডার গঙ্গা। বেশ খানিকটা প্রশস্ত উপত্যকার মতো। এই অঞ্চলের শেষ গ্রাম ভ্যুইণ্ডার অপেক্ষাকৃত উচ্চতায় অবস্থিত বলে শীতের শুরুতেই তুষারপাত শুরু হয়। তাই গ্রামবাসীরা সেখানকার অস্থাবর বিষয়-আশয় নিয়ে ঘর বন্ধ করে নেমে আসে পুন গাওয়ে। পুরো শীতকাল থেকে শুরু করে মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত এই গ্রামেই ঘরকন্না চলে। তারপর আবার চলে যায় ভ্যুইণ্ডার গ্রামে। পুন গাওকে ভ্যুইণ্ডার গ্রামের অধিবাসীদের শীতকালের বাসস্থান বলা চলে।

ভ্যুইণ্ডার গঙ্গার ওপার দিয়ে উচ্চ গিরিশিরা, খাড়া গিরিগাত্র। আর গিরিশিরা থেকে শুরু করে খাড়া পাহাড়ের ঢাল পর্যন্ত বিশাল বিশাল দীর্ঘদেহী পাইন, দেওদার, ফার, মেপল, চীর গাছের গভীর বন। এই বনেই বসবাস করে কৃষ্ণসার হরিণ, কাকর হরিণ, অতিকায় ভাল্লুক। বনজ সম্পদে ভ্যুইণ্ডার উপত্যকা সমৃদ্ধ। পুন গাও থেকে ভ্যুইণ্ডার গ্রাম পর্যন্ত সমস্ত পথটাই চড়াই। ভ্যুইণ্ডার গঙ্গা যেন প্রচণ্ডবেগে ঝাপিয়ে পড়ছে বড় বড় পাথরগুলোর ওপরে। নদীর ওপারে খাড়া পাথরের ঢাল বেয়ে নেমে এসেছে গুটিকয়েক ঝরণা। দূর থেকে ঠিক ধব্‌ধবে সাদা ফিতের মতো দেখতে। সুদৃশ্য ঝরণা, পাইন-দেওদার, ফার গাছের সবুজ বনভূমি দেখতে দেখতে চড়াই পথ এগিয়ে চলি। পথের ধারে অজস্র জিরানিয়াম নেপালেনসিসের গাঢ় গোলাপী ফুল। তার পাশেই ইমপেসেন্স অ্যাম্ফোরাট ও ইমপেসেন্স রয়েলির গাঢ় গোলাপী রঙের ফুল ফুটে রয়েছে। অসংখ্য ইমপেন্সের গাছগুলোর পাশাপাশি দেখা যাবে বিছুটি গাছগুলো। ইমপেসেন্স গাছের পাতা, ডগা ভেড়া-বকড়ি এবং গোরু, মোষের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। কিন্তু এই গাছের চারপাশটা ঘিরে রয়েছে বিছুটি গাছ। এই গাছের বিষাক্ত ডগা, পাতা, অসহায় ইমপেসেন্সকে যেন বাঁচিয়ে রেখেছে ভেড়া-বকড়ির হাত থেকে। এই দুর্বল অসহায় গাছের আত্মরক্ষার কোন উপায় নেই বলেই যেন বিছুটি গাছগুলো পাহারা দিয়ে রেখেছে সর্বত্র। ইমপেসেন্সের পাশাপাশি বিছুটি গাছ···একের প্রতি অপরের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব আর সহায়তায় বেঁচে রয়েছে গাছগুলো। হিমালয়ের উচ্চ উপত্যকায় বিচিত্র পরিবেশে পথ চলতে চলতে সিমবায়োসিসের এমন ধরনের জীবন্ত উদাহরণ দেখতে পাওয়া যাবে অনেক।

ইমপেসেন্স গাছগুলো দেখতে দেখতে পাহাড়ের ঢালের মুখে দেখা যাবে অজস্র একদল পাপড়িযুক্ত গোলাপী রঙের ফুলযুক্ত দোপাটি গাছ। অবাক হয়ে দেখতে হয়। এত দোপাটি গাছ এলো কি করে? যেন সমস্ত ঢাল বেয়ে অজস্র গাছ লাগানো হয়েছে যত্ন করে। এই দোপাটিই আমরা দেখতে পাই কোলকাতার সখের উদ্যানে। মালীদের পরিচর্যায় গাছগুলো পুষ্ট হয়ে ওঠে, অজস্র রঙিন ফুল ফুটে উদ্যান ভরে রাখে। ঈশ্বরের এমন অপরূপ উদ্যানের দোপাটি গাছগুলির যত্ন-পরিচর্যা করে অদৃশ্য মালী। প্রকৃতিদেবী যেন আপন হাতে জল সিঞ্চন করে, শীতল বাতাস বইয়ে দেয়, সূর্যের কিরণ ঢেলে দেয় সেখানে। ছোট ছোট দোপাটি ফুলে ভরে যায়। এই দোপাটি গাছের সঙ্গে ইমপেসেন্স গাছের পরম আত্মীয়তা রয়েছে। আমি ভাবি, হিমালয়ের নির্জন উপত্যকায় ইমপেসেন্স দুঃখ আর বেদনায় ··আত্মপ্রকাশের আশায় অধৈর্য হয়েছিল। তাই তার পরম আত্মীয় দোপাটিকে পাঠিয়েছিল শহরে··· সভ্য, ভদ্র পরিবেশে স্থায়ী বসবাস করবার জন্য। দোপাটি ও ইমপেসেন্স উভয়ই বালসাম গোত্রের দুটি পরিবার। বালসামিনাসিয়া গোত্রের সর্বসাকুল্যে পঁয়তাল্লিশটি প্রজাতি রয়েছে। ইমপেসেন্স পরিবারের প্রজাতির সংখ্যা নয়টি।

হিমালয়ের ছয় হাজার ফুট উচ্চতা থেকে শুরু করে প্রায় চৌদ্দ হাজার ফুট উচ্চতায় ইমপেসেন্স-এর নয়টি প্রজাতি ছড়িয়ে রয়েছে। দশ হাজার থেকে এগারো হাজার ফুট উচ্চতার পর ইমপেসেন্স গাছ বামন হতে শুরু করে। প্রিয় বন্ধু বিছুটি গাছের সঙ্গে বন্ধুবিচ্ছেদ হয়ে যায়। এমন উচ্চতায় ভেড়া-বকড়ির অত্যাচার কম হবে ভেবেই যেন নিশ্চিন্ত মনে বিছুটি গাছ বিদায় নেয়।

ভ্যুইণ্ডার গ্রামে সব যাত্রীরা বিশ্রাম নেয়। স্বল্প অবস্থানের পর আবার পদযাত্রা শুরু হয়। পথ তখন উচ্ছল ভ্যুইণ্ডার গঙ্গার তটভূমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে। গভীর বনের ভেতরে পথ। ভ্যুইণ্ডার গঙ্গার ধারে ধারে দেখা যায় অজস্র হলদে রঙের টক ফলযুক্ত হিপ্পোপটিয়া র‍্যাম্নয়ডে্-এর গাছ। হিমালয়ের প্রায় অনেক স্থানেই নদী বা ঝরণার ধারে আট থেকে দশ হাজার ফুট উচ্চতায় দেখতে পাওয়া যাবে এই গাছগুলো অজস্র। ভ্যুইণ্ডার গ্রামের কাছাকাছি অজস্র পুদিনার গাছ দেখতে পাওয়া যাবে। গ্রামবাসীরা পুদিনার পাতা আর হিপ্পোপটিয়া র‍্যামনয়ডের হলদে ফল দিয়ে সুন্দর চাটনী বানায়। এই গাছগুলোর পাশ দিয়ে পথ চলেছে এগিয়ে। ভ্যুইণ্ডার গঙ্গার ওপরকার কাঠের সেতু পেরুতেই সমস্ত উপত্যকার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অনুভব করতে পারা যাবে যে, উচ্চতা বৃদ্ধি পেতে শুরু হয়েছে। উদ্ভিজ্জের ভেতরে···উচ্চ চাপমাত্রা, নিম্নতাপ মাত্রার প্রভাব সর্বত্র; দীর্ঘদেহী বৃক্ষের

মধ্যেও তার প্রতিক্রিয়া অনুভব করা যায়। পথ চলেছে গভীর বনভূমির ভেতর দিয়ে। এই বনভূমির মাঝখানে হঠাৎ ছোট্ট একটা বুগিয়ালের সৃষ্টি হয়েছে! স্বল্পপরিসর বুগিয়াল হলেও…সমস্ত স্থানে অজস্র গাঢ় গোলাপী রঙের জিরানিয়াম, হলদে রঙের পোটেন্টিলা, সাদা অ্যাস্টার, এনাফেলিস আর তার মাঝে মাঝে সোনালী হলদে রঙের ইমপেসেন্স, স্ক্যাব্রিডার ফুল। অল্প-পরিসর বুগিয়ালের একপাশে খাড়া পাথরের দেওয়াল। সেই খাড়া দেওয়ালের গায়ে গায়ে অনেকগুলো বড় বড় মৌচাক। অতবড় মৌচাকে না জানি কত মধু জমে থাকে! এমন মারাত্মক বিপজ্জনক স্থান যে, মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় ঐ মধু সংগ্রহ করা। খাড়া পাথরের ফাটলে কালো পীচের মতো জমে থাকে শিলাজিত। স্থানীয় লোকেরা বলে পাহাড়ের ঘাম। বলকারক স্নায়বিক দুর্বলতা দূর করে। এই শিলাজিত এমনি বিপজ্জনক স্থানেই দেখতে পাওয়া যায়। পাহাড়ী মানুষ মৃত্যু ভয় তুচ্ছ করে শিলাজিত সংগ্রহ করে চড়া দামে বিক্রয় করে।

১৯৬২ সনে ঘাংঘরিয়ায় দু'রাত্রি অতিবাহিত করতে হয়েছিল। নীলগিরি (গাড়োয়াল) পর্বত অভিযানে সদস্য হিসাবে এসেছিলাম। এই পর্বত অভিযান আমাকে তেমন উৎসাহ দেয়নি। শুধু নন্দনকাননে বেশ কয়েকদিন বসবাস করতে পারবো এই লোভই ছিল বেশী। ১৯৫৯ সনের নন্দনকানন দেখা, ক্ষণিকের দেখা বলে মনে হয়েছিল। হিমালয় ভ্রমণ প্রথম, তাই দেখার আনন্দ, উৎসাহ, আমার কল্পনার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। ঘাংঘরিয়ার ডাকবাংলায় আশ্রয় নিয়েছিলাম দলবল নিয়ে। উদ্ভিদ বিজ্ঞানী উপেন দা, আর তাঁর সহকারী কারকি-গোবিন্দঘাট থেকেই বিভিন্ন ফুলের নমুনা সংগ্রহ করতে করতে এসেছিলেন। ঘাংঘরিয়ার উচ্চতা দশ হাজার ফুটের চাইতেও বেশী। বৃক্ষ সীমারেখার সুস্পষ্ট চিহ্ন ঘাংঘরিয়ায় দেখতে পাওয়া যায়। বন বিভাগের ডাকবাংলো, বিশাল ও পুরানো দেওদার, মেপল ফার গাছের ছায়ায় অবস্থিত। ফার গাছগুলো সম্ভবতঃ শিলভার ফার। এত বেশী বয়স্ক শিলভার ফার অন্য কোথাও আছে কিনা জানি না। বিশাল দীর্ঘদেহী গাছগুলো সুন্দর সাজানো। গাছগুলোর ডালপালায় বার্ধক্যের ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। অনেকগুলো গাছের বড় বড় ডালে পাতা নেই। শুকনো ডাল ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে স্যাতসেতে ভিজে কাদা মাটির ওপরে। শুকনো গাছের পাতা জমে রয়েছে স্তূপীকৃত হয়ে। এই ভিজে পরিবেশে অনেকগুলো মরা গাছের ডালে নানা রঙের নানা ধরণের ব্যাঙের ছাতা গজিয়ে উঠেছে। সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে না। বিকেল হতেই বৃষ্টি শুরু হয়, চলে সারারাত।

কুয়াশা, নীল আকাশের প্রায় সমস্ত অংশটাই ঢাকা থাকে গাঢ় মেঘে। এই আবছা আলো আর অন্ধকার নিয়ে ঘাংঘরিয়া এক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর পরিবেশের সৃষ্টি করে। ডাকবাংলোয় বসে বসে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় হাত-পা যেন জমে যেতে চায়। তার মধ্যে ছপ্ ছপ্ শব্দ শুনতে শুনতে সারা গায়ে শিহরণ জাগে। জানালা দিয়ে দেখতে হয় টর্চের আলো ফেলে, দলবেঁধে ভাল্লুক আসছে কিনা। এমন এক অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে ওরা গভীর বন পেরিয়ে আলোর মাঝখানে আসতে চায় হয়তো।

১৯৫৯ সনে দেখেছি, ঘাংঘরিয়ার বাংলোয় গোনা-গুণতি শিখ যাত্রী। তাঁরা খুব ভোরে লোকপাল দর্শন করে সোজা নেমে যান গোবিন্দঘাট। লোকপালে সুদৃশ্য হ্রদ, হ্রদের তীরে লক্ষ্মণজীর মন্দির। মন্দিরের ভেতরে মূর্তি রয়েছে। একমাত্র বিশেষ উৎসবের দিনে গাড়োয়ালের বহু দূরের মানুষও দলবেঁধে আসেন লোকপালে পূজো দেবার জন্য। নন্দনকাননের যাত্রী খুবই সীমিত। শেষ গ্রাম ভুইণ্ডারের বাসিন্দারা আগে ভাগেই যাত্রীদের নিরুৎসাহ করে দেয়। ওরা বলতো—ফুল কাহা হ্যায় সাব? বারিষ আগিয়া, ফুল খতম!

অর্থাৎ যাত্রীদের নিরুৎসাহ করে দেয় প্রথমেই। তবু নাছোড়বান্দা, অত্যুৎসাহী যাত্রী ঘাংঘরিয়া পেরিয়ে লক্ষ্মণ গঙ্গার ধারে আসতেই ভুইণ্ডার গ্রামের কোন গাইড হয়তো বলবে, এইসব অঞ্চলে ভাল্লুক আছে, সাব। ব্যস্! একে বাঙ্গালী যাত্রী। ফুল নেই, কিছুই নেই, তার ওপরে ভাল্লুকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে পারে মাঝ পথে, কি দরকার অত ঝামেলায়। কষ্ট করে আর এগুনো অনর্থক। তার চাইতে লোকপাল দর্শন করেই চলে যাওয়া ভাল। এত বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে তবু কোন কোন উৎসাহী যাত্রী হয়তো লক্ষ্মণ গঙ্গার জলধারার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে, হকচকিয়ে যায়। এত ভোরে, প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় হিমশীতল জলধারা পেরুবার জন্য এসে দেখি ছোট্ট কাঠের সেতু ভেঙ্গে গিয়েছে। গাইড অবশ্য সাহস দেয়। বড়বড় নড়বড়ে পাথরের ওপরে পা ফেলে জলধারা পেরিয়ে ওপারে গিয়ে আহ্বান করে যাত্রীদের। অপটু যাত্রীরা টাল মাটাল হয়ে কোন মতে জুতো-প্যাণ্ট ভিজিয়ে ওপারে গিয়ে গাইডকে গালাগাল দেয়। সঙ্গীদের মধ্যে একজন অপর জনকে ধমকায়। কি দরকায় এ ধরণের ঝুঁকি নিয়ে যাবার? তারপর অবতরণ। ভুইণ্ডার গঙ্গার ওপরকার জীর্ণ নড়বড়ে কাঠের সেতু পেরিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ওপারে গিয়ে। বিশালাকায় ফার আর দেওদার গাছের ছায়ায় ঢাকা সুন্দর প্রশস্ত পথ ঘুরে চলে গিয়েছে সোজা উত্তরদিকে ভুইণ্ডার গঙ্গার পথ অনুসরণ করে। এই পথ ধরে চলতে ভালই লাগবে সবার। পথের একপাশে গিরিগাত্র আর অপর

পাশ দিয়ে দু-তিন ফুট নীচে কলকল শব্দে বয়ে চলেছে ভ্যুইণ্ডার গঙ্গা। আর ভ্যুইণ্ডার গঙ্গার ওপারে ভুজগাছ আর রোডোডেনড্রন গাছ। সূর্য উঠেছে। সূর্যের আলো এসে পড়েনি পথের ধারে। বেশ ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় ছায়ায় ছায়ায় প্রায় সমতল পথ শেষ হয়ে যায় দেখতে দেখতে। তারপর আবার পথ চলা বন্ধ হয়ে যায়। হয়তো কয়েকদিন ক্রমাগত বৃষ্টি হয়েছিল। বামনীধর গিরিগাত্র বেয়ে ঢল নেমে এসেছিল। সেই উচ্ছল জলধারা পেরুলেই নন্দনকাননের প্রবেশ পথ। জল-কাদা, ভেড়া-বকড়ির বিষ্ঠা আর গাছগুলো জলে ডুবে পচে দুর্গন্ধ ছড়িয়েছে চারদিকে। এই পচা নরম কাদার ওপর দিয়ে চলতে গিয়ে জুতোশুদ্ধ পা ঢুকে যায় কাদার মধ্যে। গাইড সন্তর্পণে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। পাথরের ওপরে পা ফেলে ফেলে জলধারা অতিক্রম করে সবাই।

যাত্রীরা বিরক্ত কণ্ঠে বলে—আর কতদূর নন্দনকানন?

গাইড বলে—সাব, এহিতো নন্দনকানন। সামনে দেখো সাব, বরফ কা পাহাড়, রতবন, গৌরীপর্বত, হাতী পর্বত।

যাত্রীরা ধমকে বলে—নন্দনকানন কোথায়?

গাইড বলে—সাব, এহিতো নন্দনকানন।

—এই নন্দনকানন! ফুল কোথায়?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না গাইড। নন্দনকাননে ফুল নেই কেন, একথার উত্তর সে দিবে কি করে!

অপরাধীর মতো তাকিয়ে থাকে। নন্দনকানন তার সৌন্দর্য, তার পরিবেশকে অপমান, অসম্মান করায় যেন ব্যথিত হয়।

যাত্রীরা বলে—এই তোমাদের নন্দনকানন! ব্যঙ্গ করে বলে, ফুলো কা ঘাঁটি। ফুল একটাও নেই। চলো, আর যাওয়ার দরকার নেই!

গাইড শেষ চেষ্টা করে নন্দনকাননের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য। বলে থোড়া চলো সাব।

—থোড়া?

—সামনে চলো সাব।

—সামনে! সামনে আবার কি?

—মেম সাহেবের কবর।

—মেম সাহেবের কবর! ওটা আবার কি? ফুল নেই কোথাও, মেম সাহেবের কবর দেখে কি হবে? চলো, চলো।

গাইড ম্লান হাসে। এই নন্দনকাননে এমন পরিবেশের মধ্যে ভিন্ দেশের মেম সাহেব শুধু ফুল দেখতে এসেছিল সাতসমুদ্র পার হয়ে। ফুল তুলতে তুলতে মেম সাহেব পাহাড় থেকে পা পিছলে প্রাণ দিয়েছে নন্দনকাননে। এই সেই মেম সাহেবের কবর। গাইড ম্লান কণ্ঠে বলে. থোড়া ঠাড় যাও, সাব! গাইড তর তর করে চলে যায়। কাছ থেকে কতগুলো ফুল তুলে ছড়িয়ে দেয় মেমসাহেবের কবরে। ঐ বিদেশী মানুষ আমাদের দেশকে বড় ভালবেসেছিল। আমাদের আত্মীয় হতে চেয়েছিল। গাইড দু'মিনিট দাঁড়িয়ে থাকে কবরের কাছে। তারপর দ্রুত চলে আসে। যাত্রীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল। গাইড আসতেই বলে—চলো, চলো, মিছামিছি অনেক সময় নষ্ট হয়েছে।

এদের সব কথাই আমি শুনেছি পথ চলতে চলতে।

১৯৬২ সনের নন্দনকানন আমার দ্বিতীয়বার দর্শন। আমার দৃষ্টিতে সেদিন অপরূপ হয়ে উঠেছিল। প্রায় একমাস অবস্থান, সমস্ত অঞ্চল জুড়ে ঘুরে ঘুরে দেখে নন্দনকানন সৃষ্টির কথা ভাবতুম। সৃষ্টির একটা সুন্দর কাহিনী থাকা উচিত। একটা নিটোল কাহিনী; রামায়ণ-মহাভারত বা পুরাণে তার স্বাক্ষর থাকলে আরো ভালো লাগতো। অনেক পথ হেটে হেটে; দুর্গম বনভূমি পেরিয়ে পথ চলার ক্লান্তির সমাপ্তিতে নন্দনকানন আমার কাছে নানা রঙীন কল্পনার জাল বিস্তার করেছিল।

নন্দনকানন সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক কার্যকারণ রয়েছে নিশ্চয়ই। গোবিন্দঘাট থেকে ভ্যুইণ্ডার গঙ্গার ধারা অনুসরণ করতে করতে অগ্রসর হলে দেখা যাবে, ঘাংঘরিয়া পর্যন্ত সমস্ত উপত্যকা রূপান্তরিত হয়েছে নদী উপত্যকায়। ঘাংঘরিয়ার পর থেকেই হিমবাহ উপত্যকার ক্ষীণ স্বাক্ষর লক্ষ্য করা যায়। নন্দনকাননের প্রবেশমুখ পর্যন্ত অদূরের ভ্যুইণ্ডার গঙ্গার ধারা, তটরেখা, পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, কেমন সুন্দর ও স্বচ্ছন্দভাবে হিমবাহ উপত্যকা নদী উপত্যকায় রূপান্তরিত হতে চলেছে সবার অলক্ষ্যে। প্রকৃতি তার নিজের তাগিদেই যেন হিমবাহকে পিছিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কারণ, উদ্ভিদের বসবাসের উপযোগী স্থায়ী বাসস্থান চাই। প্রকৃতি এই অভাব অনুভব করেই বনসৃজনের জন্য প্রশস্ত উপত্যকার সৃষ্টি করেছিলেন। এ যেন এক অদ্ভুত নির্দেশ। সেই কোন অতীতকালে ভ্যুইণ্ডার গঙ্গার উৎসস্থলে অবস্থিত হিমবাহ নন্দনকানন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। নন্দনকাননের সুরুতেই হয়তো খুন্টাখাল থেকে আসা ঝুলন্ত হিমবাহ, বামনীধর আর রূপীনধরের গা ঘেষে আসা ঝুলন্ত হিমবাহ নন্দনকানন জুড়ে প্রসারিত হয়ে এক বিশাল তুষারাবৃত অঞ্চলের সৃষ্টি

হয়েছিল কতকাল পূর্বে, সে ইতিহাস জানা যায় না। হয়তো তুষারযুগের সময়কার কথা। তখন বদ্রীনাথ অঞ্চল জুড়ে প্রসারিত ছিল হিমবাহ। সেই হিমবাহ সঙ্কুচিত হতে চলেছিল তুষারযুগের অবসান হতেই। বিশাল হিমবাহের আয়ু ক্ষীণ হতেই উদ্ভিদ যেন ওৎ পেতে বসেছিল। দীর্ঘদেহ কনিফার সেখানে বসবাস করতে পারবে না। তাই পাও, স্টিপা, ডায়ন্থোনিয়া—এইসব গুচ্ছযুক্ত তৃণ বসবাস করতে সুরু করেছিল মৃত হিমবাহের বুকের অস্থিপঞ্জরের ওপরে। সেই অস্থিপঞ্জরই তো গ্রাবরেখার অসমান পাথরগুলো। পাও, স্টিপা, ডায়ন্থোনিয়ার গুচ্ছমূল আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছিল পাথরগুলো। শিশির আর কুয়াশার জলে সিক্ত পাথর সূর্যের দাবদেহে ফেটে ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে বিশাল বুগিয়ালের সৃষ্টি করেছিল। সেখানেই বহাল তবিয়তে রাজত্ব শুরু করেছিল এইসব তৃণগুলি। নন্দনকাননের বুকে বসবাসকারী তৃণগুলির জাতি বিচার করলে এদের চরিত্র সম্পর্কে জানা যায়। পর্যবেক্ষণ করলেও সৃষ্টির শুরুতে বসবাসকারী তৃণগুলির জন্মকালের ইতিহাস কিন্তু অনুমানের ওপরে নির্ভর করতে হয়।

১৯৫৯ সনে নন্দনকাননের তৃণাঞ্চল যেন ঘন সন্নিবেষ্টিত ছিল। সবুজ ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে হলদে রঙের পোটেন্টিলা ফ্রুটিকোসা, গাঢ় নারঙ্গা রঙের পোটেন্টিলা আগাইরোফাইলা। গোলাপী রঙের জিরানিয়াম নেপালেনসিস্, সাদা রঙের এনাফেলিস্ রয়েলি সমস্ত অঞ্চল জুড়ে প্রভুত্ব করে আসছিল। স্টিপা আর ডায়ন্থোনিয়ার গাছগুলোতে যেন ছাপিয়ে উঠেছিল ফুলগুলো।

১৯৬২ সনের তৃণাঞ্চল হাল্কা হতে দেখে অবাক হয়েছিলাম। হয়তো মৃত্তিকায় খাদ্যবস্তু নিঃশেষিত করতে চলেছে বলে উদ্ভিদ আবার এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। আবার নতুন করে পুরানো গ্রাবরেখার পাথরগুলো ভাঙ্গা আর মৃত্তিকায় পরিণত করবার কাজ সমাপ্ত হতেই অপরূপ উদ্ভিদঅঞ্চল গড়ে উঠেছিল। অবশ্য পাথরগুলো ভেঙ্গে গুড়ো গুড়ো করে মৃত্তিকায় পরিণত করবার দায়িত্ব যেমন একদল উদ্ভিদ গ্রহণ করে, তেমনি আর একদল উদ্ভিদ ভূমিক্ষয় অবরোধের জন্য উঠে পড়ে লাগে। মৃত্তিকাই যদি নিঃশেষিত হতে শুরু করে, তখন ঘর বাঁধবে কোথায়? তাই সেইসব উদ্ভিদ তার দীর্ঘ শক্ত মূল মাটির বুকে বিস্তার করে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখতে চেষ্টা করে।

মৃত্তিকার রাসায়নিক বিশ্লেষণ, আর্দ্রতা, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে নানা ধরণের উদ্ভিদ। যেমন জুনিপার, রোডোডেনড্রন, অ্যান্থপোগনের পাতায়, দেহত্বকে প্রচুর তৈলরস থাকে। এইসব গাছের পাতা ঝরে পড়ে মাটির বুকে। দীর্ঘকাল

মাটির বুকে সঞ্চিত হয়ে পচে মাটির অম্লত্ব বৃদ্ধি করতে থাকে। সমস্ত উপত্যকাই যদি তীব্র অম্লযুক্ত রসে সিক্ত থাকে, তাহলে অন্য সব উদ্ভিদ বাস করবে কেমন করে? তীব্র অম্লরস যুক্ত মৃত্তিকা সব উদ্ভিদের উপযোগী নয়। তাই জুনিপার, রোডোডেনড্রন, অ্যাম্বপোগন এইসব উদ্ভিদের কাছাকাছি বসবাস করতে অভ্যস্ত হয় বিশেষ ধরণের উদ্ভিদ। তাদের দেহে ও পাতায় প্রচুর সুগন্ধিযুক্ত তৈলরস থাকবেই। দেহে চর্বি না থাকলে তীব্র শীতে জীবনযাত্রা ব্যহত হবে। আদ্রতা, চাপ ও তাপমাত্রা বিচার করে যে সব উদ্ভিদ বাসা বাঁধে, প্রকৃতি তাদের ঘিরে রাখে সব রকম বাধা-বিপত্তি থেকে। অবাক হতে হয়। মানুষের জীবনযাত্রাও তো এমনি! জলজস্থান, সমুদ্রতীর, মরুভূমি, শীতপ্রধান স্থান প্রকৃতির বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে মানুষ বসবাস করে। পরিবেশ অনুযায়ী দেহ, মন ও চরিত্র গঠিত হয়। মানুষ সাধনা বলে দেবতা হয়, মানুষ অসুরও হয়। কিন্তু উদ্ভিদ দেবতা বা অসুর কোনোটাই হয়তো হতে পারে না। কিন্তু তাদের সৌন্দর্য, স্নিগ্ধতা দেহসৌষ্ঠব, কমনীয়তা সব মিলিয়ে এক পরম পবিত্র রূপ। ঈশ্বরের উদ্যানে বসবাস করে ঈশ্বরের সাহচর্য পায়। মানুষের আসুরিক শক্তি স্পর্শ করতে পারে না।

নন্দনকানন পূর্ব পশ্চিমে দীর্ঘ। কাননের শুরু ১১৪০০ ফুট থেকে, শেষ হয় ১৬৫০০ ফুট উচ্চতায়। নন্দনকাননের দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে বয়ে চলেছে ভ্যুইওার গঙ্গা। এই গঙ্গাই সমস্ত কাননের প্রাণ-স্বরূপিনী। এই প্রাণরসে পুষ্ট সমস্ত উপত্যকা সরস। অবশ্য সমস্ত নন্দনকাননে চারটি জলধারা উত্তর দিকের বামনীধর, রূপীনধর গিরিশিরা থেকে এসেছে। সুদূর অতীত যুগের ঝুলন্ত হিমবাহের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এই জলধারাগুলি নন্দনকাননের বুকের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ঢালু পথে বেয়ে চলেছে ভ্যুইওার গঙ্গায়। এই ভ্যুইওার গঙ্গার তটভূমির ঢালে ঢালে রোডোডেনড্রন ক্যাম্পিন্যুলাটাম আর ভুজগাছ বসবাস করছে। দুটি উদ্ভিদই ভিন্ন গোত্রের, ভিন্ন পরিবারের। দেহে এবং চরিত্রে সম্পূর্ণ পৃথক। উভয়ে-উভয়কে ভালবেসে প্রেমের গাঢ় নিগড়ে বদ্ধ। ওরা যদি সুখ-দুঃখের কথা বলতে পারতো তাহলে ওদের ভিন্ন ভাষার জন্য আমাদেরও ওদের ভাষা নতুন করে শিখতে হত। কিন্তু কি আশ্চর্য! একই মানুষ পাশাপাশি বসবাস করতে পারে না, ভালবাসতে পারে না সম্পূর্ণ নিস্বার্থ নিষ্কামভাবে।

ভুজগাছ আর রোডোডেনড্রন ক্যাম্পিন্যুলাটামের নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ প্রেম উপলব্ধি করে মুগ্ধ হই। একে অপরকে ভালবেসে তারা ভালবাসার স্বাক্ষর রেখেছে ঈশ্বরের উদ্যানে।

নন্দনকাননের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সর্বসাকুল্যে তিনটি সুন্দর ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড রয়েছে। এই ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডের প্রথমটির নাম সুঁইচাঁদি। প্রায় -২০০০ ফুট উচ্চতায় এই ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডটি অবস্থিত। প্রায় সমতল স্থানে অজস্র রুমেক্স গাছের ভীড় দেখতে পাওয়া যাবে। কাছেই একটি জলধারা প্রায় সাত আট ফুট খাদের সৃষ্টি করে সশব্দে বয়ে চলেছে ভ্যুইণ্ডার গঙ্গায় মিলিত হবার জন্য। সমস্ত অঞ্চল জুড়ে জিরানিয়াম আর থোকা থোকা এনাফেলিসের গাছ। শুরুতে একোনাইট হিটারোফাইলা আর ডেলফিনিয়ামের গাছ মেশামেশি হয়ে বসবাস করে। ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডের উত্তর দিকটার উচ্চতা বেশী, দক্ষিণ দিকটা ঢালু হয়ে ভ্যুইণ্ডার গঙ্গার তটভূমি পর্যন্ত নেমে এসেছে। ভ্যুইণ্ডার গঙ্গার তটরেখায় অজস্র প্রাক-বর্ষার প্রিমুলা ডেন্টিকুলাটার ফুল ফুটে থাকে। আর বর্ষার পর অসমান ঘাসের বুকে অজস্র জিরানিয়াম, পোলাইগোনাম আর জেনসিয়ানা মুরক্রফটিয়ানা ফুটে থাকে। কম্পোজিটা গোত্রের অ্যাস্টার দেখতে পাওয়া যাবে চারদিকে। জলের ধারে এপিলোবিয়াম ল্যাটিফোনিয়ামের গাঢ় গোলাপী রঙের ফুল ফুটে সমস্ত অঞ্চল যেন আলোকিত করে থাকে। সুঁইচাঁদির সমতল স্থানে রুমেক্স, জিরানিয়াম, পোটেন্টিলা ছাড়াও দেখা যাবে জিউম, এলিটাম আর আমবেলিফোলিয়ার দু তিনটে প্রজাতি।

সুঁইচাঁদির পরই বিখ্যাত ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড টিপরাখড়ক। টিপড়াখড়েকের প্রায় সমস্ত অংশ জুড়ে দেখতে পাওয়া যাবে গ্রামিনিই গোত্রের বিখ্যাত ঘাস—পাও, ষ্টিপা আর ডায়স্থোনিয়া। তৃণাঞ্চলের ফাঁকে ফাঁকে উত্তর দিকটায় ঢালের মুখে পিক্রোজাকারু, পোটেন্টিলার দু-তিনটে প্রজাতি, পেডিকুলারিস আর কতগুলো বড় বড় পাথরের গায়ে কোরাইডালিসের গাছ। হলদে ও সোনালী হলদে রঙের ফুল ফুটে থাকে সেখানে। পাথরগুলোর পাদদেশে ফার্ন গাছের বেশ বড় রকমের কলোনী। টিপরাখড়কের তৃণভূমি ধীরে ধীরে হাল্কা হতে শুরু করে পূর্ব দিকটায়। সেখানে গুড়ি গুড়ি পাথর, আর সেই পাথরের বুকে মাঝে মাঝে ঘর বেঁধেছে এপিলোবিয়াম। কোথাও কোথাও ছন্ন ছাড়া এনাফেলিসও ঘর বেঁধেছে। হয়তো দল ছুট হয়ে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ত্যাগ করে বিরাগী হয়ে ঘর বেঁধেছে নতুন করে। তারপরই তো গুড়ি গুড়ি পাথরের ঢালের কাছে স্তব্ধ হয়েছে জীবনের সমস্ত চিহ্ন। শুধু পাথর, ছোট বড় অসমান পাথরের ঢাল। তাই উদ্ভিদ আর এগুতে পারেনি, সাহস পায়নি শুষ্ক নীরস পাথরের বুকে ঘর বাঁধতে। এইসব অসমান পাথরের ঢাল, ভ্যুইণ্ডার উপত্যকার একমাত্র পিছিয়ে পড়া হিমবাহের পুরানো গ্রাবরেখা। এইসব বড় বড় পাথরের ঢাল ভেঙ্গে মাইল দেড়েক সোজা পূর্বে এগিয়ে

গেলেই দেখা যাবে সেই হিমবাহের স্নাউট। যেন অর্ধচন্দ্রাকার বরফের খাড়া ঢালের পাদদেশে বরফের গুহার ভেতর থেকে কলকল করে জলধারা বেরিয়ে আবার কিছুটা পথ হারিয়ে গিয়েছে বড় বড় পাথরগুলোর তলায়। এই জলধারার নাম ভ্যুইণ্ডার গঙ্গা। ভ্যুইণ্ডার গঙ্গার উৎসস্থলের সঙ্গে যুক্ত হিমবাহের বরফ যোগান দেয় রতবন পর্বত, গৌরী পর্বত আর হাতী পর্বত। এই পর্বত শৃঙ্গগুলির সঙ্গে যুক্ত গিরিশিরার গা খাড়া দেওয়ালের মতো। পশ্চিম দিকের এই খাড়া ঢাল থেকে নেমে আসা বরফের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে হিমবাহ। রতবন, গৌরী পর্বত আর হাতী পর্বতের তুষারাবৃত শৃঙ্গগুলির পশ্চিম ঢাল খাড়া। তাই শৃঙ্গগুলির বরফ এই ঢালে সঞ্চিত হতে পারে না। সামান্য পরিমাণ সঞ্চিত হতেই পশ্চিমদিকের খাড়া গিরিগাত্রে পৌছতেই প্রচণ্ড বজ্রনির্ঘোষে হিমানী সম্প্রপাত হয়। প্রকৃতিদেবীর এই হিমবাহ অত্যন্ত ক্ষীণদেহী, যেন সাংঘাতিক অপুষ্টিজনিত রোগে আক্রান্ত জন্মের শুরু থেকেই। তাই ক্ষীণদেহী এই হিমবাহ দুর্বল হতে হতে সঙ্কুচিত হয়েছিল অত্যন্ত দ্রুতবেগে। নন্দনকানন সৃষ্টি ও তার পূর্ণতা লাভ করেছে প্রকৃতির নির্দেশেই।

সুইচাঁদির পরই সমস্ত উপত্যকা সঙ্কীর্ণ হতে চলেছে। সমতল অঞ্চল জুড়ে যেমন উপত্যকার অনেক অংশ দখল করে রয়েছে, তেমনি অসমতল অংশও কম নয়। এই সমতল ও অসমতল অঞ্চল জুড়েই টিপরাখড়ক। মোটামুটি সমতল অঞ্চল জুড়ে পাও, টিপা, ডায়ন্থোনিয়া ঘাসের মসৃণ গালিচা। সুন্দর সবুজ ঘাস, মাঝে মাঝে হালকা সোনালী আভাযুক্ত কুশনের মতো মসৃণ। উপত্যকার একটা দিক ঢেউ খেলানো, সেখানে ডায়ন্থোনিয়ার ঘাসের উদ্ধত উদ্দাম দীর্ঘ ডগা মাঝে মাঝে অন্য গাছগুলোকে ঢেকে রাখতে চায়। বিশেষ করে জিরানিয়াম ওয়ালিচিয়ানামের অজস্র ফুল পাতা গাছের ডগা যেন মাটির বুককে ঢেকে রাখে। সেই অঞ্চলে জিরানিয়াম আর ডায়ন্থোনিয়ার দারুণ প্রতিযোগিতা—কে কত দ্রুতবেগে দীর্ঘ হয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে। ঘাস সৃষ্টির শুরুতে এসেছিল সে মাটির বুকে। দুঃখ-বেদনার দিন সমাপ্ত করে গ্র্যামিনিয়ার বিশাল গোত্র পৃথিবীর স্থলভাগের এক স্থান থেকে অপর স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। জীবনযুদ্ধে হার মানেনি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়েও। তাই আজো তার অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়।

টিপড়াখড়কে বেশ বনেদী বংশের উদ্ভিদ বসবাস করে। এই অংশের শেষপ্রান্ত তুষার অঞ্চলের শুরু। রতবন পর্বত, গৌরী পর্বত আর হাতী পর্বতের তীব্র হিমেল হাওয়া এসে সমস্ত নন্দনকাননের বুকে শীতল স্পর্শ এনে দেয়। এই পরিবেশের

মধ্যেও উদ্ভিদ তার বংশ বৃদ্ধি করে। বিশাল ভূভাগ দখল করে থাকে। দুঃখ, কষ্ট, বেদনার কথা ভুলে গিয়ে বিচিত্রবর্ণের ফুল ফুটিয়ে নন্দনকাননকে বিচিত্র সাজে সাজিয়ে রাখে। নন্দনকাননের চারদিকটা দীর্ঘ গিরিশিরা দিয়ে প্রাচীরের মত ঘেরা। উত্তর দিকটায় বামনীধর ও রুপীনধর-এর দীর্ঘ গিরিশিরা। পশ্চিম দিকটায় দীর্ঘ গিরিশিরায় খুন্টাখাল গিরিপথ। রতবন, গৌরী পর্বত ও হাতী পর্বতের দীর্ঘ গিরিশিরা পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে মোড় ঘুরে দক্ষিণে ঢাল হয়ে চলে গিয়েছে সোজা পশ্চিমে। এই গিরিশিরা দীর্ঘ হলেও তার একটি শাখা এগিয়ে গিয়েছে দক্ষিণ পশ্চিমে। এই গিরিশিরার শীর্ষে সপ্তশৃঙ্গ। এই দীর্ঘ গিরি প্রাকারের মতো গিরিশিরা নন্দনকাননকে ঘিরে রেখেছে চার দিকটায়। আর এই নন্দনকাননের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সুন্দর তিনটি ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড।

টিপরাখড়কে নানা ধরণের উদ্ভিদের মধ্যে আমবেলিফোলিয়া, লেবিয়েট, ক্রুসিফেরা গোত্রের কিছু কিছু প্রজাতি রয়েছে ছড়িয়ে। লিগুমিনাসি গোত্রের খুব সামান্য প্রজাতি দেখা যায়। তার মধ্যে অ্যাস্ট্রাগালস্ পরিবারের দু একটি প্রজাতি কখনো কখনো দেখা যায়।

এছাড়াও মৃত্তিকাস্থ বিশেষ ধরণের মূল্যবান অর্কিড দেখা যায়। সাধারণ সপুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যে কম্পোজিটা, রোজাসিয়া, জেনসিয়ানাসিয়া গোত্রের বেশ কিছু প্রজাতি দেখা যাবে। টিপরাখড়কের উচ্চ অংশের সাধারণ প্রজাতিগুলোর মূল স্ফীত, মূলে সুগন্ধি ভোলাটয়েন তেল থাকে। অনেক গাছের মূলে মূল্যবান অ্যালকলয়েড থাকে, যা ভেষজগুণযুক্ত। টিপরাখড়কের শেষ সীমানায় ধীরে ধীরে উদ্ভিজ্জ বিরল হতে থাকে। সেখানে শুষ্কতা…শুধু পাথরের ঢাল। সামনেই শুধু গ্রাবরেখার পাথরগুলো…দূর থেকে হিমবাহের বরফ দেখা যায় না। পূর্ব দিকটায় উত্তর দক্ষিণে প্রসারিত খাড়া দেওয়ালের মতো গিরিশিরার গায়ে রতবন, গৌরী পর্বত আর হাতী পর্বত। গিরিশিরার পূর্ব-উত্তর কোণে দেখা যাবে বিখ্যাত ভ্যুইগুারকান্তা গিরিপথ। এই গিরপথ পেরুলেই বানকুণ্ড হিমবাহ। হিমবাহ অতিক্রম করেই বিখ্যাত গ্রাম গামশালী। গাড়োয়াল হিমালয় থেকে কুমায়ুন হিমালয়ের অন্যতম প্রবেশপথ ভ্যুইগুারকান্তা গিরিপথ।

ভ্যুইগুারকান্তা গিরিপথে যাবার পথের আগেই টিপরাখড়ক থেকে সোজা উত্তরে দেখা যাবে বামনীধরের ঢাল গিরিশিরা। সে ঢাল বেয়ে অজস্র জুনিপার, রোডোডেনড্রন, অ্যাস্বপোগনের ঢাল বেয়ে উঠলেই সুন্দর ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড চাকুলথেলা। চাকুলথেলা যাবার পথে ছড়ানো পাথরের ঢালের মধ্যে সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে

মেকানপসিস অ্যাকুলিয়েটার বেশ বড় ধরণের কলোনী। মাঝে মাঝে দেখা যাবে রিউম আর পোলাইগোনামের গাছ; রিউমের বড় বড় পাতাসহ। কচি পাতায় ধবধবে সাদা, লাল, ম্যাজেন্টা, হলদে রঙের ছাপ। সুন্দর দেখতে। একটা গাছ বেশ কয়েকটা বড় বড় ডালপালা নিয়ে অনেকটা জায়গা দখল করে থাকে। রিউম গাছের ডগা ভীষণ টক। পাহাড়ী মানুষরা নুন দিয়ে খায়। মেকানপসিস অ্যাকুলিয়েটা বা নীল পপির গাছের আশে পাশে রিউমের গাছ হিমালয়ের অনেক জায়গাতেই দেখা যায়। হয়তো নীল পপি এর কাছাকাছি থাকতে ভালবাসে। নীল পপির বাসস্থান পুরানো গ্রাবরেখার এবড়ো খেবড়ো পাথরের ঢালে। এমনি একটা স্থান কিন্তু পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে অনেক পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায়। যেমন বড় বড় পাথরগুলো ভেঙ্গে গুড়ি গুড়ি হয়ে যায় আবার কখনও কখনও বা মৃত্তিকায় পরিণত হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে রিউম ও মেকানপসিস্ অ্যাকুলিয়েটার গাছের পাশে পাশে পোলাইগোনামের গাছ দেখা যাবে। পোলাইগোনাম বড় বড় পাথর ভেঙ্গে গুড়ো গুড়ো করতে সাহায্য করে। হিমালয়ের সমস্ত উপত্যকায় পাথর ভেঙ্গে মৃত্তিকায় পরিণত করবার অপরূপ কারিগর পোলাইগোনাম আর এপিলোবিয়াম। নীল পপির ঘর দেখতে দেখতে উচ্চ উপত্যকায় ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড চাকুলথেলায় পৌছে যাওয়া যাবে। মাঝে মাঝে পায়ে হাঁটা পথের চিহ্ন দেখা যাবে পূর্ব-উত্তরে ভ্যুইণ্ডারকান্তা গিরিপথের দিকে। ১৯৩৭ সনে এই পথ ধরেই স্মাইথ এসেছিলেন নন্দনকাননে। প্রবেশ পথের শুরুতেই তিনি প্রথম নীল পপির বাসস্থানের সামনে এসেছিলেন।

চাকুলথেলা, স্বল্প পরিসর স্থানযুক্ত ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডের উচ্চতা ১৪০০০ ফুটেরও বেশী। এই ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডের পশ্চিম ও পূর্বে উচ্চ গিরিশিরা। পশ্চিমে বামনীধর আর রূপীনধর। এই গিরিশিখরের একটি অংশ সোজা চলে গিয়েছে উত্তরে। চাকুলথেলার শেষ পূর্ব প্রান্তের গিরিশিরা সোজা উত্তরে গিয়ে বিখ্যাত নীলগিরি পর্বতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। চাকুলথেলা থেকে সোজা পথ চলে গিয়েছে খুলিয়াঘাটা গিরিপথের দিকে। গিরিপথের নীচে খুলিয়া গার্ভিয়া হিমবাহ।

চাকুলথেলা মোটামুটি উদ্ভিজ্জশূন্য স্থান। বড় বড় পাথর···তার তলা দিয়ে কল কল করে জলধারা বয়ে চলেছে। পোলাইগোনাম আর এপিলেবিয়ামের দল আসতে পারেনি। তবু দু একটা পাথরের খাঁজে এনাফেলিসের কিছু গাছ বসবাস করে নির্বান্ধব অবস্থায়। কাছেই পাথরের গায়ে বেশ বড় গুহা। সেই গুহায় চার পাঁচজন বেশ স্বচ্ছন্দে রাত্রিবাস করতে পারে। বকৃড়িওয়ালারা রাত্রি বাস করে ভেড়া-বকৃড়ি ছেড়ে দিয়ে। দূরে ঢালের গায়ে কিছুটা সমতল স্থানে রুমেক্সের

দু-চারটে শুকনো গাছ দেখা যাবে। জলের অভাব, তাই শুষ্কতার জন্য ভেড়া-বক্‌ড়িদের সঙ্গে আসা রুমেক্সের বীজ পড়লেও গাছ জন্মে কলোনীর সৃষ্টি করতে পারিনি। ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডের কাছে পাহাড়ের দেওয়ালের গায়ে···ফাটলের মধ্যে অজস্র জটামাংসীর গাছ দেখা যাবে। চাকুলথেলা থেকে নীচে দেখা যাবে ভ্যুইণ্ডার উপত্যকার সুন্দর পরিচ্ছন্ন চিত্র। এইসব নিয়েই নন্দনকানন। নন্দনকাননের শেষ প্রান্তেই চাকুলথেলা। দূরে সস্যুরিয়া সাক্রার চারাগাছ জন্মে। শীতের বরফ গলতে দেরী হলেই সস্যুরিয়ারা ঘুমিয়ে থাকে বরফের লেপমুড়ি দিয়ে। বরফ হয়তো গলতে আরম্ভ করেছে···এর মধ্যে বর্ষার আগমন, আবার তুষারপাত। বিরক্ত হয়ে সস্যুরিয়া কুম্ভকর্ণের মত ঘুমে অচেতন থাকে। সস্যুরিয়া সাক্রা নিম্ন-উপত্যকায় বসবাস করতে পারে না। হিমবাহের বরফের কাছাকাছি অথবা তুষারসীমার ওপরে··· যেখানে শীতের দিনগুলো দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে বর্ষার সঙ্গে মিতালী করে. বসন্তের আগমনে বাধ্য হয়েই যেন বিদায় নিতে হয়, তখন সস্যুরিয়া সাক্রা পবিত্র পরিবেশে আত্মপ্রকাশ করে। সস্যুরিয়া সাক্রাকে ফুল ফোটাতে হয় অত্যন্ত অল্প সময়ের ব্যবধানে। কারণ উচ্চ হিমালয়ে বসন্ত অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। এই সময়টাকেই সস্যুরিয়া তার জীবনের পূর্ণতা নিয়ে আসে। শীতের তীব্র হিমেল নীল চোখ দুটো মেলে হয়তো আসছে অনেক দূর থেকে। কতদূর থেকে জানা নেই। তাই ফুল ফুটিয়ে, ফুলের কোমল পেলব দেহ মখমলের মতো মসৃণ আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখে।

১৯৬২ সনের নন্দনকাননের সঙ্গীদের মধ্যে উপেনদা আর চন্দ্রসিং-এর কথা যেন ভুলতে পারি না। ড উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বর্তমানে বোটানিকাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার ডেপুটি ডিরেক্টর। দেরাদুনে রয়েছেন কার্যস্থলে। তাঁর কথা কিছুটা লিখেছিলাম আমার 'হিমালয়ের ফুল' বইটিতে। যোশীমঠ থেকে সবার সঙ্গে উপেনদাও যাত্রা শুরু করেছিলেন। হিমালয়ের নিম্ন অঞ্চলের উদ্ভিদ সংগ্রহের কাজ করবার মতো তেমন সময় ছিল না। যোশীমঠ থেকে গোবিন্দঘাট পর্যন্ত পথে সামান্য উদ্ভিদ সংগ্রহ হয়েছিল। গোবিন্দঘাট ভ্যুইণ্ডার উপত্যকায় প্রবেশ পথ। সেখান থেকেই ফুলের প্রজাতি সংগ্রহ শুরু হয়েছিল। তারপর ঘাংঘরিয়া, সেখান থেকে লোকপাল। সর্বশেষে নন্দনকানন। নন্দনকাননের টিপরাখড়কের মূল শিবির স্থাপিত হয়েছিল। সেখানে অবস্থান কালে ফুলের সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। ঈশ্বরের উদ্যানের সঙ্গে এই ভাবেই বুঝি পরিচয় ঘনিষ্ঠ হতে চলেছিল। সারাদিন ঘুরে ঘুরে ফুলের সঙ্গে পরিচয়, গোত্র বিচার, জাতি বিচার, পংক্তি নির্ণয় করা হয়, পরে প্রস্ফুটিত

ফুলসহ গাছের কাণ্ড সংগ্রহ করে নিয়ে এসে দিনান্তে বসে বসে ব্লটিং পেপারে সযত্নে সংরক্ষণের কাজ করতেন উপেনদা। অনেক অচেনা ফুল আমার চেনা হয়ে গিয়েছিল। অনেক গাছের বিচিত্র জীবনযাত্রা শুনতাম দারুণ আগ্রহ সহকারে।

সংগৃহীত গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে আমি কেমন যেন আনমনা হয়ে যেতাম। ফুলগুলো সবই গাছশুদ্ধ, নয়তো ছোট ছোট ডাল কেটে আনা। ফুলের ঔজ্জ্বল্য শেষ হয়ে গেছে, বিবর্ণ হয়েছে কেউ কেউ। এরপর মৃত ফুল কুকড়ে শুকিয়ে যাবে। মৃত ফুল, জীবনযাত্রার অনেক পথ বাকী ছিল। তাই দুঃখে বেদনায় ম্লান হয়ে মৃত হয়েছিল। বসে বসে দেখতাম আর শুনতাম উদ্ভিদ বিজ্ঞানীর কাছ থেকে নানা বিজ্ঞানের কথা। একজন পাহাড়ী মানুষ পরম আগ্রহভরে উপেনদার সংগৃহীত ফুল দেখতো। তার চোখ দুটো ঝক্‌ঝক্ করতো, যেন খুবই চেনা, খুবই পরিচিত ফুল। দর্শনেই চিনতে পেরে মুগ্ধ হোত যে মানুষটি, তার নাম চন্দ্রসিং। নীলগিরি (গাড়োয়াল) পর্বত অভিযানে চন্দ্রসিং এসেছিল অভিযাত্রীদের সঙ্গে। অভিযাত্রীদের মূল শিবিরে সে সবার জন্য খানা বানাতো। অভিযানে পোটারদের সর্দার শেরসিং তাকে ধরে নিয়ে এসেছিল কুমারচটি থেকে। সুন্দর সুঠাম চেহারা, মৃদুভাষী, অত্যন্ত বিনয়ী ও নম্র। মুখে তার সর্বদাই হাসি। নেপালে পোখরার কাছাকাছি কোন এক গ্রামে তার জন্ম। তারপর অল্প বয়সেই ঘর ছেড়ে চলে এসেছিল। সংসারে অনেক মানুষ, অযত্ন আর অনাহার সহ্য করতে পারেনি। তাই হয়তো এসেছিল রুজির জন্য। সরল সাদাসিধে মানুষ, সমতল ভূমি পেরিয়ে ধীরে ধীরে এসেছিল বদ্রীনাথের পথে। পিপোলকোঠি থেকে হেলাংচটি, তার পর কুমারচটি। সেখানেই ঘর বেঁধেছিল। তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে যেতো কেদার-বদ্রী তীর্থে। এপ্রিল মাসের শেষেই গাড়োয়ালী মানুষদের সঙ্গে যেতো উচ্চ হিমালয়ে ভেড়া-বকৃড়ির দল নিয়ে। তাদের সঙ্গেই দিন অতিবাহিত করতো বুগিয়ালে অক্টোবর মাসের শেষ পর্যন্ত। শেষে গাড়োয়ালী মানুষদের আপন করে তাদের অতিপরিচিত হয়েছিল। বিয়ে করেছিল, সঞ্চিত অর্থ দিয়ে নিজেও ভেড়া-বকৃড়ি কিনেছিল, ঘোড়া কিনেছিল মাল বইবার জন্য। গাড়োয়ালী বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বুগিয়ালের সমস্ত পথ চিনে ফেলেছিল। বুগিয়ালের ফুল, গাছপালা ভালবেসে চিনে ফেলেছিল। হিমালয়ের বিভিন্ন উচ্চতায় বুগিয়ালে অজস্র জড়িবুটির গাছ জন্মে। এইসব জড়িবুটি পাহাড়ে মানুষদের রোগের সহায়ক। চন্দ্রসিং ভেড়া বকৃড়ি নিয়ে বুগিয়ালে ঝুপড়ির মধ্যে বসবাস করতো। ভেড়া-বকৃড়ি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠে ঘাস খেয়ে ফিরে আসতো ঝুপড়ির কাছে। চন্দ্রসিং ঘুরে বেড়াতো বুগিয়ালে

জড়িবুটির সন্ধানে। এমনি করেই তার কেটেছে যৌবনের কিছুকাল। বুগিয়ালকে সে ঈশ্বরের উদ্যান হিসেবে ভালবেসেছিল। কারণ, এই উদ্যানে যে সবকিছুই মেলে। চন্দ্রসিং মুগ্ধ হয়ে দেখতো সবকিছুই। নন্দনকানন তার অতি প্রিয়, অতি পরি চত স্থান। চন্দ্রসিং এই অঞ্চল থেকে সবরকম ভেষজগাছ সংগ্রহ করে শুকিয়ে নিয়ে আসতো। তারপর সেই শুকনো গাছগুলো সমতলভূমিতে বিক্রয় করতো। নীলগিরি পর্বত অভিযানের মূল শিবির নন্দনকাননের টিপরাখড়কে। চন্দ্রসিং-এর অত্যন্ত পরিচিত স্থান। এই পথের সবকটি ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড তার চেনা। এই পথ ধরে বন্ধুদের সঙ্গে ভ্যুইণ্ডারকান্তা গিরিপথ অতিক্রম করে চলে যেতো গামশালী। কখনও ভেড়া-বকড়ি নিয়ে নন্দনকানন থেকে বেরিয়ে খুন্টাখাল পেরিয়ে চলে যেতো হনুমান-চটি। সেই ফাকে বদ্রীনাথ দর্শন করে তীর্থ যাত্রীদের সঙ্গে চলে যেতো কুমারচটি, তার ঘরে।

চন্দ্রসিং খানা বানাতে খুবই ওস্তাদ। এ কাজটি সে খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে করতো। ভোরে ঘুম থেকে উঠেই তাকে দেখতাম পাশেই ভ্যুইণ্ডার গঙ্গার ধারে বসে সাবান দিয়ে হাত মুখ ধুতে। তারপর স্টোভ ধরিয়ে চা তৈরী করে সবাইকে বেড্-টি দিত সবার ঘুম ভাঙ্গিয়ে। আমি কিন্তু কিচেনের সামনে পাথরের ওপরে বসে এইসব দেখতাম। চন্দ্রসিং আমার হাতে মগ দিয়ে বলতো—চা পিও সাব। আমি বলতাম : এ চা খাবো না।

—কিউ সাব্?

—আমি তোমার চা খাবো।

চন্দ্রসিং হো হো করে হাসতো আর বলতো ওতো নিমকিন্ চা।

—ঐ নিমকিম্ চা-ই আমি খাবো।

চন্দ্রসিং এতে খুব খুশী হত। আমার মগ ভর্তি করে দিত সেই চায়ের লিকার। এরপর সামান্য নুন দিত, গোল মরিচের গুড়ো, আদার কুচি ছড়িয়ে দিত চায়ে। পরে চন্দ্রসিং তার নিজস্ব ব্যাগ থেকে ছোট্ট কৌটো বের করে সামান্য এক টুকরো মাখন কেটে নিত ছুরি দিয়ে। ঐ মাখন থেকে সামান্য একটু অংশ গরম চায়ের ভেতর ফেলে দিত। তারপর মগ ভর্তি নিম্‌কিন চা আমার হাতে ধরিয়ে দিত। গরম চায়ের মধ্যে শক্ত মাখন একটু একটু করে গলে যেতো। সমস্ত চা শেষ হোত, খনও সম্পূর্ণ গলে যেতো।

চন্দ্রসিং বলতো, এ চা বহুৎ বড়িয়া চা। বহুৎ গরম, তবিয়ৎ আচ্ছা রাখ্‌তা হ্যায় সাব্। এরপর বেলা সাতটার মধ্যে আবার চা, জল-খাবার বানিয়ে দিতো চন্দ্রসিং।

বেলা বারোটার মধ্যে লাঞ্চ, যদি সবাই তাবুতে রেষ্ট নেয়। নতুবা বেলা সাতটায় জলখাবার ও লাঞ্চ এক সঙ্গেই দিত। সব কাজ শেষ করে চন্দ্রসিং আবার সাবান হাতে নিয়ে যেতো ভ্রূইগুার গঙ্গার ধারে। হাত মুখ ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হত। চন্দ্রসিং-এর কোমরে রঙীন সুতোয় থাকতো বাশী। ঐ বাশী বাজিয়ে জানাতো ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ বা ডিনার রেডি। চীৎকার করে ডাকতো না কাউকেই। সবাইকে লাঞ্চ দিয়ে চন্দ্রসিং নিজে খানা শেষ করে কিচেন গুছিয়ে নিত। তারপর বেলা ন'টা নাগাদ কারো কাছ থেকে চেয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে ছোট থলে আর আইস এক্স নিয়ে বেরিয়ে পড়তো। ফিরে আসতো ঠিক বেলা চারটের মধ্যে। আবার চা, সামান্য জলখাবার। নন্দনকাননে রাতের অন্ধকার আসতে সময় লাগতো। বেলা সাতটা পর্যন্ত চারদিক আলোকিত থাকতো। ঠিক সাড়ে আটটায় ডিনার, রাত নটায় ইট্ট ড্রিঙ্কস খাইয়ে তাঁবুর সামনে গিয়ে হেসে বলতো···গুড নাইট, সাব্, গুড নাইট। সব তাঁবু থেকেই প্রত্যুত্তরে শোনা যেতো গুড্ নাইট। তাঁবুগুলোর ভেতর তখন গল্প আর হাসির উল্লাস। আমি ধীরে ধীরে চলে যেতাম কিচেনের সামনে। চন্দ্রসিং তার থলে বার করে সেদিনের সংগ্রহ পরীক্ষা করে রাখতো যত্ন করে।

তারপর কিচেনে কাঠের আগুনের সামনে বসে আমাকে গল্প শোনাতো, বুগিয়ালের গল্প। বুগিয়াল ঈশ্বরের উদ্যান, চন্দ্রসিং একথা আমাকে বার বার বলতো। ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসতো নন্দনকাননের বুকে। ভ্রূইগুার গঙ্গার কল কল ধ্বনি, মাঝে মাঝে হিমানী সম্পাতের বজ্রনির্ঘোষ অদ্ভুত লাগতো আমার। সারা আকাশ জুড়ে অজস্র তারা। অনেক রাত পর্যন্ত বসে শুনতাম চন্দ্রসিং-এর গল্প। দূর থেকে আনা জুনিপার গাছগুলো আগুনে জ্বলতো। কেমন এক অদ্ভুত গন্ধ আসতো। গরম কিচেনের ধারেই বিছানা করে শুয়ে পড়তো চন্দ্রসিং।

একদিন খাওয়া-দাওয়া শেষ করে চন্দ্রসিং আইস এক্স নিয়ে বেরুবার উপক্রম করতেই আমি তাকে বাধা দিই।

চন্দ্রসিং থম্‌কে দাঁড়িয়ে বলে—জী সাব্?

—কোথায় চলেছো?

—থোড়া ঘুম্‌নে কে লিয়ে, সাব্।

—হাম যায়গা।

—চন্দ্রসিং হেসেই বাঁচে না। আপ কাঁহা যাওগে, সাব্?

—কেন? তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাবো।

—মেরা সাথ? চন্দ্রসিং যেন অবাক হয়ে যায়।

—হ্যাঁ, তোমার কোন আপত্তি আছে?

—নেহি সাব! এতো বহুত খুশী কা বাত্।

চন্দ্রসিং-এর সঙ্গে চলতে থাকি। মোটামুটি সুন্দর স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে যেত পরিষ্কার পথ ধরে। চন্দ্রসিং জানায়—এই পথ তৈরী হয়েছে বকৃড়িওয়ালাদের চলা-ফেরার ফলে। পথের দুধারে জিড়া আর মৌরীজাতীয় ফুলযুক্ত গাছ। অনেক গাছের ফুল ঝরে বীজ হয়েছে। সমস্ত গাছগুলোরই বেশ সুন্দর গন্ধ। এরা আমবেলী-ফেরিয়া গোত্রের গাছ। চন্দ্রসিং-এর ধারণা এ গাছগুলো খুবই মূল্যবান দাওয়াই। আমবেলিফেরিয়া গোত্রের বেশ কিছু সংখ্যক গাছ রয়েছে নন্দনকাননের প্রবেশ মুখে। এই সব গাছের ভীড়ের মধ্যে রয়েছে গোলাপজাতীয় রোজাসিয়া, কম্পোজিটা আর জিরানিয়াসি গোত্রের বেশ কিছু পরিবারের ফুল। চন্দ্রসিং আমাকে নিয়ে আসতো মার্গারেট লেগীর সমাধি স্থলের কাছে। কাছেই বকড়িওয়ালাদের ঝুপড়ি রয়েছে। বেশ পুরানো ঝুপড়ি। বুঝতে পারি, ঝুপড়িগুলোয় বকড়িওয়ালারা এখন আর রাত্রি বাস করে না। বেশ ভগ্নদশা হয়ে পড়ে আছে ঝুপড়িগুলো। এই ঝুপড়িতেই অনেকবার রাত্রিবাস করেছে চন্দ্রসিং। পাথরের পর পাথর সাজিয়ে দেওয়াল বানিয়েছিল। ছাউনি দিয়েছিল ভূজগাছের ডালপালা আর পাতা দিয়ে। শীতের বরফ গলা শুরু হতেই সবুজ ঘাস, গোলাপী, লাল, সাদা, বেগুনী রঙের ফুল ফুটে উঠতো চারদিকে। চন্দ্রসিং বকড়ির দল নিয়ে আসতো গাড়োয়ালী বন্ধুদের সঙ্গে। ওপারে ভ্যুইণ্ডার গঙ্গার ওপর শক্ত বরফ। সেই বরফের তলা দিয়ে কল কল শব্দে জল বয়ে যায়। বরফে ঢাকা রোডোডেনড্রন আর ভূজগাছের অনেক অংশই বরফে ঢাকা। এই গাছগুলোর ডালে ডালে থোকা থোকা বরফ। কিন্তু গাছের ডালের ডগায় আছে গোলাপী রঙের ফুল। ফুলগুলো দেখেই শীতের কষ্ট ভুলে যেতো চন্দ্রসিং। রামদানার রুটি, আলু সেদ্ধ দিয়ে তরকারী, এই তাদের রাত্রির খাবার। সকালে আলুসেদ্ধ আর চা।

চন্দ্রসিং জানায়—সমস্ত বুগিয়ালটা ঘুরে বেরানো যেত ভেড়া-বকড়িগুলোর সঙ্গে সঙ্গে। অনেক দূর পর্যন্ত যেতে হোত। বিকেল হতেই খুঁজে বার করতো রাত্রি-বাসের উপযোগী জায়গা। জায়গা মিলতো ঠিক পাথরের ধারে, জলধারার কাছে পাথরের পর পাথর সাজিয়ে ঝুপড়ি বানিয়ে ফেলতো। দূর থেকে যোগাড় করে নিতো জুনিপারের গাছ। ঐ গাছ আবার কাচা অবস্থাতেও দাউ দাউ করে জ্বলে। চন্দ্রসিং-এর কাছ থেকেই শুনেছিলাম সুঁইচাদি, টিপরাখড়ক আর চাকুলথেলা পর্বতের কথা। চন্দ্রসিং জানাল চাকুলথেলায় প্রচুর দামী গাছ রয়েছে। বহুৎ

কিম্মতি দাওয়াই, সুগন্ধি গাছ। অনেকরকম পুজোয় লাগে ঐ গাছ—ধুনোর মতো শুকনো গাছ জ্বালাতে হয় পুজোর জায়গায়। এই গাছ কবিরাজী ওষুধেও ব্যবহার করা যায়।

আমি বুঝলাম, চন্দ্রসিং জটামাংসীর কথা বলতে চায়। জটামাংসী সংগ্রহ করতে হয় বহু কষ্ট করে। কাজেই জিরানিয়াম নেপালেনসিসের গাছ দেখিয়ে চন্দ্রসিং বলে···এই গাছের মূল দিয়ে দাওয়া বানানো হয়। একে পাহাড়ী মানুষ বলে 'লাল জহুরী'। তেমনি একোনাইট হিটারোফাইলা গাছকে বলে অতীশ। পিক্রোজা কারুকে বলে কটুকি।

সামান্য সময়ের মধ্যেই চন্দ্রসিং আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখায় দুইচাঁদির সীমানা। এরই ফাঁকে কিছু কিছু গাছ তুলে নিয়ে থলের ভেতরে রাখে। সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিক বলে অনেক গাছের ফুল ঝরে গিয়েছে। এর মধ্যে খুঁজে খুঁজে চন্দ্রসিং আইস এক্স দিয়ে মাটি খুঁড়ে গাছের মূল বার করে আমাকে দেখায়। ঠিক যেন মানুষের হাতের পাঞ্জার মতো পাঁচটি আঙুল।

চন্দ্রসিং বলে—এই গাছকে পাহাড়ী মানুষ বলে হাতাজড়ি, সালেম পাঞ্জা। এই হাতের আঙুলের মতো কিম্মতি জড়ি ভাল করে ধুয়ে-মুছে রৌদ্রে শুকিয়ে নেয়। তারপর ঘরে ফিরে গিয়ে দুধে সেদ্ধ করে আবার শুকিয়ে রাখে। ফলে এই গাছের মূল্যবান মূল আর নষ্ট হয় না। এই শুকনো মূল গুড়ো করে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে শরীরে তাগদ আসে।

মার্গারেট লেগীর সমাধি স্থানের কাছাকাছি একোনাইট হিটারোফাইলার অনেকগুলো গাছ রয়েছে। চন্দ্রসিং কিছু কিছু গাছের মূল সংগ্রহ করে দেখায়। আমি ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখি গাছের মূলগুলো স্ফীত।

চন্দ্রসিং বলে—একেই বলি অতীশ। বহুৎ তাগদ হোতা হ্যায়, সাব্। অতীশ দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে হয়। অতীশ আর হাতাজড়ি—এগুলোর মূলে প্রচুর কার্বো-হাইড্রেট আছে। হয়তো ঔষধ গুণযুক্ত অ্যালকলয়েডও রয়েছে মূলে।

ফেরার সময় চন্দ্রসিং কিছু কটুকির গাছ তুলে নিয়ে আসে। চলতে চলতে বলে—সাব্, তোমাকে নিয়ে একদিন জটামাংসী তুলে আনবো।

মূল শিবিরের স্থানটির নাম টিপরাখড়ক। এ নামকরণের কোন ইতিহাস আমাদের জানা নেই। সামনেই বুগিয়ালের সীমানা শেষ। তারপর পুরানো গ্রাবরেখার বিক্ষিপ্ত পাথর। এই সব পাথরের মাঝখান দিয়ে এঁকে বেঁকে বয়ে চলেছে ভ্যুইগুার

গঙ্গা। উৎসস্থল থেকে মাইল দুয়েক দূরে একটি হিমবাহ। তাঁবুর সামনে বসে মুহুর্মুহু হিমানী-সম্প্রপাত দেখতে পাওয়া যায়। রতবন, গৌরী পর্বতশৃঙ্গ ও গিরিশিরা থেকে সঞ্চিত বরফ বজ্রনির্ঘোষে নেমে আসে হিমানী-সম্প্রপাত। ভ্যুইণ্ডার গঙ্গার উৎসস্থলে দেখতে পাওয়া যায় অর্ধগোলাকার বরফের প্রাচীরের মাঝখান থেকে একটি বরফের গুহা। ঐ গুহা থেকেই জলধারা বেরিয়ে এসে ভ্যুইণ্ডার গঙ্গায় নামে। টিপরাখড়ক সম্পূর্ণ মসৃণ তৃণভূমিতে ঢাকা। এর মধ্যে বিখ্যাত পাও, স্টিপা ও ডায়োস্থনিয়া ঘাস ছড়ানো রয়েছে সর্বত্র। বর্ষাশেষ হয়ে গেছে। শীতের আগমনের জন্য সমস্ত উপত্যকা যেন প্রস্তুত। তাই টিপরাখড়কের অনেক মূল্যবান উদ্ভিজ্জ প্রায় শুকিয়ে যেতে শুরু করেছে। ১৯৫৯ সনে আমার টিপরাখড়ক দেখা হয়নি। তাই পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়। টিপরাখড়কের এক অংশে প্রচুর ফার্ণ গাছ রয়েছে। তার কাছেই পেডিকুলারিসের গোলাপী ফুল দূর থেকেই দেখা যায়।

সকালবেলায় জলখাবার খেয়ে আমি এক প্রস্ত ঘুরে দেখি টিপড়াখড়কের উত্তরাংশ। এই উত্তরাংশে বামনীধরের গিরিশিরা। বেশ কিছু সময় ঘাসের বুকে বসে সময় কাটাই। বাঁশীর শব্দ শুনে চলে আসি তাঁবুতে। বুঝতে পারি লাঞ্চ-এর বাঁশী। খেয়ে-দেয়ে বসি উপেনদার তাঁবুর সামনে। উপেনদা তাঁর সংগৃহীত ব্লটিং-পেপারের সংরক্ষিত সমস্ত প্রজাতিগুলি ভালভাবে পরীক্ষা করছিলেন। ব্লটিং-পেপারগুলো বদলে দিয়ে নতুন ব্লটিংপেপার-এ শুকনো গাছগুলো সংরক্ষণ করছিলেন। দেখতে দেখতে কেমন যেন আনমনা হয়ে যাই। নন্দনকাননের সমস্ত অঞ্চল জুড়ে উদ্ভিদের গোত্র নির্ণয় ও পংক্তি বিচার অদ্ভুত লাগে। প্রথম দিকটা র‍্যানানকুলাস গোত্রের একোনাইট ডেলফিনিয়াম-এর দু তিনটি করে প্রজাতি দেখা যায়। জিরা-নিয়াসি গোত্রের মাত্র দুটি প্রজাতি ছড়িয়ে রয়েছে চারিদিকে। পোলাইগোনাসির দুটি প্রজাতি, আমবেলিফেরিয়ার তিনটি প্রজাতি দেখা যায়। টিপরাখড়ক আর চাকুলখেলার অধিকাংশ প্রজাতির মূল বেশ স্ফীত। মূলে সুগন্ধি ভোলাটয়েল তেল রয়েছে। চাকুলখেলার পথে জুনিপার আর রোডোডেনড্রন অ্যান্থপোগন। এই দুটি প্রজাতিই ভিন্ন গোত্রের উদ্ভিদ। হিমালয়ের উচ্চ উপত্যকায় এই দুটি প্রজাতি প্রায় অনেক স্থানেই দেখতে পাওয়া যাবে। এই প্রজাতি দুটির সবগুলোর পাতায় তৈলরস আছে। সুগন্ধি সেই তৈলরস। সেজন্য ঐ পথের কাছাকাছি এলেই সুন্দর মিষ্টি গন্ধ অনুভব করা যায়। বামনীধর গিরিগাত্রে সুগন্ধি জটামাংসীর গাছ দেখা যাবে প্রচুর।

ভ্যালেরিয়ানাসিয়া গোত্রের অত্যন্ত মূল্যবান ভেষজ উদ্ভিদ জটামাংসী। জটামাংসীর বোটানিক্যাল নাম নারডষ্টাচিস্ জটামাংসী (Nardostachys Jatamansy)। আয়ুর্বেদ মতে জটামাংসী তিক্ত কষা রস। মেধাবৃদ্ধিকর, বল ও কান্তিবর্দ্ধক। মেয়েদের হিষ্টিরিয়া রোগের পক্ষে মূল্যবান ওষুধ। বুক ধড়ফড়ানি ও দুর্বলতা দূর করে। জটামাংসী খাড়া পাহাড়ের ঢালে পাথরের ফাটলের গা দিয়ে অজস্র জন্মলাভ করে। নন্দনকাননে বেশ দীর্ঘদিন অবস্থান কালে এগুলিকে ঘুরে ঘুরে দেখেছি। চাকুলথেলায় প্রায় সপ্তাহখানেক অবস্থান করেছিলাম। বামনীধর গিরিশিরা দীর্ঘ হয়ে সোজা উত্তরে মোড় ঘুরেছে। এই গিরিশিরার গায়ে অজস্র জটামাংসীর গাছ দেখছি। চাকুলথেলার উত্তরে চড়াই পথ এগিয়ে গিয়েছে খুলিয়া ঘাটা গিরিপথের দিকে। এই পথের ধারে অজস্র ফেনকমলের ছোট ছোট গাছ দেখেছিলাম। চাকুলথেলা থেকে একদিন খুলিয়াঘাটা গিরিপথ পেরিয়ে গিয়েছিলাম খুলিয়াগার্ভিয়া হিমবাহে। এই হিমবাহ এসেছে নীলগিরি পর্বত থেকে। খুলিয়াগার্ভিয়া হিমবাহ ছোট ও স্বল্প পরিসরযুক্ত। হিমবাহের সঞ্চিত বরফের গভীরতা খুবই কম। হিমবাহের কোথায়ও তেমন মারাত্মক ফাটল নেই। খুলিয়া-গার্ভিয়া উপত্যকার কোথাও কোন উদ্ভিদের আমরা চিহ্ন দেখতে পাই নি।

অক্টোবর মাসের শেষের দিকে খুলিয়াগার্ভিয়া উপত্যকা থেকে এসেছিলাম টিপরা-খড়ক। নন্দনকাননের চেহারা যেন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত গাছই প্রায় শুকিয়ে যেতে চলেছিল। উপেনদার ফুল সংগ্রহ করা প্রায় বন্ধ হতে চলেছে। জলধারার কাছেই দেখা যায় জেনসিয়ানা আর পোলাইগোনাম। অবশ্য এনাফেলিস সর্বত্র তারুণ্যের জোয়ার অব্যাহত রেখেছে। এর মধ্যে একদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়েছিল। সবাই যেন সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল তুষারপাত দেখার জন্য। প্রথম একটা ঝোড়ো হিমশীতল বাতাস বইতে শুরু করেছিল। তারপর পেঁপের বীজের মতো তুষার পড়তে শুরু করেছিল। বেশ কিছু সময় পরে পেঁপের বীজ ক্ষুদ্র হয়ে সাবুদানায় রূপান্তরিত হয়েছিল। সর্বশেষে একেবারে ধব্‌ধবে সাদা গুড়োর মতো। তাঁবুর ভেতর থেকে হৈ হৈ করে বেরিয়ে পড়েছিল সবাই। আনন্দে নৃত্য করতে শুরু করেছিল। আমি নীরবে বসেছিলাম তাঁবুর মধ্যে উপেনদার পাশে। আর সেখানেই বসেছিল চন্দ্রসিং। বেশ কয়েক ঘণ্টার তুষারপাত। চারিদিকটা অন্ধকার হয়েছিল। সমস্ত উপত্যকা ধব্‌ধবে সাদা হয়ে গিয়েছিল। এরই মধ্যে সমস্ত ঘাসের আস্তরণ ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। সাদা ধব্‌ধবে তুষার। আম্বেলিফেরিয়া গোত্রের ফুট দুয়েক দীর্ঘ গাছগুলো তুষার

পাতের আঘাতে ভেঙ্গে চাপা পড়ে গিয়েছিল। সমস্ত উদ্ভিদ যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল।

১৯৫৯ সনে হিমালয় ভ্রমণের সময় তুষারপাত দেখিনি। ১৯৬৭ সনে সামান্য তুষারপাত প্রত্যক্ষ করেছিলাম। রাত্রিবেলায় তুষারপাত উপলব্ধি করেছিলাম মাত্র। দেখতে পাইনি কিছুই। ১৯৬১ সনে পিণ্ডারী অঞ্চলে দিন সাতেক কাটিয়েছিলাম। তুষারপাত হয়নি একদিনের জন্যও। ১৯৬২ সনে তুষারপাত দিবালোকে প্রত্যক্ষ করেছিলাম। সবার সঙ্গে আমিও উৎফুল্ল হয়েছিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই কেমন যেন এক অদ্ভুত অস্বস্তি, কেমন যেন এক অজানা ভয়। নন্দনকাননের সজীবতা যে হিমশীতল তুষারের তলায় ঢাকা পড়ে যাবে তা তখন বুঝতে না পেরে মুষড়ে গিয়েছিলাম। উপেনদার মতো চন্দ্রসিংও যেন বিমর্ষ হয়ে গিয়েছিল। তুষারপাতের তিন চার দিন পর দেখেছিলাম চার পাশের সমস্ত ফুলের চিহ্ন মুছে গিয়েছে। সবুজ ঘাসের বর্ণ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে এই সব বিবর্ণ গাছ আর সজীব হবে না। এবার শীতের তুষারপাত শুরু হবে। সমস্ত নন্দনকানন ঢাকা পড়ে থাকবে ধব্‌ধবে সাদা তুষারে।

চন্দ্রসিং-এর বিমর্ষ মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কেমন যেন বিমনা হয়েছিল। নন্দনকানন থেকে বিদায় নেবার দুদিন আগে কিচেনে বসে গল্প করছিলাম চন্দ্রসিং-এর সঙ্গে। আমার মগে গরম নিমকিন্ চা দিয়ে ম্লান-কণ্ঠে বলেছিল—সাব্, ইধারকা খেল খতম হো গয়া।

আমি হেসে বলি : হ্যা, এবার সব গোটাতে হবে। এ ক'দিন কি সুন্দর ফুলে ফুলে ঢাকা নন্দনকানন দেখছিলাম!

চন্দ্রসিং বলেছিল—দুনিয়া এইস্তাই হ্যায়, সাব্।

আমি চুপ করে থাকি। চন্দ্রসিং বলে—বুগিয়ালের পুরা আনন্দ বরবাদ হো গিয়া, সাব্। আমি চায়ে চুমুক দিতে দিতে তাকিয়ে দেখি চারদিকটা। চন্দ্রসিং বলে—সাব তিন ঘণ্টা কে লিয়ে বরফ গিরা। আভি মরশুম আচ্ছা হ্যায়। দেখো, কেইসা হো গিয়া। সব খেল খতম।

আমিও বলি : হ্যা, খেল খতম।

—জী, সাব্। সমূচা ফুল মর গয়া। মরনে কা টাইম নেহি হুয়া, সাব্। তব্ ভি মরনে পড়া।

সত্যিতো! সব ফুলগুলোর মৃত্যুর সময় হয়নি। তবু কেন এ মৃত্যু!

—দেওতা কা খেয়াল।

আমি ভাবি দেবতার কি অদ্ভুত খেয়াল। ঈশ্বরের উদ্যান হয়তো এই রকমই।

১৯৭৩ সনে আবার আসতে হয়েছিল নন্দনকাননে। যেন কোথাও যাবার যায়গা নেই, তাই নন্দনকাননে ঘুরে আসি। এক যুগ পরে দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল। ঘাংঘরিয়ায় সেই শিলভারফার আর মেপল গাছগুলো বার্দ্ধক্যের ভারে কুব্জ হয়েছিল। এই এক যুগ পর তাদের সঙ্গে দেখা হবে তো? নন্দনকাননের প্রবেশ মুখে পোলাইগোনাম অ্যালপিনিয়ামের গাছগুলো আছে তো? ঋষিকেশ থেকে বাসে গোবিন্দঘাট, তারপর পথ চলা শুরু। আগস্ট মাস। সবে বর্ষা বিদায় নিতে শুরু করেছে। বসন্তের প্রথম স্পর্শে ফুলগুলো ফুটতে শুরু করেছে। ঘাংঘরিয়ার চারপাশে অজস্র ফুল আবার ফুটেছে। জলধারার কাছে অজস্র ইমুলা গ্র্যাণ্ডিফ্লোরার বড় বড় ফুল। অজস্র জিউম এলিটামের হলদে ফুলের সঙ্গে সঙ্গে জিউমের সাদা ফুল। একধারে ইমপেসেন্সের হলদে ফুল ফুটেছে বড় বড় পাথরের গায়ে। চেহারা যেন বদলে গিয়েছে। কয়েকটি দোকান পাট এবং দু-একটি ছোটখাটো হোটেলের মতো আছে। গোবিন্দঘাটের তীর্থ যাত্রীদের ভীড় কমে গিয়েছে। ভীড় বেড়েছে ঘাংঘরিয়ায়। সেখানে শিখযাত্রীদের পাকাপাকি রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হয়েছে। লোকপালে ছোটা-খাটো একটা গুরুদ্বার বানানো হয়েছে।

সেখানে তীর্থযাত্রী আর ভ্রমণকারীর ভীড় গিয়েছে বেড়ে। সবাই ঘাংঘরিয়ায় অবস্থান করে লোকপাল আর নন্দনকানন দর্শন করে যায়। নন্দনকানন থেকে ফিরে এসে একই অভিযোগ, ফুল কোথায়? ভ্রমণ পিপাসুরা নন্দনকাননের নাম শুনে সেখানে গিয়েছিল, কিন্তু সেখানে গিয়ে তারা হতাশ হয়েছিল। ১৯৫৯ সনের অভিযোগ আবার নতুন করে শুনি।

এই সব সমালোচনা শুনে আমরা যখন নন্দনকাননে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিলাম তখন একদল উৎসাহী বাঙ্গালী তরুণ ভ্রমণপিপাসু বলে : কোথায় চললেন আপনারা?

আমি বলি : নন্দনকানন।

—সেখানে গিয়ে কি দেখবেন? ফুল?

আমি তাকিয়ে থাকি তরুণ যাত্রীর দিকে। তরুণ তাচ্ছিল্যের স্বরে বলে— ফুল-টুল কিচ্ছু নেই। পথে পচা কাদা, দুর্গন্ধ। দু-তিনটি ঝরণা পেরুলেই প্রাণান্তকর অবস্থা। কষ্ট করা পোষায় না।

—পোষায় না!

—হ্যা। সামনে তো শুদ্ধ খাঁ-খাঁ ময়দান। ফুলের নামগন্ধও নেই।

আমি ওর কথায় হাসি। আমি যেন ১৯৫৯ সনের কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি শুনি।

আমার হাসি শুনে তরুণ বলে : বিশ্বাস করছেন না বুঝি ?

আমি বলি : না, বিশ্বাস করবো না কেন ?

আপনাকে আগেভাগেই সাবধান করেছিলাম। একেবারে ফালতু কষ্ট করতে যাওয়া।

আমি বলি : হ্যা, ফালতু বই কি ! কোন ভ্রমণেরইতো অর্থ থাকে না।

—না, নন্দনকাননে অজস্র ফুলের কথা শুনেছিলাম। কিন্তু দেখে হতাশ হয়েছি। আপনিও হতাশ হবেন।

—আমি কিন্তু ১৯৫৯ সনে নন্দনকানন দেখেছিলাম।

—তখন হয়তো ফুল ছিল।

—১৯৬২ সনে নন্দনকাননে একমাস ছিলাম।

থতমত খেয়ে যায় তরুণটি। আমি বলি : নন্দনকানন ভাবতেই যদি সমস্ত অঞ্চল জুড়ে শুধু ফুলের রাজত্ব বোঝেন, তাহলে ভুল হবে। হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরণের ফুল দেখা যাবে ভিন্ন পরিবেশের মধ্যে। আপনারা তো নন্দনকাননের প্রথম দিকটায় পৌঁছেই হতাশ হয়ে চলে এসেছেন।

তরুণটি বলে—হ্যা, ঠিক তাই।

নন্দনকাননের পরিধি কয়েক মাইল দীর্ঘ। একদিনে সব জায়গা দেখা যায় না। এই অঞ্চলে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করতে পারলেই কিছু কিছু ফুল দেখা যাবে। বিনা পরিশ্রমে অজস্র ফুল দেখতে হলে কোলকাতার পার্কে বা কোন তৈরী বাগানে যান।

মনে মনে বলি, এ যে ঈশ্বরের উদ্যান ! দর্শন করবার জন্য প্রস্তুতি চাই, সাধনা চাই। দুঃখ, কষ্ট, ক্লান্তি সব জয় করতে হয়। তবে তো দর্শন হবে। সাধনায় সিদ্ধ হলেই দর্শন লাভ হয়। এসব কথা আমি তখন তরুণ যাত্রীদের বলতে পারিনি।

সব সমালোচনা শোনার পর আমরা সবাই যথারীতি পৌঁছে যাই নন্দনকাননে। প্রবেশ মুখেই পোলাইগোনাম অ্যালপিনিয়াম সুগন্ধি ফুল ফুটিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানায়। মার্গারেট লেগীর সমাধি স্থলে পৌঁছবার জন্য নানা কসরৎ করে দুটি জলধারা পেরুতে হয়। ১৯৫৯ সনে এই জলধারা দুটি দেখেছিলাম কিনা মনে নেই। তবে ১৯৬২ সনে একটি ধারার কথা বেশ স্পষ্টই মনে পড়ে। এই জলধারা পেরুতেই

মার্গারেট লেগীর সমাধি স্থল দেখেছিলাম। এবারে জলধারা পেরুতে হয় দুবার। মার্গারেট লেগীর সমাধি স্থানের ভগ্নদশা দেখে কষ্ট পাই। আগস্ট মাসের শেষ দিকটা বলে চারদিকটায় সবুজের সমারোহ। মার্গারেট লেগীর সমাধির চার পাশে সেই সুন্দর ডেলফিনিয়ামের গাছগুলো কোথায়? তার কাছেই ছিল একোনাইট হিটারো ফাইলারের অজস্র গাছ। স্থানটি ছিল ঝকঝকে তকতকে, মাঝে মাঝে এনাফেলিসের গাছ। গাছের ফুলগুলো বেশ বড় বড়। মনে হয় নতুন গাছের নতুন ফুল। এক যুগ পরে এমন সুন্দর একোনাইট হিটারোফাইলার কলোনী নিশ্চিহ্ন হল কি করে? তবে কি বকড়িওয়ালারা অতীশের সন্ধানে সব গাছ উপড়ে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। চড়া দরে বিক্রয় করেছে হয়তো। তাদের লোভের মাশুল দিতে গিয়ে শুধু যে একোনাইট হিটারোফাইলা হারিয়ে গিয়েছে, তা নয়। প্রায় একইধরণের ফুল দেখে হয়তো ডেলফিনিয়াম গাছগুলোকেও উৎখাত করেছিল। হয়তো বা দস্যুর অত্যাচারে ভয় পেয়ে অতীশ স্থায়ী বাসস্থান পরিবর্তন করে সবার অলক্ষ্যে বাসা বেঁধেছে অন্য কোথাও। ১৯৬২ সনে একমাত্র চন্দ্রসিংই চিনতো অতীশ গাছ। ১৯৭৩ সনের মধ্যে অনেক চন্দ্রসিং-এর উদয় হয়েছে। কাছেই গোটাকয়েক ভুজগাছ আর রোডোডেনড্রন ক্যাম্পান্যুলাটামের গাছ কৃশকায় ও মৃত-প্রায় হয়ে রয়েছে। এই গাছগুলোকে ১৯৫৯ সনে দেখেছিলাম তরুণ। তারুণ্যের ঔজ্জ্বল্যে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। এই সময়ের মধ্যেই গাছ দুটো পুষ্ট হয়ে, বড় হয়ে বার্দ্ধক্যের দ্বারে পৌঁছে যাবার কথা। কিন্তু তার পূর্বেই গাছ দুটির ভগ্নশাখা বিশেষ করে ভূজগাছের ভুজদেশ ছিন্নবিচ্ছিন্ন। কোন জীবজন্তুর কাজ নয়, মানুষের অত্যাচারের চিহ্ন। অত্যাচারের স্বাক্ষর ভূজগাছের দেহে সর্বত্র। মুঁইচাঁদির শেষ সীমানা চিহ্নিত একটি জলধারার কাছেই আমরা রাত্রিবাসের জন্য তাঁবু খাটিয়ে ছিলাম। ১৯৬২ সনে এই জলাধারাটিকে দেখেছিলাম ক্ষীণকায়া। এবার ভূমিক্ষয়ের কবলে পড়ে ক্ষীণকায়া জলধারা প্রশস্ত ও গভীর হয়েছে। ধারাটির পারাপার হওয়াই বেশ কষ্টকর। তারপরই টিপরাখড়কের মোটামুটি উচ্চ অঞ্চল। যত দূর তাকাই, মুগ্ধ হয়ে যাই। কেবল সাদা রঙের অ্যাষ্টার আর জিরানিয়ামের ফুল। এই ফুলগুলোর বর্ণ কিন্তু গাঢ় গোলাপী নয়, হাল্কা গোলাপী আর গাঢ় বেগুনী রঙের মেশানো ফুল— জিরানিয়াম ওয়ালিচিয়াম। বেশ বড় বড় ফুল। হয়তো বেশ কয়েকদিন আগে বৃষ্টি হয়েছে, গাছগুলো তাই ঝকঝকে ও সজীব। অনেক জায়গা জুড়ে অজস্র ফুল। ষ্টিপা, পাও আর ডায়াস্থোনিয়া ঘাসের গালিচা গ্রাস করেছে জিরানিয়ামের গাছগুলো। জিরানিয়ামের গাছগুলো লতানো। গাছগুলোর মাঝখানদিয়ে মাথা উঁচু

করে রয়েছে অজস্র এনাফেলিস রয়েলি। ১৯৬২ সনে এদের কিন্তু এই স্থানে দেখিনি।

তাঁবু গোছানোর পর চা-জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়ি। এক যুগ পূর্বের সেই টিপড়াখড়কে, যেখানে তাঁবু খাটিয়ে মাসখানেক অবস্থান করেছিলাম। বেশ কিছুটা পথ অতিক্রম করবার পর থমকে দাঁড়াই। টিপরাখড়ক যেন চিনতেই পারি না। সমস্ত অঞ্চল জুড়ে অদ্ভুত পরিবর্তন। হিমবাহ হয়তো আরো পিছিয়ে গিয়েছে। গ্রাবরেখার পাথরগুলো ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়েছে। ১৯৬২ সনে তাঁবু স্থাপনের সমস্ত অঞ্চল ভূমিক্ষয়ের শিকার হয়েছে। টিপড়াখড়কে প্রশস্ত বুগিয়ালের অনেক অংশই ভেঙ্গে গিয়েছে। তৃণভূমির চিহ্নমাত্র মুছে গিয়েছে কালের কবলে পড়ে। তার পরিবর্তে বালুকাময় প্রান্তর। আর সেই বালুকাভূমির বুকের ওপর দিয়ে ভুইগুার গঙ্গার মূলধারা চার পাঁচটি ভাগে বিভক্ত হয়ে বয়ে চলেছে। আর জলধারার দুপাশে অসংখ্য এপিলোবিয়াম ল্যাটিফোলিয়ামের গাঢ় গোলাপী ফুল। ঠিক সৌখীন বোগনবেলিয়ার গাঢ় ফুল বলে যেন ভুল হবে। এই চার পাঁচটি ভাগে বিভক্ত জলধারা একত্র যুক্ত হয়ে বয়ে চলেছে কুলু কুলু শব্দে। পাথরের ওপরে বসে পড়ি। বার বার দেখি কিন্তু যেন চোখ ফেরাতে পারি না। অসংখ্য এপিলোবিয়ামের গাঢ় গোলাপী ফুলগুলোকে যেন অদৃশ্যে কোন মালী সুন্দরভাবে জলধারার দুপাশ দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে। যেন একটা সাদা প্রান্তরের বুকের ওপরে অদ্ভুত রঙীন আল্পনা। হালকা নীলাভো জলধারার আঁকাবাঁকা গতিপথ, আর তাদের অনুসরণ করেছে এপিলোবিয়ামের গাছগুলো। এই গাছগুলো খুবই শক্তিশালী। পাথর ফাটিয়ে গুড়ো গুড়ো করে মাটি আর বালুকণায় রূপান্তরিত করতে পারে দলবদ্ধ ভাবে। এই গাছের মূল দীর্ঘ ও শক্ত। প্রধান মূল থেকে শাখা-প্রশাখা বেরিয়ে মাটি আর বালুকণাগুলোকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখে ভূমিক্ষয় নিরোধ করবার জন্য। এ ধরণের কাজে সাহায্য করে পোলাইগোনাম। এপিলোবিয়ামের গাছগুলোর গোড়ার দিকটা পর্যবেক্ষণ করতেই দেখি বালুকণা মৃত্তিকায় রূপান্তরিত হতে চলেছে। তার সেই শক্ত মাটির বুকে ঘর বেঁধেছে পোলাইগোনাম এফিনি আর জেনসিয়ানা। ঘর ভেঙ্গে যখন তছনছ, তখন যুদ্ধকালীন কর্মতৎপরতা নিয়ে এপিলোবিয়াম যেন সর্বপ্রথম ঝাপিয়ে পড়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রে, তারপর পোলাইগোনাম। শান্তিস্থাপনের পর মাটির বুকে স্থায়ী ঘর বাঁধে জেনসিয়ানা। এপিলোবিয়ামকে এই সময়টায় কতকাল অতিবাহিত করতে হয় জানি না। তবে বুঝতে পারি, সর্বপ্রথম আলগা বালিকণাপূর্ণ

তটরেখা যাতে জলধারার আকর্ষণে ক্ষয়ে যেতে না পারে, সেজন্য এপিলোবিয়াম বালিকণাগুলোকে আরো সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর করে আঠালো মৃত্তিকায় পরিণত করে। তারপর এগিয়ে আসে পোলাইগোনাম। হয়তো ক্লান্ত এপিলোবিয়ামকে মদত দেয় মৃত্তিকা বানানোর কাজে। সৃষ্টির কাজ সম্পন্ন হতেই স্থায়ী শক্ত মৃত্তিকা পূর্ণ জলধারার গায়ে গায়ে সুখী পরিবার জেনসিয়ানা স্নিগ্ধ নীল ফুল ফুটে সবাইকে ভুলিয়ে রাখতে চায়। এ সব কিছুই সংঘটিত হয় সবার অলক্ষ্যে ঈশ্বরের উদ্যানে। কারো প্রতি কারো অভিযোগ নেই, অবহেলা নেই, হিংসা নেই। কারো সৌন্দর্যসম্পদ নিয়ে কারো প্রতি কেউ বিদ্বেষ নয়। সবার প্রতিই সবার অদ্ভুত আকর্ষণ, একে একের প্রতি প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসায় আবদ্ধ।

মানুষ এসব বুঝে না, তাই উপলব্ধিও করতে পারে না। তারা শুধু আকর্ষণ আর প্রেম ভালবাসার অভিনয় করার কায়দা শিখেছে। তাই মানুষ পরিপূর্ণ ভাবে সুখী হতে পারে না। এপিলোবিয়ামের গাঢ় গোলাপী ফুলগুলো বাতাসে যেন দোলা দিচ্ছিল, কাছেই পোলাইগোনামের হাল্কা গোলাপীফুল আর জেনসিয়ানা ভেনেস্টার নীল ফুল সবই একসঙ্গে গায়ে গা ঠেকিয়ে বসবাস করছে। অথচ এরা সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের, ভিন্ন পরিবারের।

টিপরাখড়কের সামান্য উচ্চস্থানে জিরানিয়াম অ্যাংগুষ্টিফোলিয়ার একচ্ছত্র রাজত্ব দেখতে পাই। বসন্তের শুরুতে সব ফুল ফোটা হয়নি। তবু এরাই নন্দনকানন যেন আলোকিত করে রেখেছে।

চাকুলথেলায় দেখি জুনিপারের ঘনবসতি। এর মধ্যেই স্থান করে নিয়েছে রোডোডেনড্রন অ্যান্থপোগন। রোডোডেনড্রনের অজস্র ফুল ফুটেছিল। বর্ষার আক্রমণে ফুলের কোমল পাপড়ি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। দূরে দূরে দেখি বড় বড় পাতা-যুক্ত রিউমের গাছ। আর তারই ফাকে ফাকে মেকানপসিসের নীল ফুল যেন বাগান আলোকিত করেছে। মেকানপসিস অ্যাকুলিয়েটা বা নীল পপির এত গাছ এর আগে কখনো দেখিনি। ১৯৬২ সনে এই অঞ্চলে বড় বড় পাথরের ফাকে ফাকে নীলপপির শুকনো গাছ দেখেছিলাম।

চাকুলথেলায় যাবার মতো সময় ছিল না। তাই ফেরার পথে দেখে নিই পোটেন্টিলা ফ্রুটিকোসা, পোটেন্টিলা নেপালেনসিন, ঈষৎ বেগুনী রঙের বড় বড় অ্যাস্টর। যেখানে কোন ফুল নেই, সেখানে এনাফেলিসের ঘনবসতি। প্রতিদিনই নন্দনকাননে ঘুরে ঘুরে দেখি আর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হই। এত ফুল চারধারে, তবু অভিযোগ, নন্দনকাননে ফুল নেই। ত্বদিন বেশ সুখে কাটছিল নন্দনকাননেই।

কিন্তু সুখ বেশীদিন থাকে না। এর মধ্যেই সন্ধ্যায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়। প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয়, বজ্রনির্ঘোষে চারদিক যেন স্তব্ধ হয়ে যায়। সারারাত প্রচণ্ড বর্ষণ, এমনকি পরদিন বিকেল পর্যন্ত। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি। সবাইকে সারারাত বসেই কাটাতে হয়। অবিশ্রান্ত বর্ষণের জন্য নন্দনকাননের সমস্ত জলধারা স্ফীত হতে শুরু করে। সর্বনাশ, বন্যা হবে নাকি! নন্দনকাননের সমস্ত ফুলগুলো ডুবে যাবে বুঝি? বাধ্য হয়েই বিদায় নিতে হয় নন্দনকানন থেকে। বিদায় নেবার সময় এক ফাকে জলধারা ডিঙ্গিয়ে পৌছে যাই এপিলোবিয়ামের বাগানের কাছে। আশ্বস্ত হই। সবাই ভাল আছে, সুস্থ আছে। এমনকি পোলাই-গোনাম, জেনসিয়ানাও সুস্থ আছে। প্রচণ্ড বৃষ্টির জলে ধুয়ে মুছে এপিলোবিয়ামের গাঢ় গোলাপী ফুল যেন আরো গাঢ়, আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

ঘাংঘরিয়ায় ফিরে এসে চড়া রোদে সবার ভিজে জামা-কাপড় শুকিয়ে নেওয়া হয়। পরদিন লোকপাল যাত্রা। তীর্থযাত্রীর সংখ্যাই বেশী। বাঙ্গালী ভ্রমণকারী সংখ্যাও কম নয়।

সামান্য পথ পেরুতেই ভুজগাছ আর রোডোডেনড্রন ক্যাম্পিন্যুলাটামের ছায়ায় ছায়ায় পথ চলতে চলতে দেখি বুনো লতানো গোলাপের গাছ। সব গাছেই অজস্র ফুল ফুটে রয়েছে। ফুলের কোন গন্ধ নেই, সুন্দর সুগঠিত বড় বড় গোলাপের যেন মিনিয়েচার ফুল। পথ চলতে চলতে দেখি বৃক্ষসীমা পেরিয়ে চলেছি। সত্যি-কারের চড়াই শুরু হয় লক্ষ্মণ গঙ্গার ধারা অতিক্রম করবার পর। পথের ধারে থমকে দাঁড়াই। গোড়াশুদ্ধ উপড়ে ফেলে রাখা ব্রহ্মকমল, ডেনফিনিয়াম যত্রতত্র ছড়িয়ে রয়েছে। একজন বাঙ্গালী তরুণ যাত্রী গোছা গোছা ব্রহ্মকমল হাতে নিয়ে অবতরণ করছিল। একজনকে জিজ্ঞাসা করি, এত ফুল দিয়ে কি করবেন?

তরুণ বেশ উদ্ধত স্বরে বলে : দেখি, কি করি!

আমি বলি : এত ফুলতো রাখতেও পারবেন না। নীচে নেমে গেলেই গরমে পচে যাবে।

তরুণটি তাচ্ছিল্যের স্বরে বলে : তখন ফেলে দেবো।

—ফেলে দেবেন?

এরপর তরুণটি কোন উত্তর না দিয়ে বিরক্ত হয়ে নেমে যায় তরতর করে।

দাঁড়িয়ে থাকি। উৎরাই পথ ওরা কলরব করতে করতে দুর্বার বেগে নেমে যাচ্ছিল, যেন অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল।

আর একদলকে দেখি অজস্র ফুল তুলে নিয়ে ধুকতে ধুকতে অবতরণ করছে। আমার কাছে এসেই বিশ্রামের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ে।

আমি বলি : কি হল?

—মাথার যন্ত্রণা।

—অত ফুল তুলেছেন কেন? কি করবেন এগুলো দিয়ে?

ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে বলে : জানি না কি করবো।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। পথের ধার থেকে সমস্ত ব্রহ্মকমল তোলা হয়েছে। ডেলফিনিয়াম ফুলগুলো অচেনা, তাই ভুল করে তুলে ফেলে দিয়েছে রাস্তার ধারে। অদূরে বিস্ময়কর দুটো বড় বড় গাছ। ডালে ডালে অনেকগুলো নীল ফুল। নীল পপির গাছ উপড়ে তুলে ফেলে রেখেছে এইসব যাত্রীর দল। নির্দয় মানুষের এই ব্যবহারে ম্লান হয়ে যাই।

লোকপালে সেই পুরানো ১৯৫৯ সনের পাথরটির ওপরে গুরুদ্বার বানানো হয়েছে। লক্ষ্মণ মন্দিরটি অযত্নে ভগ্নদশায় টিঁকে রয়েছে কোনক্রমে। লোকপালের স্বল্পপরিসর উপত্যকার খাড়া ঢাল জুড়ে অসংখ্য ব্রহ্মকমল, নীল পপি, ডেলফিনিয়াম দূরে দূরে একোনাইট ভায়োলেসিয়াম। মন্দিরের কাছেই বসি। ভাবি, এইসব মূল্যবান প্রজাতির কি দুর্দশা। ঈশ্বরের উদ্যানে হঠাৎ যেন অসুরদল হানা দিয়েছে। ধনরত্ন চিনতে না পেরে সব তছনছ করে চলে গেছে। এমনি অত্যাচার, এমনি আক্রমণ এসে পড়বে প্রতি বারই ঈশ্বরের উদ্যানে। তাহলে প্রজাতিগুলো কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে! রামায়ণ-মহাভারতেও অনেক উদ্যানের কথা পড়েছি, সে উদ্যান হারিয়ে গেছে কোন অসুরের অত্যাচারে। এমনি করেই একদিন এসব ভালোলাগা অপরূপ উদ্যান মুছে যাবে সবার মন থেকে। আগামী দিনের মানুষ তখন আমাদের লেখা দু-একখানা পুঁথি দেখে ভাববে, এ সবই আজগুবি, অবাস্তব। যেমনভাবে আজকাল রামায়ণ-মহাভারতের অনেক উদ্যানের মূল্যায়ন হয়, মিথ্যা আর অবাস্তব বলে।

নির্ঘণ্ট